প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

ভাঙা আয়নার রহস্য ★ সম্রাটের রাজকোষ ★ রত্নহার উদ্ধারে ফ্রান্সিস ★ রাজা ওভিড্ডোর তরবারি

ফ্রান্সিস সমগ্র (৫ম)

অনিল ভৌমিক

ভাঙা আয়নার রহস্য

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। বাতাসের তেমন জোর নেই। পালগুলো প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া ছুটে আসছে। তখনই পালগুলো ফুলে উঠছে। পরক্ষণেই আগের মত।

বেশ কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম দিগন্তে গভীর কমলা রঙের সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে লাল-আলো ছিল ছড়িয়ে। এখন সব অন্ধকার। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়।

তীরভূমির কাছ দিয়ে জাহাজ চলেছে। ভাইকিংরা ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে বসে ছিল। জাহাজের গতি বেশ কমে গেছে। হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। দেখল জাহাজের শ্লথগতি। ও সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। চলল ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরের দিকে। কেবিন ঘরের সামনে এসে হ্যারি দরজায় টোকা দিল। মারিয়া দরজা খুলে দাঁড়াল। বলল—কী ব্যাপার হ্যারি!

—সমস্যায় পড়েছি। ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি ভেতরে এসো। হ্যারি কেবিন ঘরে ঢুকল। বলল—বাতাস একেবারে পড়ে গেছে। সব পাল নেতিয়ে পড়েছে। জাহাজের গতি কমে গেছে। কী করবে বলো।

—আমি বিকেলে ডেক-এ গিয়েছিলাম। দেখেছি সব। হাওয়ার গতি না বেড়ে ওঠা পর্যন্ত এভাবেই যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দাঁড় টানলে জাহাজের গতি বাড়তো। হ্যারি বলল।

—থাক না। বন্ধুরা একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসুক। গল্পটল্প করুক। গভীর রাতের দিকে দেখো বাতাসের গতি বাড়বে। অনেকবারই এমন হতে দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে দেখা যাক। হ্যারি বলল। ও ডেক-এ উঠে এল। মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে বসল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন বাতাসের বেগ বাড়ে।

মাস্তুলের মাথায় বসেছিল নজরদার পেড্রো। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তাই পেড্রোকে চোখ কুঁচকে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হচ্ছিল।

হঠাৎ দেখল তীরভূমি দিয়ে মশাল হাতে কারা ছুটে আসছে। পেড্রো চোখ কুঁচকে স্থির তাকিয়ে রইল কিন্তু চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঠিক বুঝল না ওরা কারা।

পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—তীরভূমি দিয়ে একদল লোক ছুটে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে। ফ্রান্সিসকে খবর দাও।

হঠাৎ তখনই মেঘ সরে গেল। চাঁদের আলো অনেকটা স্পষ্ট হল। পেড্রো দেখল যারা মশাল হাতে ছুটে আসছে তারা সংখ্যায় পাঁচজন। সবাই সশস্ত্র যোদ্ধা।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। ফ্রান্সিস ও মারিয়া জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। রেলিং ধরে তাকিয়ে রইল। সত্যি পাঁচজন সশস্ত্র সৈন্য আসছে; হাত নেড়ে কী বলছে। ওদের কথা ক্ষীণভাবে শোনা গেল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস ওরা পোর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছে। জাহাজ থামাতে বলছে। কী করবে?

—তাই ভাবছি। তবে এটা বোঝা গেল যে আমরা পোর্তুগালে এসেছি। ফ্রান্সিসদের ঘিরে ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে ছিল। শাঙ্কো বলল—

—ফ্রান্সিস—মাত্র তো পাঁচজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ওদের হারিয়ে দিতে পারবো।

—না শাঙ্কো—আমি লড়াই চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—এক কাজ কর—ওদের জাহাজে উঠতে দাও। ওরা কী বলতে চায় শুনি। তারপর যা করার করবো।

—বেশ—ফ্লেজারকে বলো জাহাজ তীরভূমিতে নিতে। পাটাতনও পেতে দাও।

ফ্লেজার ফ্রান্সিসের নির্দেশমত জাহাজ তীরে ভেড়াল। পাটাতন ফেলা হল। সৈন্যরা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠল। তার আগে বালিয়াড়িতে ওরা মশাল পুঁতে রাখল।

পাঁচজন জাহাজে উঠতে ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। হ্যারিও সঙ্গে গেল। ওদের মধ্যে একজন সর্দার গোছের লোক ভাঙাভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—তোমরা কারা? এখানে এসেছো কেন? তোমাদের দেখেই বুঝতে পারছি তোমরা বিদেশী। তোমাদের দেশ কোথায়?

একগাদা প্রশ্নের উত্তরে হ্যারি বলল—আমরা জাতিতে ভাইকিং। পশ্চিমে য়ুরোপের সমুদ্রতীরে আমাদের দেশ।

—তোমরা জলদস্যু হতে পারো। হ্যারি ক্রুদ্ধস্বরে বলল—কী দেখে আমাদের জলদস্যু বলে সন্দেহ করছো?

—তোমরা এতজন জোয়ান। একসঙ্গে জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। জাহাজ লুঠ করা তোমাদের পক্ষে খুবই সহজ কাজ। লোকটা বলল।

তখনই মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল। হ্যারি আঙ্গুল তুলে মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কোন দেশের রাজকুমারী জলদস্যুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় শুনেছো কখনো?

—না—এরকম শুনিনি। লোকটা বলল।

—তবে? হ্যারি বলল।

—তাহলে তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর।

—রানি উরাকার নাম আমরা জন্মেও শুনিনি। তাছাড়া তোমাদের রাজারানির কোন ব্যাপারে আমরা নেই। আমরা দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। সবার সঙ্গে সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করি। যদি কোথাও

গুপ্তধনের সংবাদ পাই আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে তা উদ্ধার করি। তারপর সেখানকার শাসককে দিয়ে দিই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা তাতে ভাগ বসাও। সর্দারটা বলল।

—না। একটা তামার মুদ্রাও আমরা নিই নি। হ্যারি বলল।

সর্দার গোছের লোকটা দাঁত বের করে হেসে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। সঙ্গীরাও হাসল। লোকটা বলল—তোমরা কত কষ্টে গুপ্তধন উদ্ধার কর আর তার এককণাও নাও না—এটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

—খুবই স্বাভাবিক। আমরা চোর ডাকাত জোচ্চোরদেরই বেশি দেখি। মানুষ যে অন্যরকমও হয়—মানুষ যে সৎও হয়, হৃদয়বানও হয়, সত্যবাদীও হয় এটা আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। হ্যারি বলল।

—যাকগে। তোমাদের বন্দী করা হল। সর্দার বলল।

—কেন? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। হ্যারি বলল।

—সেসব বুঝি না। সর্দার বলল।

—আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের বাধা দিও না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কি আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে? সর্দার বলল।

—না। লড়াই মৃত্যু রক্তপাত এসব আমরা চাই না। হ্যারি বলল।

—কাপুরুষ। সর্দার হেসে উঠে বলল।

শাঙ্কো এগিয়ে এসে নিজেদের দেশের ভাষায় বলল—ফ্রান্সিস আমরা বিনাযুদ্ধে এভাবে বন্দী হবো না। আমরা লড়াই করবো। অন্য ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো।

সৈন্য কজন একটু ঘাবড়াল।

ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব। শান্ত হও। সময় সুযোগমত লড়াই করবো। এখানে ধারেকাছে সেনানিবাস থাকা অসম্ভব নয়। একবার লড়াইয়ে নামলে এরা দু-একজন মারা যাবে দু-একজন পালাবে। সেনানিবাসে এই সংবাদ পৌঁছোলে কত না সৈন্য ছুটে আসবে কে জানে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—দেখ—বাতাস পড়ে গেছে। শুধু দাঁড় বেয়ে আমরা বেশিদূর যেতে পারবো না। ধরা পড়ে যাবো। তখন লড়াই মানেই আমাদের মৃত্যু। কাজেই আগে সব শুনি। হ্যারি ওদের কাছে শোনো তো এখানকার রাজা কে? রানি উরাকা কে? কী জন্যে ওরা আমাদের রানি উরাকার গুপ্তচর বলে ভাবছে?

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—তোমাদের রাজার নাম কি?

—মহামান্য গঞ্জালেস। সর্দার বলল।

—রানি উরাকা কোথাকার রানি? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমরা যেখানে আছি এটা রানি উরাকার দেশের সীমা। এখান থেকে কিছু দূরে গেলে রানি উরাকার দুর্গ দেখতে পাবে। যান তো—এসব বলে কী হবে। তোমরা সব জেনেই এখানে এসেছো। রানি উরাকা তোমাদের পাঠিয়েছে। মহামান্য গঞ্জালেসের সৈন্যসংখ্যা কত? তাঁর সেনানিবাস কোথায়? এসব খবর

সংগ্রহের জন্যেই তোমাদের পাঠানো হয়েছে। এখন ধরা পড়ে অন্যরকম কথা বলছো যেন কিছুই জানো না। সর্দার বলল।

—আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি—রানি উরাকার নামও আমরা কোনদিন শুনিনি। তোমাদের কাছেই প্রথম শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। সর্দার বলল।

ওদিকে শাঙ্কো বিস্কোরা দল বাঁধল। অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল সকলের অলক্ষ্যে এনে সিঁড়িঘরের পেছনে এসে দাঁড়াল। সৈন্যরা যখন ফ্রান্সিসদের বন্দী করতে এগিয়ে এল তখন শাঙ্কোরা সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতর্কিত এই আক্রমণে সৈন্যরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওরা কোমরের অসিকোষ থেকে তরোয়াল বের করল। ততক্ষণে দুজন সৈন্য শাঙ্কোদের তরোয়ালের মার খেয়ে ডেক-এ পড়ে গেছে। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। রাজা গঞ্জালেসের সৈন্যরা এল উষ্ণীষ পরা। ভাইকিংদের তো সেসব নেই। সামনা সামনিই লড়াই চলল। কিছুক্ষণ লড়াই করেই সৈন্যরা বুঝল শাঙ্কোরা তরোয়াল চালাতে কত দক্ষ।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি বাধা দেবার সময় পেল না। এখন দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—আমরা বিপদে পড়লাম। শাঙ্কোরা মাথা গরম করে আমাদের বিপদ ডেকে আনলো। দুজন ভাইকিং আহত হয়ে ডেক-এ পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব লড়াই করো না। লড়াই বন্ধ কর। নইলে আমরা বিপদে পড়বো। এখনও কেউ মারা যায় নি। আর কিছুক্ষণ লড়াই চালাল উভয়পক্ষের কেউ না কেউ মারা যাবে। তার আগে লড়াই থামাও।

ভাইকিংরা লড়াই থামাল। সবাই অস্ত্র ত্যাগ করল। সৈন্যরাও অস্ত্র নামাল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। শাঙ্কোরা রাজা গঞ্জালেসের দুজন সৈন্যকে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলল।

আহত সৈন্যদের নিয়ে রাজা গঞ্জালেসের সৈন্যরা জাহাজের পাটাতন দিয়ে তীরে নেমে এল। জলে যে দুজন সৈন্যকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল তারাও দলের সঙ্গে জুটল। সর্দার গোছের সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে বলল—এর ফল তোমাদের ভুগতে হবে।

তীরের বালিয়াড়ি পার হয়ে ঘাসের প্রান্তর পেরিয়ে ওরা দক্ষিণমুখো চলল। তখনই সূর্য উঠল। রোদ ছড়াল সমুদ্রে ফ্রান্সিসদের জাহাজে তীরভূমির গাছ-গাছালির মাথায় সবুজ প্রান্তরে। দেখা গেল দূরে সৈন্যরা যাচ্ছে। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস তুমি বলাতেই আমরা অস্ত্র ত্যাগ করলাম। আর কিছুক্ষণ সময় পেলে ওদের হারিয়ে দিতে পারতাম।

—তা পারতে। লড়াইয়ের সময় মাথা উত্তেজিত থাকে। দু-একজন সৈন্য নিশ্চয়ই মারা পড়ত। আমাদের অপরাধ বেশি হত। ওরা আমাদের বন্দী করতে এসেছিল। আমাদের ওরা আক্রমণ করেনি।

হ্যারি বলল—যা হবার হয়ে গেছে। এখন ফ্রান্সিস কী করবেন?

—এক্ষুনি নোঙর তোল। জাহাজ ছাড়ো। দাঁড় টানো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এ তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংরা কাজে নেমে পড়ল। জাহাজের গুটিয়ে রাখা পালগুলো খুলে দিল। পালগুলো অল্প ফুলে উঠল। কারণ বাতাস এসে গেছে। নোঙর তোলা হল। একজন দাঁড়ঘরে চলে গেল। দাঁড়টানা শুরু হল। জাহাজ চলল।

মাস্তুলের মাথায় বসা নজরদার পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস, ঘোড়ায় চড়ে কারা আসছে, ধুলো উড়িয়ে খুব দ্রুত আসছে।

—দক্ষিণ দিক থেকে তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। পেড্রো বলল।

—এখন কী করবে ফ্রান্সিস? হ্যারি বলল।

—ধরা দেব। উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—একবারে লড়াই না করে? হ্যারি বলল।

—এখন তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখ—কত সৈন্য আসছে। ঘোড়ায় চড়ে আসছে মাত্র কয়েকজন। পেছনে তাকিয়ে দেখ। পদাতিক সৈন্য কত! ফ্রান্সিস বলল।

—আবার বন্দীজীবন। হ্যারি বলল।

—বন্দীদশা মেনে নেব। সময় সুযোগ মত পালাবো। এছাড়া কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহীরা কাছে এসে পড়ল। তাদের গলায় বর্মে উষ্ণীষে রোদ পড়েছে। চক্‌চক্ করছে।

অশ্বারোহীরা তীরের কাছে নামল। একজন দীর্ঘদেহী যোদ্ধা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল বালিয়াড়িতে। গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ থামাও।

—আমরা জাহাজ থামিয়েছি। নোঙর ফেলেছি। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল।

—পাটাতন ফেলো। শাঙ্কোরা পাটাতন পেতে দিল। দীর্ঘদেহী পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে ভাইকিংদের দেখল। তারপর বলল— তোমরা বলেছো তোমরা ভাইকিং। দেশ ঘুরতে বেরিয়েছো। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কী করলে তবে বুঝবেন যে আমাদের বিশ্বাস করা চলে? হ্যারি বলল।

—সে-সব পরে হবে। আমি এই দেশের সেনাপতি। মহামান্য রাজা গঞ্জালেস আসছেন। তিনি কী বলেন শোন।

তখন দেখা গেল দাড়ি গোঁফওয়ালা একজন মোটা লোক ঘোড়া থেকে নামলেন। তীরের দিকে এগিয়ে এলেন। বালিয়াড়িতে নামলেন। কোন কথা না বলে পাতা পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠে এলেন। তার পরনে কালো জোব্বামত পোশাক। তাতে রূপোলি সুতোর সূক্ষ্ম কারুকাজ। মাথায় ঢেউখেলানো সোনার রাজমুকুট। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে। কোমরে

চামড়ার মোটা ফেট্টি। তাতে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা তরোয়াল ঝুলছে। গঞ্জালেস জাহাজে উঠে তাকিয়ে তাকিয়ে জাহাজটা দেখলেন। ভাইকিংদের দেখলেন। একবার জোরে কাশলেন। তারপর বেশ ভারি গলায় বললেন—তোমরা আমার সৈন্যদের আহত করেছো। আমার একজন সৈন্যও যদি মারা যেত তোমাদের সবকটাকে তাহলে কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতাম। তোমরা নিজেদের ভাইকিং বলে পরিচয় দিয়েছো। পোশাক নয় তোমাদের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি তোমরা বিদেশী। তোমরা ভাইকিং। কিন্তু—গঞ্জালেস থামলেন। তারপর বলতে লাগলেন—এখন এখানে যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে। রানি উরাকা আমাদের দেশ আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে। আমরাও তৈরি হচ্ছি। যুদ্ধ হবেই। এইসময় তোমরা এখানে এসেছো কেন?

—আমরা ইচ্ছে করে এখানে আসিনি। আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—কিন্তু আমাদের তো বিশ্বাস হচ্ছে না। রানি উরাকা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে। রাজা বললেন।

—কিন্তু আমরা একবারও জাহাজ থেকে নামিনি। তাহলে কী করে আমরা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করবো। হ্যারি বলল।

—সে-সব বুঝি না। তোমাদের বন্দী করা হল। রাজা গঞ্জালেস বললেন।

—এটা অন্যায়। আপনারা কোন প্রমাণ ছাড়াই আমাদের গুপ্তচর ভেবেছেন। সন্দেহের বশে আমাদের বন্দী করছেন। আমরা এখানে এসে রানি উরাকা এবং আপনার নাম প্রথম জানলাম। হ্যারি থামল। এবার ফ্রান্সিস ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—রানী উরাকার হয়ে আমরা কেন গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো? তাতে আমাদের কী লাভ?

—হয়তো সোনার চাকতি দেবে। রাজা হেসে কাশলেন। তারপর বললেন— হয়তো এমনি কোন বন্দোবস্ত হয়েছে। তোমাদের যা হাল দেখছি। সোনার লোভ তোমরা সামলাতে পারোনি।

—আপনি আমাদের সঠিক পরিচয় জানেন না। অনেক মূল্যবান গুপ্তধন আমরা উদ্ধার করেছি। সেই গুপ্তধনের যিনি মালিক তাঁকেই আমরা গুপ্তধনের ভাণ্ডার দিয়ে দিয়েছি। এক টুকরো সোনা বা হীরে আমরা নিইনি। হ্যারি বলল।

—তোমরা বলছো কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। রাজা বললেন।

তখনই মারিয়া মাস্তুলের পেছন থেকে সামনে এল। রাজা গঞ্জালেস মারিয়াকে দেখে বেশ অবাক হলেন। বললেন এ কে?

—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজকুমারী এইভাবে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তোমাদের সঙ্গে? এর স্বামী কোথায়? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—আমিই রাজকুমারীর স্বামী। রাজকুমারী মারিয়াও আমাদের মত অ্যাডভেঞ্চার অভিযান ভালোবাসেন। তাই আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

—অবাক কাণ্ড। চোখ বড় বড় করে রাজা গঞ্জালেস বললেন।

হ্যারি হেসে বলল—হ্যাঁ কিছু কিছু অবাক কাণ্ড তো সংসারে ঘটে।

—যাক গে। রাজা গঞ্জালেস সেনাপতিকে ইসারায় ডাকলেন। সেনাপতি কাছে এগিয়ে এল। রাজা বললেন—সবাইকে বন্দী করে নিয়ে চলো। রানি উরাকার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরা বন্দী থাকবে।

—একটা অনুরোধ ছিল। হ্যারি বলল। রাজা হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন। বললেন কী কথা?

—আমাদের রাজকুমারীকে আপনার অন্দর মহলে রাখুন। আমাদের তো আপনার বন্দী নিবাসে রাখা হবে। রাজকুমারী অত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। হ্যারি বলল।

—দেখি ভেবে। রাজা গঞ্জালেস জাহাজ থেকে নামলেন। চললেন নিজের ঘোড়াটার দিকে। ঘোড়াটায় উঠলেন। ঘোড়া ছোটালেন ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে।

সেনাপতি এগিয়ে এল। বলল—তোমাদের হাত বাঁধা হবে না। সেই সুবিধে নিয়ে কেউ পালাবার চেষ্টা করতে গেলে তাকে মরতে হবে। এবার চলো। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নামতে লাগল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—আমি পালাবো।

—পারবে না। একে দিনের বেলা তার ওপর সেনাপতিকে লক্ষ্য কর চারদিকে নজর রেখে চলেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—আবার তো বন্দীর জীবন। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠা-নামা করল।

—আমরা আর পালাতে পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—দাঁড়াও। কোথায় আমাদের রাখা হয়। পাহারার ব্যবস্থা কী হয় এসব দেখে ভেবেচিন্তে পালাবার উপায় বার করা হবে। এক্ষুনি পালাবার সময় বা উপায় নয়। ফ্রান্সিস বলল।

পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে তিরিশ চল্লিশজন রইল। বাকিরা চলে গেল। ঐ তিরিশ চল্লিশজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা যেতে যেতে দেখল জমিতে চাষীরা চাষ করছে। বাড়িঘর। কাঠের ওপর মাটি লেপা ছাত। বাড়িগুলো পাথরের। বাড়িগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে। বন্দী ফ্রান্সিসদের দেখছে। মেয়েরা মারিয়াকে হাঁ করে দেখছে। ওরা বুঝতে পেরেছে বন্দীরা বিদেশী।

একমানুষ উঁচু পাথরের দেয়ালঘেরা শহর। এটাই বোধহয় রাজধানী। রাস্তা দিয়ে চলেছে। দুপাশে দোকান টোকান। পথে খুব ভিড় নয়। এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিসরা একটা লম্বাটে বড় বাড়ির সামনে এল। সেনাপতি হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল। এতবড় বাড়ি। নিশ্চয়ই রাজবাড়ি।

সেনাপতি বাড়িটার পূবকোণায় গেল। সেখানে একটা ঘরের সামনে এল। দেখা গেল তিন-চারজন পাহারাদার সৈন্য। খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। সেনাপতি কারারক্ষীদের ইশারা করল। একজন রক্ষী কোমরে গোঁজা একটা বড় চাবির রিং বের করল। লোহার দরজার সামনে গেল। দেখা গেল একটা বড় তালা ঝুলছে। পাহারাদার চাবি লাগিয়ে তালাটা খুলে ফেলল। ঢং ঢাং শব্দে লোহার দরজাটা খুলল।

সেনাপতি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের ঘরটায় ঢোকার জন্যে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঢুকতে লাগল। হ্যারি সেনাপতিকে বলল—আমাদের মধ্যে দুজন আহত বন্ধু আছে। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

—ব্যবস্থাটা তোমরা করলেই পারতে। সেনাপতি বলল।

—সে সময় পাইনি। আর একটা কথা। হ্যারি বলল।

—কী? সেনাপতি বলল।

—সকাল থেকে আমরা কিছু খাইনি। আমাদের তাড়াতাড়ি খেতে দিন। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে—দেখছি। সেনাপতি বলল।

হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। বোঝাই গেল কয়েদঘর। বাইরের চড়া আলো থেকে বেশ অন্ধকার অন্ধকার ঘরটায় প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। একেবারে ওপরে দুপাশের দেয়ালের গায়ে জানালা। ওখান দিয়েই যা একটু আলো আসছে। মেঝেয় পাতা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি পাটির মত। বসে আছে শুয়ে আছে বন্ধুরা। একপাশে ফ্রান্সিস দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পাশে মারিয়া। তার পাশে শাঙ্কোরা।

হ্যারি এসে সেখানে বসল। মারিয়া ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—তোমাদের জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেল কয়েদঘরে থেকে থেকে। হ্যারি হাসল। বলল—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি দেখ তো ভেন ওর ওষুধপত্র এনেছে কিনা।

—কেন বলো তো। হ্যারি বলল।

—দুই বন্ধু আহত। তাদের তো ওষুধ চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি সেনাপতিকে ওষুধের কথা বলেছি। হ্যারি বলল।

—মনে হয় না ওরা দেবে। ওদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে গিয়েই তো আমার বন্ধুরা আহত হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। আমি খাবারও তাড়াতাড়ি দিতে বলেছি। হ্যারি বলল।

—ভালোই করেছো, সকাল থেকে কেউ কিছু খেতে পারেনি। ফ্রান্সিস বলল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভাইকিংরা কেউ কোন কথা বলছে না। শুয়ে বসে আছে। অন্ধকার এখন সকলের চোখেই সয়ে এসেছে।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি?

হ্যারি বলল—বল।

—ওরা ওষুধ দেবে না। ভেনকে ডাকো। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। তাকিয়ে তাকিয়ে ভেনকে খুঁজল। দেখল ডান কানায় ভেন বসে আছে। হ্যারি বন্ধুদের জন্য ফিরে ভেন-এর কাছে এল। দেখল—ভেন আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে দুচোখ বন্ধ। হ্যারি ডাকল, ভেন—ভেন। ভেন চোখ মেলে তাকাল। হ্যারি বলল—আমাদের দুই বন্ধু তো আহত। তুমি কি কিছু ওষুধ এনেছো? ভেন ফোকলা দাঁতে হেসে কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো কাপড়ের থলে বের করল। হ্যারি হেসে বলল—সাবাস ভেন। ওদের ওষুধ দাও।

—এখানে আসতে বলো। এক পাত্র জল যেন নিয়ে আসে। ভেন বলল।

হ্যারি বন্ধুদের মধ্যে আহত বন্ধু দুজনকে খুঁজে বের করল। বলল—ভেন ওষুধ এনেছে। আমাদের জন্যে মাটির জালায় জল রাখা আছে আর একটা পাত্রও থাকতে পারে। ওটাতে জল ভরে নিয়ে যেও।

দুই বন্ধু উঠল। একজনের পায়ে তরোয়ালের ঘা লেগেছে অন্যজনের ঘা লেগেছে হাতে। দুজনে জলের পাত্র নিয়ে ভেন-এর কাছে চলল।

ভেন থলে থেকে কালো রঙের গুঁড়ো বের করল। সামান্য জল ঢেলে দুহাতের চেটোয় ঘষতে ঘষতে একটা বড়ির মত করল। ঐভাবে আরো একটা বড়ি তৈরি করল। দুজনকে খেতে দিল। দুজনে খেল। এবার ভেন আর একটা থলে থেকে হলুদ রঙের গুঁড়ো বের করল। দুজনের কাটা জায়গায় হলুদ রঙের গুঁড়ো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল। ক্ষত জ্বালা করে উঠল। তারপর এতক্ষণের যন্ত্রণা কমে আসতে লাগল। দুজনে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল।

তখনই ঢ্যাং ঢ্যাঢাং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। দুজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে ঢুকল। দরজার কাছে দুদিকে দুজন দাঁড়াল।

একজন লোক কাঠের বড় থালা নিয়ে ঢুকল। তাতে গোল কাটা রুটি আর একজন বড় ডেকচি নিয়ে ঢুকল। আর একজন একগাদা পাতা হাতে ঢুকল। সে দ্রুত হাতে পাতাগুলো সব বন্দীদের সামনে পেতে দিল। রুটি আর নানা সব্জির তরকারি। সঙ্গে অল্প ঝোল দেওয়া হল।

ভাইকিংরা সবাই বেশ ক্ষুধার্ত। গপ্‌গপ্ করে সব নিয়ে খেয়ে নিল। অনেকেই দুবার চেয়ে নিয়ে খেল।

মারিয়ার শরীরটা ভালো লাগছিল না। বেশি খেতেও পারল না। ফ্রান্সিস সেটা লক্ষ্য করে বলল—কী ব্যাপার? খাচ্ছো না?

—খিদে নেই। রাতে বেশি করে খাবো। মারিয়া বলল।

—উঁহু। মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভালো নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমার শরীর ভালো আছে। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। খেতে লাগল। বন্দীদের খাওয়া শেষ হল। সবাই জল খেল। ফ্রান্সিস মারিয়ার জন্যে খাবার জল নিয়ে এল। মারিয়া খেল।

মারিয়া আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা মারিয়া বুঝল জ্বর এসেছে। শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। গা মোচড়াচ্ছে যেন।

রাতে মারিয়া কিছুই খেতে পারল না। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মারিয়ার কপালে হাত রাখল। বেশ গরম। বলল—তোমার তো জ্বর হয়েছে।

—ও কিছু না। কালকে সকালেই দেখবে জ্বর ছেড়ে গেছে। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। মারিয়ার মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে রইল। মারিয়া ঝিম মেরে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে গুঙিয়ে উঠছে। মাথা এপাশ ওপাশ করছে।

ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল কী ব্যাপার?

—মারিয়ার জ্বর এসেছে। মনে হচ্ছে জ্বর বেড়েছে। তুমি ভেনকে ডাকো। একটু পরেই ভেন এল। মারিয়ার গলায় কপালে হাত দিয়ে দেখল। চোখের নিচে দেখল। বলল—ফ্রান্সিস রাজকুমারীর বেশ জ্বর। মনে হয় রাতে বাড়তে পারে। যাতে জ্বর না বাড়ে তার জন্যে এই বড়িটা এখন আর ঘণ্টা দুয়েক পরে আর একটা খাইয়ে দাও। ভেন ওখানেই বসে রইল। সেই আসনপিঁড়ি হয়ে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে একটা বড়ি খাইয়ে দিল।

শেষ রাতের দিকে মারিয়া চোখ বড় বড় করে তাকাল। ফ্রান্সিস তখনও মারিয়ার মাথা কোলে রেখেছে। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বলল—মারিয়া—মারিয়া। শরীর খারাপ লাগছে? মারিয়া এপাশ ওপাশ কয়েকবার তাকাল। তারপর থেমে থেমে বলতে লাগল—ঘরটা —এত অন্ধকার—ঐ তো সমুদ্র—আমি সমুদ্রে সাঁতার—সূর্য ডুবে যাচ্ছে—টুপ করে—বাতাস ভেজা ভেজা—বৃষ্টি হয়েছে—। ফ্রান্সিস মুখ নিচু করে ডাকল—মারিয়া—মারিয়া—কী বলছো এসব। হ্যারি দেয়ালের পাথরের খাঁজ থেকে মশাল তুলে এনে মারিয়ার কাছে দাঁড়াল। এবার মারিয়ার মুখটা অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ভেনকে ডাকল। ভেন চোখ খুলে তাকাল। আবার মারিয়াকে ভালো করে দেখল। বলল—ফ্রান্সিস—আর একটা ওষুধ দিচ্ছি। এতেও জ্বর না কমলে আর কিছু করার নেই। সব ওষুধ তো আমি আনতে পারিনি।

ভেন অন্য একটা ছোট থলে কোমরের ফেট্টি থেকে বের করল। একটা বড়ি বের করল। বড়িটা হাতে নিয়ে মারিয়ার মুখের ওপর ঝুঁকে বলল—রাজকুমারী, এই বড়িটা চুষে চুষে খেয়ে নিন। জ্বর কমবে। মারিয়া গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—বড়িটা আমাকে দাও। বড়িটা নিয়ে মারিয়াকে বলল—মারিয়া—মুখ খোলো—ওষুধ মুখে নাও। মারিয়া চোখ বুঁজে গোঙাতে লাগল। মুখ হাঁ করল না।

ভেন বড়িটা নিল। তারপর মারিয়ার মুখের দাঁতের পাটি ডান হাতের আঙুলের চাপে খুলে বড়িটা ফেলে দিল। মারিয়া হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল। বড় বড় চোখ করে চারদিকে তাকিয়ে নিল। তারপর ভাঙা গলায় বলল—তোমরা

কারা? এ্যাঁ? কারা সব? কী চাও তোমরা? কে আমাকে ডাকছে? কে—কে—কে? নিস্তেজ হয়ে মারিয়া দু-চোখ বন্ধ করে চুপ করে পড়ে রইল। মারিয়ার রোগার্ত ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস ফুঁপিয়ে উঠল। হ্যারি শুনল সেটা। নিচু হয়ে ফ্রান্সিসের পিঠে হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস অস্থির হয়ে পড়ো না।

ফ্রান্সিস ভেনকে মৃদুস্বরে বলল—ভেন আমাদের জাহাজে গেলে তুমি মারিয়াকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তুলতে পারবে?

—আমার মনে হয় পারবো। ভেন বলল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল লোহার দরজার কাছে। চিৎকার করে ডাকল— পাহারাদার—পাহারাদার—কাছে এসো। তখন দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসের ডাক তারা শুনলেও না শোনার ভান করে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল। ফ্রান্সিস দুহাতে লোহার দরজা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে বলল—এদিকে এসো। দরজায় জোর শব্দ উঠল—ঝন্ ঝন্স-ন্।

একজন পাহারাদার এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—আমাদের রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তোমাদের সেনাপতিকে ডাকো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেনাপতি তোমার চাকর নাকি যে ডাকলেই আসবে। পাহারাদারটি বলল।

ফ্রান্সিস আবার লোহার দরজায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—সেনাপতিকে ডাকো। রক্ষীদুজন নির্বিকারভাবে তরোয়াল উঁচিয়ে পাহারা দিতে লাগল। লোহার দরজার শব্দে ফ্রান্সিসের চিৎকারে ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল। সকলে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে ওরা জেনে গেছে মারিয়া গুরুতর অসুস্থ। তখন ফ্রান্সিস একটু দূরে সরে এসে ছুটে গিয়ে লোহার দরজার ওপর পিঠ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজায় প্রচণ্ড শব্দ উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি দিল—ও-হো-হো। রক্ষীরা বেশ ঘাবড়ে গেল। লোকটা লোহার দরজা ভেঙে ফেলবে নাকি! একজন রক্ষী এগিয়ে এল। বলল—কী চাও তুমি?

সেনাপতিকে ডাকো। আমি কথা বলব। ফ্রান্সিস বলল।

—এত রাতে? ঘুমিয়ে পড়েছে। রক্ষী বলল।

—কোন কথা শুনতে চাই না। ঘুম ভাঙিয়ে সেনাপতিকে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কী চাও বলোতো? কারারক্ষীটি বলল।

—তোমাদের নয়—সেনাপতিকে বলবো। সেনাপতিকে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন ডাকাডাকি করলে সেনাপতি রেগে যাবেন। রক্ষীটি বলল।

—আমি কিছু শুনতে চাই না। সেনাপতিকে এখানে নিয়ে এসো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস আবার পিঠ এগিয়ে লোহার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার

প্রচণ্ড শব্দ উঠল।

কারারক্ষী দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তারপর একজন রক্ষী বলল—ঠিক আছে। যদি সেনাপতি না আসতে চান আমাদের তখন কিছু করার নেই।

—গিয়ে বলবে—বন্দী ভাইকিংদের সঙ্গে যে রাজকুমারী রয়েছেন তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক্ষুনি তাঁর চিকিৎসার দরকার। সেনাপতি যেন আসে। ফ্রান্সিস বলল।

একজন রক্ষী চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। সঙ্গে সেনাপতি। সেনাপতি লোহার দরজার ওপার থেকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার?

—আমাদের রাজকুমারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের বৈদ্য তাঁর চিকিৎসা করবেন। কিন্তু বৈদ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ জাহাজে রেখে এসেছেন। রাজকুমারী আর বৈদ্যকে আমাদের জাহাজে যেতে দিতে হবে। ওখানেই রাজকুমারীর চিকিৎসা হবে।

—আমরা এখানে বৈদ্যকে ডেক-এ পাঠাচ্ছি। সেনাপতি বলল।

—না—আমাদের বৈদ্যই চিকিৎসা করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তাহলে তোমরা তিনজন জাহাজে যেতে চাও। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। রাজকুমারীর চিকিৎসার জন্য। ফ্রান্সিস বলল।

যদি এই সুযোগে তুমি জাহাজ চালিয়ে পালিয়ে যাও। সেনাপতি বলল।

—আমাদের পাহারা দিক আপনার সৈন্যরা। রাজকুমারী সুস্থ হলেই আমরা এখানে চলে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল—বেশ। আমি কিন্তু রাজার অনুমতি ছাড়াই তোমাদের যেতে দিচ্ছি। কালকে রাজসভায় এসে সব তোমাকে বলতে হবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে আমি সম্মতি দিয়েছি—একথাও বলতে হবে।

—বেশ বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি কারারক্ষীর একজনকে বলল—দরজা খুলে দাও। দরজা খোলা হল। সেনাপতি বলল—তোমরা বেরিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস রাজকুমারীর কাছে গেল। ভেনকে বলল—আমরা আমাদের জাহাজে রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। ভেন বলল—বেশ। তারপর উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বুঁজে ফেলল। মারিয়াকে কি বাঁচানো যাবে? হ্যারি এতক্ষণ মশাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল— ফ্রান্সিস—ভেঙে পড়ো না। বিপদের সময় তুমিই তো আমাদের সাহস দাও। আজ তোমাকে নিজেরই মন শক্ত করতে হবে। ভেবো না ফ্রান্সিস—রাজকুমারী ঠিক সুস্থ হবেন। তোমরা যাও।

ফ্রান্সিস আর একবার মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। তারপর মারিয়াকে দুহাতে তুলে পেটের কাছে নিয়ে এল। পাঁজাকোলা করে দরজার কাছে নিয়ে এল। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এল। পেছনে ভেন। তিনজন কারারক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস আর ভেন-এর পাশে দাঁড়াল। দুজন ফ্রান্সিসের দুপাশে। একজন ভেন-এর পাশে।

সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—কোনরকম চালাকি করতে দেখলে তিনটেকেই মেরে ফেলবি।

ভেন সেনাপতিকে বলল—একটা শস্যটানা গাড়ি পেলে ভালো হতো। সেনাপতি বলল—এত রাতে গাড়ি পাওয়া যাবে না। তাহলে কাল সকালে যাও।

—কিছু ভেবো না ভেন। আমি মারিয়াকে ঠিক নিয়ে যেতে পারবো। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা চলল। আজকে জ্যোৎস্না কিছুটা উজ্জ্বল। দুপাশের গাছগাছালিতে হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দ। ফ্রান্সিস আর ভেন চলল।

হঠাৎ মারিয়ার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে মারিয়াকে কাঁধে তুলে নিল। গোঙানি বন্ধ হল।

ওরা চলল। ফ্রান্সিসরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল। সমুদ্র কাছেই। মাঝে মাঝেই জোর হাওয়া ছুটে আসতে লাগল সমুদ্রের দিক থেকে। ঘর্মাক্ত ফ্রান্সিস একটু আরাম পেল। ফ্রান্সিসরা সমুদ্রতীরে পৌঁছল। বালিয়াড়িতে নামল। তারপর চলল জাহাজের দিকে। ফেলা পাটাতনের ওপর দিয়ে সবাই জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস রক্ষীদের বলল —তোমরা যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে বসে পাহারা দিতে পারো। আমরা কেবিনঘরে আছি।

ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। অন্ধকারে সাবধানে ঢুকতে হল। বিছানার কাছে এসে ফ্রান্সিস মারিয়াকে আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে নামাল। তারপর বিছানায় শুইয়ে দিল আস্তে আস্তে। ভেন ততক্ষণে নিজের কেবিনে চলে গেছে।

অন্ধকারে ফ্রান্সিস মোটা মোমবাতিটা জ্বালল। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখতেই চম্‌কে উঠল। দেখল মারিয়া স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস ছুটে মারিয়ার কাছে এল। বলল—মারিয়া—এখন কেমন আছো? মারিয়া কোন কথা না বলে একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল—ভেন— তাড়াতাড়ি এসো। বিছানায় বসল। মারিয়ার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

ভেন ছুটে এল। হাতে দুটো বোয়াম। কাপড়ের থলি থেকে বের করল খল নুড়ি। মেঝেয় বসল। ফ্রান্সিসকে বলল—কাঠের গ্লাসে জল দাও। তারপর মারিয়ার কাছে গেল। কপালে গলায় হাত রাখল। চোখে দেখল। মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস জ্বর একটু কমেছে।

ভেন মেঝেয় এসে বসল। একটা বোয়াম থেকে কিছু কালো গুঁড়ো বের

করল। খলে ঢালল। ফ্রান্সিস কাঠের গ্লাশে জল দিয়ে গেল। ভেন খলটায় কয়েক ফোঁটা জল ঢালল। তারপর নুড়ি দিয়ে ঘষতে লাগল। কিছুক্ষণ ঘষার পর খলটা মারিয়ার কাছে নিয়ে গেল। মৃদুস্বরে বলল—রাজকুমারী—এই খলের ওষুধটা চেটে খেয়ে নিন। মারিয়ার কোন সাড়াশব্দ নেই।

ভেন বিছানা থেকে নেমে এল। পুঁটুলি থেকে একটা গাছের শেকড় বের করল। শেকড়টা মারিয়ার নাকের কাছে কয়েকবার ধরল। চোখ মুখ কুঁচকে মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। ভেন আস্তে বলল

—এই খলটা থেকে ওষুধটা চেটে খেয়ে নিন। মারিয়ার মুখের কাছে খলটা এগিয়ে ধরল ভেন। মারিয়া আস্তে আস্তে চেটে চেটে ওষুধটা খেয়ে নিল। তারপর চোখ বুঁজল।

তখন বাইরে ভোর হয়েছে। নিস্তেজ রোদ ছড়িয়েছে সমুদ্রে ফ্রান্সিসদের জাহাজে। সামুদ্রিক পাখির তীক্ষ্ণ ডাক কানে এল।

ভেন বলল—ফ্রান্সিস—এখন তো কিছু খেতে হয়।

—আমার ক্ষুধাও পাচ্ছে না তেষ্টাও পাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না ফ্রান্সিস—এ সময়ে তোমাকে সুস্থ থাকতেই হবে। দাঁড়াও—আমি রুটি ভেজে আনছি। তুমি রাজকুমারীর কাছে থাকো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেন রুটি আলুসেদ্ধ নিয়ে এল। একটা থালা ফ্রান্সিসকে দিল। অন্যটা নিজে নিল। ফ্রান্সিস থালার দিকে তাকিয়ে বলল—ভেন—মারিয়া এখনও কিছু খায়নি। আমি খাবো না।

—ফ্রান্সিস—পাগলামি কোরো না। এই অসুখে তো উপোষ থাকতেই হবে। ভেবো না। আজকের দিনটা দেখি। মনে হয় কালকে সকালের মধ্যেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে। তখন রাজকুমারীকে সহজপাচ্য কিছু খেতে দেব। নাও—খাও।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে খেতে লাগল। ভেন খেতে খেতে বলল—দুপুরে আর রাতে দুটো ওষুধ পড়বে। রাজকুমারীর জ্বরের কষ্ট কমবে।

জলটল খেয়ে ভেন বলল—ফ্রান্সিস—তোমাকে অনেক ধকল পোহাতে হয়েছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

—অসম্ভব। ঘুম আসবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। চুপ করে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকো। দেখবে ঘুম এসেছে। ভেন বলল।

—দেখি। তার আগে মারিয়াকে একবার দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

ভেন মারিয়ার হাত দেখল। কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। বলল—জ্বর অনেক কম। দেখবে রাতের দিকে জ্বর আরো কমে গেছে। রাতে অন্য দুটো ওষুধ খাওয়াতে হবে। তুমি ঘুমোও।

ফ্রান্সিস মারিয়ার পাশে শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজল। চোখ দুটো কেমন জ্বালাজ্বালা করছে। ভাবতে লাগল—মারিয়া সুস্থ হলে কয়েদঘর থেকে পালানোর ছক কষতে হবে। ও বুঝে উঠতে পারল না—রাজা গঞ্জালেস ওদের

নিয়ে কী করতে চায়। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মারিয়ার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা। তারপর অন্য ভাবনা।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল সেনাপতি নিজের দায়িত্বে ওদের ছেড়ে দিয়েছিল। এখন রাজাকে সেই কথা বলে সেনাপতিকে দায়মুক্ত করতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। ভেন বলল—কী হল?

—আমার এখন শুয়ে থাকার উপায় নেই। আমাকে রাজা গঞ্জালেসের কাছে যেতে হবে। আমরা মারিয়াকে নিয়ে বিপদগ্রস্ত। তাই সেনাপতি আমাদের কারারক্ষীদের পাহারায়, জাহাজে আসতে দিয়েছিল। সেনাপতির কোন দোষ নেই।

বিছানা থেকে নেমে ফ্রান্সিস মারিয়ার কপালে হাত দিল। জ্বরটা কমই মনে হচ্ছে। বলল—আমি যাচ্ছি ভেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো। মারিয়াকে দুপুরে কিছু খেতে দেওয়া যায় কিনা দেখ।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। দুজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস বলল— পালাচ্ছি না। তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস তীর পর্যন্ত পাতা কাঠের পাটাতন ওপর হেঁটে নামল। পেছনে দুজন কারারক্ষীও এল। ওদের তরোয়াল এখন কোষবদ্ধ।

অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে ওরা রাজধানী দামিলায় এসে পৌঁছল। ফ্রান্সিস প্রথমে কয়েদঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। বন্দী ভাইকিংরা ফ্রান্সিসকে দেখে দরজার কাছে ভিড় জমালো।

—ভাইসব—রাজকুমারী এখন অনেকটা ভালো আছেন। আমি এখন রাজসভায় যাচ্ছি। রাজা গঞ্জালেসকে কয়েকটা কথা বলার আছে। আমি তোমাদের কাছে আবার আসছি। রাজার সঙ্গে কী কথা হল জানিয়ে যাবো। তারপর জাহাজে ফিরে যাবো।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, রাজকুমারী কেমন আছেন?

—কিছুটা ভালো। তাই তো ভেনকে রেখে আমি এলাম।

ফ্রান্সিস এবার ফিরে দাঁড়িয়ে একজন কারারক্ষীকে বলল—আমাকে রাজা গঞ্জালেসের দরবারে নিয়ে চল।

তিনজনে চলল। কিছুটা যেতেই একটা বিরাট বাড়ি দেখা গেল। কারারক্ষী বলল—ওটাই রাজপ্রাসাদ। উত্তরদিকের দরজাটা দিয়ে রাজসভায় যেতে হবে।

তিনজনে ঐ দরজা দিয়ে ঢুকল। লম্বাটে বেশ বড় একটা পাথরের ঘর। দুপাশে গোটা কয়েক জানালার মত। একেবারে শেষের দিকে পাথরের সিংহাসন। সিংহাসনে পাথর কুঁদে ফুল লতা পাতার নকশা। সিংহাসনে একটা লাল গদীমত পাতা। রাজা গঞ্জালেস বসে আছেন। পরনে সার্টিনের জোব্বামত। তাতে সোনারূপোর সুতোর কারুকাজ করা। মাথায় আজ অন্যরকম মুকুট। সোনার মুকুটে নানা দামি পাথরের মধ্যে মিনে করা। দুপাশে কয়েকজন বৃদ্ধ বসে আছেন। বোঝা গেল ওঁরা মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ। তাঁদের পরনেও দামি

কাপড়ের জোব্বামত। তাঁরা পাথরের ছোট ছোট আসনে বসে আছেন।

সামনে দাঁড়িয়ে বিচারপ্রার্থীরা।

একটা বিচার চলছিল। রাজা গঞ্জালেস সব শুনে কাছেই বসা অমাত্যের সঙ্গে কী পরামর্শ করলেন। তারপর রায় দিলেন। বাদী বিবাদীরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে গিয়ে সেনাপতির কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—মহামান্য রাজাকে আমি দু একটা কথা বলতে চাই।

—ঠিক আছে। সেনাপতি বলল।

তখন কোন বিচার চলছিল না। সেনাপতি নিজের আসন থেকে উঠে রাজাকে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—এই ভাইকিং যুবকটি কিছু বলতে চায়। কথাটা বলে সেনাপতি ফ্রান্সিসকে দেখাল।

ফ্রান্সিস মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা—অনুমতি দিলে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

—হুঁ বলো। গম্ভীর গলায় রাজা গঞ্জালেস বললেন।

—প্রথমে বলি আমাদের বন্দীশালায় রাখা হয়েছে। আমাদের দেশের রাজকুমারীও আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি গতকাল রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা সেনাপতিকে অনুরোধ করাতে তিনি অসুস্থ রাজকুমারীকে নিয়ে আমাদের জাহাজে যেতে অনুমতি দেন। অবশ্য তিনজন কারারক্ষী আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের বৈদ্যের চিকিৎসায় রাজকুমারী এখন কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। আপনার সেনাপতি এজন্যে কাল আপনার অনুমতি নিতে পারেন নি। কারণ তখন গভীর রাত। সেনাপতির এই উপকারের কথা আমরা জীবনেও ভুলবো না। ফ্রান্সিস থামল।

রাজা ডাকলেন—সেনাপতি। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—এই ভাইকিং যুবকটি যা বলল—তা সত্যি? গঞ্জালেস বললেন।

—হ্যাঁ মহামান্য রাজা। সেনাপতি বলল।

—বন্দীদের চিকিৎসার দায়িত্ব আমাদের নয়। ভবিষ্যতে কাউকে এই সুবিধে দেবেন না। গঞ্জালেস বললেন।

—যথা আজ্ঞা মহামান্য রাজা। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস বলল—আমাকে ক্ষমা করবেন—একটা কথা না বলে পারছি না।

—হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন।

—বন্দীরা অপরাধী হলেও মানুষ। বিচারের পরে যে শাস্তি দেবেন তা তাদের প্রাপ্য। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তাদের অসুখ করলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তো রাজার কর্তব্য।

—আমি অন্যরকম রাজা। এসব মানি না। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বুঝল—এই রাজাকে বলে লাভ নেই। এই অত্যাচারী নির্মম রাজা মানবিকতার কথা কানেই তুলবে না। সুতরাং এই নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া

কথার অপচয় মাত্র।

ফ্রান্সিস এবার বলল—মাননীয় রাজা—আমার আর একটা কথা বলার আছে।

—বলো। রাজা বললেন।

—আমাদের কেন বন্দী করে রাখা হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব বলে লাভ নেই। তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর হয়ে এখানে এসেছো। খোঁজ খবর চলছে। যদি এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে তোমরা ছাড়া পাবে। রাজা বললেন।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

—আর একটা কথা। তোমরা বলিষ্ঠদেহী অসি চালনায় দক্ষ এবং ভীষণ সাহসী। রানি উরাকার সঙ্গে যুদ্ধে তোমাদের দরকার পড়বে। রাজা বললেন।

—আমরা রানি উরাকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবো কেন? রানি উরাকা তো আমাদের শত্রু নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি ওসব বুঝি না। আমার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করতে হবে রানি উরাকার বিরুদ্ধে। যদি তাতে সম্মত না হও তাহলে ঐ কয়েদখানায় পচে মরতে হবে। যুদ্ধের খুব বেশি দেরি নেই। রানি উরাকা যে কোন মুহূর্তে আমাদের দেশ আক্রমণ করতে পারে। আমরা সেকথা ভেবেই সৈন্যবাহিনীকে তৈরি করছি। রাজা বললেন।

—এসব আপনাদের দেশের ব্যাপার। এর সঙ্গে আমাদের জড়াচ্ছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—সবই বলেছি। এবার তোমাদের সিদ্ধান্ত। অবশ্য তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর নও তার প্রমাণ পেলেই তোমাদের আমাদের সৈন্যবাহিনীতে নেব। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আপনারা খোঁজখবর করুন। ফ্রান্সিস বলল।

মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস পিছিয়ে এল।

রাজসভার কাজ চলল।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরের কাছে এল। লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। রাজা গঞ্জালেস বলছেন—আমরা যে রানি উরাকার গুপ্তচর নই এ বিষয়ে তাঁরা খোঁজখবর করছেন। কিন্তু বিপদ এতেও কাটেনি। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে আমরা গুপ্তচর নই তাহলে আমাদের সৈন্যবাহিনীতে নেওয়া হবে। রানি উরাকার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। ফ্রান্সিস থামল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, রাজা গঞ্জালেস আমাদের কোন যুক্তিই শুনবেন না— এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাই আমাদের শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

—আমিও তাই বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ডানহাতটা তুলে বলল— ভাইসব—আমি জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। কালকে আবার আসবো। তোমরা রাজকুমারীর নিরাময় কামনা কর।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরের বারান্দা থেকে সামনের মাঠটায় নামল। চলল সমুদ্রতীরের দিকে। আজকে অন্য কারারক্ষী দুজন ফ্রান্সিসের পাশে পাশে চলল।

কিছুদূর আসার পর ডানদিকে একটা জঙ্গলমত পড়ল। ফ্রান্সিস ঐ দিকে যেতে লাগল। একজন রক্ষী বলল—ঐ দিকে কোথায় যাচ্ছো?

—এখান থেকে একটা ছোট রাস্তা আছে। খুব তাড়াতাড়ি জাহাজঘাটে যাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস একটা খাদের কাছে এল। খাদ থেকে গজিয়ে ওঠা একটা বড় গাছ দেখল। ঐ গাছটার ডালপালা মাথা খাদের ওপরে উঠে এসেছে। পাহারাদার দুজন কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ঐ গাছের মগডাল লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। মটাস্ করে গাছটার ওপরের কটা ডাল ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস নিচে পড়তে লাগল। ডাল ভেঙে ভেঙে নিচে এসে পড়ল। বুক পিঠ কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল রক্ষী দুজন নিচু হয়ে দেখছে। ওরা তো এই কাণ্ড দেখে হতবাক।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তারপর খাদ দিয়ে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। রক্ষী দুজন বেশ ঘুরে খাদটায় নামল। গাছটার কাছে এল। এদিকে ওদিকে ঝোপ জঙ্গলে ফ্রান্সিসকে খুঁজল। কিন্তু ফ্রান্সিসকে পেল না। ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। দুজনে রাজবাড়ির দিকে ছুটল। ফ্রান্সিসের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা সেনাপতিকে বলতে হবে।

ফ্রান্সিস খাদের মধ্য দিয়ে গাছ ঝোপের আড়ালে আড়ালে বেশ দূরে চলে এল। দেখল সামনেই সমুদ্র। ওদের জাহাজটা তীরের কাছেই ভাসছে। ফ্রান্সিস প্রথমেই জাহাজে উঠল না। একটা পাথরের আড়ালে বসল। প্রান্তরের দিকটা দেখতে লাগল।

একটু পরেই দেখল—প্রান্তর দিয়ে লাল ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে কে আসছে। একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখতেই চিনল—সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তাহলে ফ্রান্সিস যে পালিয়েছে এই খবর সেনাপতি পেয়েছে।

সেনাপতি ঘোড়া থেকে নামল। কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে গিয়ে জাহাজে উঠল।

ওদিকে দুজন কারারক্ষী প্রান্তর দিয়ে ছুটে আসছে দেখা গেল। ওরা জাহাজের পাটাতনের কাছে দাঁড়িয়ে ভীষণ হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি জাহাজ থেকে নেমে এল। রক্ষী দুজনকে বলল—ওদের সর্দার এখানে আসেনি। ওরা মাত্র দুজন জাহাজে রয়েছে। তোরা এখানে পাহারায় থাক। ওদের সর্দার এলেই পাকড়াবি।

সেনাপতি ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

পাতা পাটাতন দিয়ে দুই কারারক্ষী জাহাজে উঠল। ডেক-এ ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কারারক্ষী দুজনের নজর এড়িয়ে সমুদ্রের ধারে এল। তারপর কোনরকম শব্দ না করে জলে নামল। এক ডুব সাঁতারে অনেক দূরে গিয়ে নিঃশব্দে ভেসে উঠল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিল। উঠল জাহাজের গা ঘেঁষে। মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো তোলার সময় ফ্রান্সিস ওদের দেশের মুক্তো শিকারীদের কাছ থেকে বেশিক্ষণ জলে ডুবে থাকার নিয়মটা শিখে নিয়েছিল। সেটা কাজে লাগল।

জাহাজের হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে ও জাহাজে উঠে এল। সিঁড়িঘরের আড়াল থেকে দেখল কারারক্ষী দুজন জাহাজের সামনের দিকে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস সিঁড়িঘরের আড়ালে আড়ালে সিঁড়িঘরের মুখের কাছে এল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। দুই কারারক্ষী মাস্তুলের আড়ালে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগে সিঁড়িঘরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল।

নিজেদের কেবিনঘরে ঢুকল। দেখল—ভেন চোখ বুঁজে আসনপিঁড়ি হয়ে মেঝেয় বসে আছে। বিছানায় মারিয়া শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস আস্তে ভেন-এর কাছে গেল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ভেন, রাজকুমারী কেমন আছেন? ভেন চমকে উঠে বলল— কে? কে? ফ্রান্সিস ভেন-এর মুখ চেপে ধরল। বলল—ভেন কোন শব্দ করবে না। আমি ফ্রান্সিস। ভেন বলল—ও—তাই বলো। রাজকুমারী এখন অনেকটা সুস্থ। বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

ফ্রান্সিস বলল—আমি জলে ভেজা পোশাক পাল্টাচ্ছি। ফ্রান্সিসের গলার শব্দ মারিয়ার কানে গেল। মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। ফ্রান্সিসের আর পোশাক ছাড়া হল না। ও মারিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—মারিয়া—এখন কেমন আছো? মারিয়া শুকনো মুখে হেসে বলল—অনেকটা ভালো। ভেন তো এখন আমাকে পাতলা সুজির ঝোল খেতে দেবে বলছে। ফ্রান্সিস হাসল—তবে তো বেশ ভালো আছো তুমি। মারিয়ার দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনেই ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়া এখনও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ফ্রান্সিস একটা শুকনো জামা বের করে ভেজা জামাটা ছাড়ল। তখনই মারিয়া দেখল ফ্রান্সিসের সারা শরীরে কাটাছড়ার দাগ। দু তিনটে বড় ক্ষত থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। মারিয়া দুর্বলস্বরে বলে উঠল—তোমার সারা শরীরে এত কাটাছড়া কেন? ফ্রান্সিস হেসে ওর গাছের মাথায় ঝাঁপ দিয়ে পালাবার ঘটনাটা বলল। তারপর ভেনকে বলল—ভেন তোমার ওষুধপত্র আছে?

—আমি নিয়ে আসছি।

একটু পরেই ভেন ফিরে এল। হাতে একটা বোয়াম। কাঠের কুঁজো থেকে জল নিয়ে হাতে অল্প একটু ঢালল। বোয়াম থেকে নীল রঙের গুঁড়ো নিল। জলে

মেশাল। একটা আটা আটা জিনিস তৈরি হল। ভেন ফ্রান্সিসের কাটাছড়া জায়গায় আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। ওষুধ লাগাতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। বলল—

—ভেন ভীষণ জ্বালা করছে।

—একটু পরেই আর জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না। সত্যিই তাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই জায়গাগুলো ঠাণ্ডা লাগল।

ফ্রান্সিস শুকনো পোশাক পরল। বলল—ভেন—সেনাপতি এসেছিল। কী বলল সে?

—কী আর বলবে? এসে দ্যাখে এক বুড়ো আর একটি মেয়ে। বলল—তোমাদের দলনেতা এখানে এসেছিল? আমি বললাম—এখানে কেউ আসেনি। বিশ্বাস করল না তবে আর কিছু বললও না। চলে গেল।

—হুঁ—আমার খোঁজ ঠিক চালিয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া দুর্বলকণ্ঠে বলল—এখন কী করবে?

—আমি বাইরেই থাকব। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আর কিছু ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস এসে বিছানায় বসল। মারিয়ার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মারিয়া চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

ভেন উঠে দাঁড়াল। বলল—বেলা হয়েছে। এখন খেয়ে নাও।

ভেন একটু পরে একটা বাটি নিয়ে ঢুকল। মারিয়ার কাছে এসে বলল—নাও চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। মারিয়াকে ফ্রান্সিস ধরে ধরে বসিয়ে দিল। মারিয়া আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে সুজির ঝোলটা খেয়ে নিল। ভেন কাঠের গ্লাশে জল ভরে এগিয়ে ধরল। মারিয়া জল খেল। হেসে বলল—ভেন—তুমি এত ভালো তৈরি করেছো। ভেন ফোকলা দাঁতে হাসল। বলল—জাহাজে কী বা থাকে যে ভালো রাঁধবো। সেই তো এক মাংসের ঝোল।

মারিয়া শুয়ে পড়ল। এবার ভেন আর ফ্রান্সিস চলল খাবার ঘরে বসে খেতে। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—ভেন—মারিয়ার জ্বর তো সম্পূর্ণ সারেনি।

—ঠিকই ধরেছো। কিন্তু রাজকুমারীকে কিছু বলো না। বলবে—জ্বর ছেড়ে গেছে। তুমি এখন সুস্থ। ভেন বলল।

—কিন্তু সত্যি সুস্থ হবে কবে? ফ্রান্সিস বলল।

—আর কয়েকটা দিন লাগবে। ওষুধে কাজ হয়েছে—এটাই সুলক্ষণ। এবার তুমি ভাবো কী করবে। ভেন বলল।

—হুঁ—ওটাই ভাবছি এখন। ফ্রান্সিস বলল।

হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। কারা আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে কাঠের তক্তায় তৈরি বিছানার নিচে ঢুকে গেল। মারিয়া দেখল ঘরের কোনায় ফ্রান্সিসের ভেজা পোশাক রাখা। মারিয়া যত দ্রুত সম্ভব বিছানা থেকে নেমে পোশাকগুলো থেকে টিপে জল বের করতে লাগল।

কারারক্ষী দুজন ঢুকল। হাতে খোলা তরোয়াল। দুজনেই ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। মারিয়াকে দেখল ভেজা পোশাক চিপছে। একজন বলল—এই ভেজা পোশাক কার?

—আমার। ভেন হেসে বলল।

—এত বেলায় চান করলে? কারারক্ষী বলল।

—আমি অনেক সময় সন্ধেবেলাও চান করি। ভেন বলল।

—হুঁ। একজন রক্ষী চলে গেল খাওয়ার ঘরে। ফিরে এসে বলল—খাবার ঘরে দেখলাম দুটো এঁটো থালা। দুজন খেয়েছে।

—আমি আর ভেন খেয়েছি। মারিয়া ভেজা পোশাক নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলল।

—যাক গে—তোমাদের দলনেতা কী নাম যেন ওর?

—ফ্রান্সিস। ভেন বলল।

—হ্যাঁ ফ্রান্সিস। ও এলেই আমাদের খবর দেবে।

—নিশ্চয়ই। ভেন হেসে বলল।

—ওকে ধরতে পারলেই কয়েদঘরে ঢোকানো হবে। রক্ষী বলল।

—বটেই তো। ভেন আবার হেসে বলল।

—বলা যায় না হয়তো রাজা গঞ্জালেস ওকে মৃত্যুগুহায় ঢুকিয়ে দেবে।

—মৃত্যুগুহা? সে আবার কী? ভেন জানতে চাইল।

—মৃত্যুগুহা কী জানো না। কারারক্ষী বলল।

—না। না শুনলে কী করে জানবো। ভেন বলল।

রক্ষীটি তরোয়াল কোষবদ্ধ করে বলল—তবে শোন। কয়েদঘরের পেছনেই দেখবে একটা বড় খাদ। প্রায় এখান অব্দি খাদটা রয়েছে। এই খাদের গায়েই একটা টিলা। সেই টিলায় আছে একটা গুহামত। সেই গুহায় থাকে নররাক্ষস। মানুষ ওখানে গেলেই মেরে ফেলে। ঐ গুহার ধারে কাছেও কেউ যায় না। কারারক্ষী বলল।

—কিন্তু রাজা গঞ্জালেসের তো কত সৈন্য। নররাক্ষসকে মেরে ফেললেই হয়। ভেন বলল।

—নররাক্ষসকে মারা অত সোজা নয়। গুহাটায় একজনের বেশি কেউ ঢুকতে পারবে না। রক্ষী বলল।

—তাহলে দফায় দফায় ঢুকবে একজন একজন করে। ভেন বলল।

—হ্যাঁ যা শুনেছি বলছি। গুহার ভেতরটা নাকি বড়।

কয়েকজন মানুষ দাঁড়াতে পারে। রক্ষী বলল।

—সেই কয়েকজন নররাক্ষসকে মেরে ফেলতে পারে। ভেন বলল।

—অত সহজ নয়। লোক ঢুকলেই নররাক্ষস একটা পাথরের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই ফাটলে ঢুকে আর নররাক্ষসকে আক্রমণ করা যায় না। কারারক্ষী বলল।

—কেন? তরোয়াল বা বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে নররাক্ষসকে মারা যায়। ভেন বলল।

—উঁহু। নররাক্ষস যেখানে ঢুকে পড়ে সেটা একটা লম্বা ফাটল। তরবারি তো নাই বর্শাও অতদূর পর্যন্ত যায় না। তবে কথা হল রাজা গঞ্জালেস সেই নররাক্ষসকে মারতে চান না। বরং বাঁচিয়ে রাখতে চান। রক্ষী বলল।

—কেন বলো তো? ভেন জানতে চাইল।

—যে ফাটলের মধ্যে নররাক্ষস লুকিয়ে পড়ে তাতে আছে হীরে মনি মুক্তোর ভাণ্ডার। নররাক্ষস সেই ভাণ্ডার পাহারা দেয়। এই নররাক্ষসকে পাহারাদার হিসেবে রেখেছিল গঞ্জালেসের পিতা। পাশের রাজ্য সেতুবলের সঙ্গে এই দামিলা রাজ্যের লড়াই চলে আসছে অনেকদিন থেকে। তাই গঞ্জালেসের পিতা এইভাবে তাঁর সঞ্চিত ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। গঞ্জালেসের তাই নররাক্ষসকে পাঁঠা ভেড়া খরগোস এসব প্রতিদিন সকালে গুহার মুখে রেখে আসার জন্যে লোক রেখেছিল। রক্ষী বলল।

—তাহলে তো ঐ কাঁচা মাংসই নররাক্ষস খায়। ভেন বলল।

—হ্যাঁ। আর ধনভাণ্ডার পাহারা দেয়। রক্ষী বলল।

—এই গুপ্তধনের খবর কি সবাই জানে? ভেন জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—টিলার ঢালের দিকে কেউ যায় না। রক্ষী বলল।

—কেউ কি নররাক্ষসকে দেখেছে? ভেন বলল।

—হ্যাঁ মাত্র কয়েকজন। তারাই এসে রটিয়েছে যে নররাক্ষস প্রচণ্ড শক্তিমান—শূন্যে উড়তে পারে, হাতের ঘায়ে—বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙতে পারে। রক্ষী বলল।

—এসব বিশ্বাস করা যায় না। ভেন বলল।

—নানা লোকের নানা মত। কারারক্ষী থামল। তারপর বলতে লাগল—তোমাদের দলনেতাকে বলো ও যেন রাজার কাছে ধরা দেয়। রাজা গঞ্জালেস তাহলে কঠিন শাস্তি দেবেন না। শুধু কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবেন। কিন্তু যদি সে ধরা না দেয় আর হঠাৎ ধরা পড়ে যায় তবে মৃত্যুগুহায় তাকে ঢোকানো হবে। একবার ঢোকানো হলে জীবিত অবস্থায় আর ফিরে আসতে পারবে না। রক্ষী বলল।

—বুঝলাম—সাংঘাতিক শাস্তি। ভেন মাথা এপাশ ওপাশ করতে করতে বলল।

—আচ্ছা—একটা কথা। ভেন বলল।

—বলো। রক্ষী বলল।

—রানি উরাকার সঙ্গে কি গঞ্জালেসের লড়াই হবে? ভেন জানতে চাইল।

—অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি—লড়াই হবেই। রক্ষী বলল।

—কে জিতবে? ভেন বলল।

—রানি উরাকার জেতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রক্ষী বলল।

—কারণ? ভেন বলল।

—রানির অনেক সৈন্য। যুদ্ধজাহাজ আছে। আমাদের রাজা গঞ্জালেস লিসবনে গিয়ে জাহাজ বরাত দিয়ে এসেছেন। শুনলাম কয়েকদিনের মধ্যে সেই জাহাজ আসবে। রক্ষী বলল।

—তাহলে বেশ লড়াই টড়াই হবে। ভেন বলল।

—মনে তো হয়। যাক গে—চলি। আমরা ডেক-এ আছি। তোমাদের দলনেতা এলে আমার কথাগুলো বলো। রক্ষী বলল।

—নিশ্চয়ই বলবো। ভেন বলল।

রক্ষীটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস পাটাতনের নিচের থেকে বেরিয়ে এল। ও সবই শুনেছে। বলল—ভেন— মারিয়া তোমরা কী বল? ধরা দেব?

—দেখ ফ্রান্সিস—মারিয়া বলল—একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হবে রানি ইরাকা আর রাজা গঞ্জালেসের মধ্যে। রাজা গঞ্জালেস চাইবে ওর পৈতৃক ধনসম্পদ যাতে ওর কাছেই থাকে। সেইজন্যে পাহারাদাররা নররাক্ষসের হাত থেকে ঐ ধনসম্পদ উদ্ধার করতে চাইবে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এ কাজটা এই রাজ্যের কেউই পারবে না। তুমি সেই কাজটা করে দেবে বলো তাহলে রাজা গঞ্জালেস সহজেই রাজি হবে। কারণ যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। গুঞ্জালেসের কারারক্ষী যা বলে গেল তাতে পরিষ্কার রাজা গঞ্জালেস যুদ্ধে হেরে যাবে। হেরে গেলে নিজের রাজত্বও যাবে পৈতৃক ধনভাণ্ডারও হারাতে হবে। কাজেই যুদ্ধের আগেই গঞ্জালেস পৈতৃক ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে চাইবে। মরিয়া বলল।

—ঠিকই বলেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা গঞ্জালেস এখন পৈতৃক ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে চাইবে। তুমি রাজা গঞ্জালেসকে গিয়ে বলো যে তুমি নররাক্ষসের কব্জা থেকে ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে দিতে পারবে। মারিয়া বলল।

—হুঁ—এই কাজটা করা খুবই কঠিন। ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই এই কাজে রাজি হওয়ার ঝুঁকি আছে। না পারলে কিন্তু আমাদের বিপদ বাড়বে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—ঠিকই বলেছো। তারপর ফ্রান্সিস বলল—আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। নইলে শরীরে জোর পাবো না।

ফ্রান্সিস হ্যারির ঘরে চলে গেল। বিছানা পাতাই ছিল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বন্ধুদের কথা ভাবতে লাগল। কী করে সবাইকে মুক্ত করা যায়। মারিয়ার অসুখটা সেরে গেছে দেখে ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন বিকেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও মারিয়ার কাছে এল। দেখল

মারিয়া ঘুমুচ্ছে। ভেন মেঝেয় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ডাকল—ভেন মারিয়াকে ওষুধ দিয়েছো।

—হুঁ।

—ওর শরীর কেমন দেখলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। রাজকুমারী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ভেন বলল।

—বাঁচালে। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসদের কথাবার্তায় মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল— ফ্রান্সিস—সূর্যাস্ত হয়ে গেছে?

—না। কিছুক্ষণ দেরি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ভেন—ফ্রান্সিস তো যেতে পারবে না। তুমি আমাকে ডেক-এ নিয়ে চলো। সূর্যাস্ত দেখবো। মারিয়া বলল।

ভেন উঠে দাঁড়াল—চলুন। তবে খুব সাবধানে হাঁটতে হবে। আমি বুড়ো মানুষ। আপনাকে শক্ত করে ধরে থাকতে পারবো না।

—ঠিক আছে। আমি শরীরে কিছু জোর পাচ্ছি। চলো। মারিয়া বলল।

মারিয়া উঠে বসল। তারপর বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেমে এল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমার কষ্ট হবে। যেও না।

—না-না একনাগাড়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে কারো ইচ্ছে করে? আমার জন্যে ভেবো না। মারিয়া বলল।

ভেন মারিয়ার হাত ধরল। দুজনে আস্তে আস্তে দরজার দিকে চলল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মারিয়া দু'একবার সিঁড়ির ধাপ ভুল করল। ভেন কাঁধ ধরে মারিয়াকে ঠিক রাখল।

দুজনে যখন ডেক-এ উঠে এল তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। দুজনে ডেক-এ উঠে রেলিঙের দিকে এগোতে লাগল। রক্ষীরা জাহাজের সামনের দিকে পাহারা দিচ্ছিল। ওরা মারিয়া আর ভেনকে দেখল। কিছু বলল না।

পশ্চিম আকাশটা তখন গোলাপি। সূর্যের রঙ গাঢ় গোলাপি। আস্তে আস্তে গোল সূর্য নিচে নামতে লাগল। পশ্চিম আকাশে তখন গোলাপি রঙের প্লাবন। জলের ঢেউগুলোও গোলাপি রঙীন।

আস্তে আস্তে সূর্য টুপ করে যেন সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। পশ্চিম আকাশে অনেকক্ষণ লেগে রইল গোলাপি রং। তারপর আস্তে আস্তে আকাশ কালো হয়ে গেল। রুপোলি চাঁদ দেখা গেল।

মারিয়া আর ভেন আস্তে আস্তে নিচে কেবিনঘরে নেমে এল। মারিয়া তখন একটু হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—শুয়ে পড়ো। মারিয়া বিছানায় বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল শরীরের দুর্বলতাটা আছে এখনও।

ফ্রান্সিস পোশাক পরে তৈরি হল। বলল—ভেন—একটা উপায় বের করো তো। এভাবে জলে নেমে ডুবসাঁতার দিয়ে যেতে হবে— এ তো পারা যায় না।

ভেন বলল—দাঁড়াও। আগে খেয়ে নাও। দুজনে খাবার ঘরে এল। বিকেলের খাওয়া সেরে নিল।

দুজনে মারিয়ার কাছে এল। মারিয়া অভিমানের সুরে বলল—ভেন আমার খিদে পেয়েছে।

—ঠিক আছে। আপনার খাবার তৈরি করছি। ভেন বলল। তারপর ফ্রান্সিসকে বলল তুমি কাঠের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি একটা মতলব ঠাউরেছি।

ভেন চলে গেল। একটু পরে সিঁড়িতে ভারি জুতোর শব্দ উঠল। কারারক্ষীরা আসছে। ফ্রান্সিস কাঠের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

ভেন রক্ষীদের খাবার ঘরে নিয়ে গেল। তারপর নিজেদের দেশের ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল—পলায়ন। ফ্রান্সিস আর মারিয়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। বোঝাই যাচ্ছে ভেন রক্ষী দুজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে। খাবার ঘর থেকে ভেন-এর জোর গলার শব্দ ভেসে আসছে—কী কাণ্ড! মাত্র এইটুকু খেলেন। খান— খান —তৃপ্তি করে খান। আমার রান্নার হাত খুব খারাপ না।

ফ্রান্সিস এবার হেসে ফেলল। মারিয়াও হাসছে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া দেরি করল না। পাটাতনের নিচে থেকে ওর তরোয়ালটা বের করে কোমরে ঝোলাল। কেবিনঘর থেকে. বেরিয়ে এল। সিঁড়িতে কোনরকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। ডেক-এ উঠে এল।

দ্রুতপায়ে পাতা পাটতনে নেমে জোরে হেঁটে বালিয়াড়িতে নেমে এল। উঁচু পাড়ে উঠে চলল কয়েদঘরের দিকে।

তখন রাত হয়ে গেছে। কয়েদঘরের লোহার দরজার দুপাশে টানা পাথরের বারান্দায় মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস কয়েদঘরের পেছনে এল। কী করে হ্যারিদের জানাবে যে সে মুক্ত আর মারিয়াও অনেকটা সুস্থ।

জায়গাটা একটা মাঠের মত। তারপরেই টানা খাদ। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। সেই আলোতেই দেখা যাচ্ছে খাদটা আর ওপাশের টিলাটা। ঐ টিলাতেই একটা গুহায় নাকি থাকে এক নররাক্ষস। ধনভাণ্ডার পাহারা দেয়। ওখানে যাবে বলেই ফ্রান্সিস তরোয়াল নিয়ে এসেছে। সেই নররাক্ষস কেমন শক্তিশালী সেটা একটু দেখতে হয়। আর হ্যাঁ এই রাতেই।

খোলা জায়গাটায় ফ্রান্সিস পায়চারি করতে লাগল। কীভাবে বন্দী বন্ধুদের কাছে খবর পৌঁছানো যায়।

চাঁদের আলোয় দেখল মাঠমত জায়গাটায় ছোট ছোট নুড়ি পাথর ছড়ানো। একটা উপায় মনে এল। ও নিচু হয়ে কয়েকটা নুড়ি তুলে নিল। তারপর কয়েদঘরের উঁচু জানালার ফোকরটা দেখল। নিশানা করে একটা নুড়ি ছুঁড়ল। নুড়িটা এক বন্ধুর পিঠে লাগল। ও জানালার ফোকরের দিকে তাকাল। কিন্তু ওখান থেকে নুড়ি খসে আসবে কী করে। ও কিছু বলল না। এবার আর একটা নুড়ি এক বন্ধুর মাথায় লাগল। বন্ধুটি চেঁচিয়ে উঠল—নুড়ি ছুঁড়ছে কে? আগের

বন্ধুটিও বলল আমারও পিঠে পড়েছে একটা। বন্ধুদের মধ্যে কথা শুরু হল।
ফ্রান্সিস আর একটা নুড়ি ছুঁড়ল। এবার লাগল হ্যারির কাঁধে। হ্যারি চিৎকার করে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস ছুঁড়ছে এই নুড়িগুলো। ফ্রান্সিস মুক্ত। সবাই ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। ফ্রান্সিস হাসল—যাক বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে যে ও মুক্ত।

হ্যারি শাঙ্কোকে বলল—ঐ জানালার দিকে মুখ বার করে বল — রাজকুমারী কেমন আছেন? শাঙ্কো মুখের কাছে দুহাতের চেটো গোল করে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল—রাজকুমারী কেমন আছেন? ফ্রান্সিস বাইরে থেকে গলা চড়িয়ে বলল— ভালো। ভাইকিং বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হল।

ফ্রান্সিসের উচ্চস্বরে বলা কথাটা শুনে কয়েদঘরের সামনে থেকে একজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে খাদের ধারের একটা গাছের গোড়া ধরে খাদে ঝুলে পড়েছে। কারারক্ষীটি এসে এদিক ওদিক বারকয়েক তাকাল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ওর মনে হল ও ভুল শুনেছে। ও চলে গেল।

ফ্রান্সিস গাছের গোড়া ধরে উঠে এল। দেখল খাদ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে জংলা গাছপালা। ও ঐদিকেই চলল। জংলা গাছপালার কাছে এল। গাছপালার মধ্যে দিয়ে খাদের ঢালটার কাছে এল। ও ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। ডানপাশে একটু দূরেই টিলাটা উঠে গেছে। টানা খাদের মধ্যে ছোট ছোট গাছ জংলা ঝোপ।

ঝোপ জঙ্গল ঠেলে ফ্রান্সিস চলল। চাঁদের আলোয় টিলার এবড়ো খেবড়ো গা দেখতে দেখতে চলল। কয়েকটা ফাটল দেখল। দুটো বড় গুহার মুখ দেখল। কিন্তু রক্ষী বলেছিল ছোট গুহার মধ্যে নররাক্ষস থাকে। হঠাৎ একটা ছোট গুহা দেখল। হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায় এমন।

ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। তরোয়াল খুলে গুহাটার দিকে যাচ্ছে তখনই পেছনে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ কানে এল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল একটা মানুষের মত কিছু ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। চাঁদের আলোয় এক ঝলক দেখল—বড় বড় ধূসর রঙের চুল মাথায়। দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সারা শরীরে বড় বড় কালো লোম। চোখ দুটো বড় বড়। তাতে হিংস্রতা। বড় বড় দাঁত। বোধহয় হাসছে। ফ্রান্সিসের চিন্তায় খেলে গেল— নররাক্ষস! ফ্রান্সিস কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নররাক্ষসের গলা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। কিন্তু নররাক্ষস দ্রুত ঘুরে যাওয়ায় তরোয়ালের ঘা লাগল না। নররাক্ষস মুখে শব্দ করল—ওঁক্। নররাক্ষস সঙ্গে সঙ্গে তরোয়ালের ফলাটা দুহাতে চেপে ধরল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান মারল। তরোয়াল খুলে এল। নিশ্চয়ই নররাক্ষসের আঙ্গুল কাটা পড়েছে। নররাক্ষস হাত দুটো চোখের সামনে আনল। ফ্রান্সিস দেখল দুটো আঙ্গুল কাটা পড়েছে। নররাক্ষস গোঙাতে গোঙাতে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা মাটিতে বসিয়ে হাঁপাতে লাগল। সতর্ক দৃষ্টিতে

চারদিকে তাকাতে লাগল। যদি নররাক্ষস ফিরে আসে। বেশ কিছুক্ষণ কাটল। নররাক্ষস আর ফিরে এলো না।

ফ্রান্সিস বুঝল সামনের ছোট গুহাটাতেই নররাক্ষস থাকে। আহত নররাক্ষসটা বোধহয় গুহায় ঢোকেনি। অন্যদিকে চলে গেছে।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। একটা গাছের গুঁড়ি কাণ্ড বেয়ে গাছের মাথায় উঠল। ওখান থেকে ডাল ধরে ঝুঁকে খাদের ওপাশের মাটিতে নেমে এল। তরোয়াল কোমরে গুঁজল। চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

সমুদ্রতীরে এসে চিন্তা হল জাহাজে ওঠা নিয়ে। আবার জলে নেমে ভিজে জাহাজে উঠতে ইচ্ছে হল না। একটা কাজ তো ওকে করতেই হবে—সেটা হল রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে দেখা করে নররাক্ষসকে মেরে ধনসম্পদ উদ্ধার করবার কথা বলতে হবে। বিনিময়ে বন্ধুদের মুক্তি।

কাজেই এই দুই কারারক্ষীকে এখন তাড়াতে হবে।

ফ্রান্সিস সোজা বালিয়াড়ি পার হয়ে পাতা পাটাতনের কাছে এল। দুই কারারক্ষী ফ্রান্সিসকে দেখেই চিনল। দুজনে লাফিয়ে উঠল। কোমর থেকে তারোয়াল খুলল। ভাইকিংদের দলনেতাকে পাওয়া গেছে। একে বন্দী করতে পারলে সেনাপতি ওদের পিঠ চাপড়াবে।

ফ্রান্সিস জাহাজে উঠতেই দুজনে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা কাছাকাছি আসতেই বলল—তোমরা কি লড়াই চাও?

—হ্যাঁ—লড়াই করে তোমাকে হারিয়ে তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবো। একজন কারারক্ষী বলল।

—কী দরকার লড়াইয়ে। আমি নিজেই কাল সকালে রাজা গঞ্জালেসের রাজদরবারে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব বুঝি না। সেনাপতির হুকুম জীবিত বা মৃত তোমাকে তাঁর কাছে হাজির করতে হবে। রক্ষীরা বলল।

—বাবা—সেনাপতি দারুণ ফরমান দিয়েছে তো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

একজন রক্ষী তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের সামনে লাফিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল— আমাকে তরোয়ালটা খুলতে দাও ভাই।

—খোলো তরোয়াল। কারারক্ষীটি বলল।

—শেষবার বলছি—লড়াই বন্ধ রাখো। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না আমরা তোমাকে লড়াইয়ে হারিয়ে বন্দী করে নিয়ে যাবো। রক্ষী বলল।

—ও। বেশ তাহলে লড়াই-ই হোক। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে এখানকার জোরে জোরে কথাবার্তা শুনে ভেন ডেক-এ উঠে এল। ও রক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কি পাগল—ফ্রান্সিসের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই করতে চাও?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ চাই। রক্ষীরা বলল।

—ফ্রান্সিস মেরে ফেলো না। একটু রয়ে সয়ে তরোয়াল চালিও। ভেন ফ্রান্সিসকে বলল।

ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। একজন রক্ষী ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ফ্রান্সিসের ওপরে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস মারটা ঠেকাল। অন্যজনও তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস ওর মারও ঠেকাল। ওরা লাফালাফি করে তারোয়াল চালাতে লাগল। ফ্রান্সিসও ওদের মার ঠেকিয়ে চলল। ওরা হাঁফাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস একজন রক্ষীর তরোয়ালে এমন ঘা মারল যে তরোয়াল ছিটকে নিচের বালিয়াড়িতে গিয়ে পড়ল। সেই রক্ষী হাঁ করে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস ওর গলায় তরোয়াল ঠেকিয়ে বলল—আরো লড়াই করার ইচ্ছে আছে।

অন্য রক্ষীটি এই দেখে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্রান্সিস দ্রুত তরোয়াল চালাল। রক্ষীটি পিছিয়ে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালিয়ে চালিয়ে ওকে রেলিঙের ধারে নিয়ে এল। তারপর দ্রুত তরোয়াল চালিয়ে ওর পোশাকের বুকের দিকটা লম্বালম্বি কেটে দিল। কিছুটা কেটেও গেল। রক্ত পড়তে লাগল। রক্ষীটি হাঁপাতে লাগল।

—বাছাধনরা এবার বাড়ি যাও। ভেন বলল।

ফ্রান্সিস বুকের কাছে পোশাক কাটা রক্ষীটির হাত থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে জলে ফেলে দিল। তারপর ওকে দুহাতে তুলে ধরে জলে ফেলে দিল। বলল—যা তরোয়াল খোঁজ গে।

একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—ভেন—মারিয়া কেমন আছে?

—খুব ভালো। রাতে ডিমসেদ্ধ খেতে চেয়েছে। ভেন বলল।

—না—না—কটা দিন খাওয়া দাওয়াটা মানে তোমরা যাকে সহজপাচ্য বল—তাই খাওয়াও। ফ্রান্সিস বলল।

—এসব আমার হাতে ছেড়ে দাও। চলো। ভেন বলল।

জাহাজ থেকে ওরা দেখল দুই কারারক্ষী বালিয়াড়ি পার হয়ে তীরের প্রান্তরে উঠল। ফ্রান্সিস ভাবল—ওরা নিশ্চয়ই গিয়ে সেনাপতিকে সব বলবে। সেনাপতিও আমার খোঁজে এখানে আসবে। আবার ঝামেলা। যাকগে—যা হবার হবে। কালকে সকালে রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

একটু অন্যমনস্কভাবেই ফ্রান্সিস খাওয়া দাওয়া সারল। মারিয়া এখন অনেকটা সুস্থ। ভেন কিন্তু মারিয়াকে অল্পসেদ্ধ ডিম খেতে দিল। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। ভেন রাজবৈদ্যের শিষ্য ছিল। ও যা ভালো বোঝে করুক।

বেশ রাত তখন। হঠাৎ ডেক-এ অনেক পায়ের শব্দ। ভেনই প্রথম শব্দটা শুনতে পেল। ও উঠে পড়ল। নিচে নামার সিঁড়ির কাছে এল। দেখল কিছু সশস্ত্র সৈন্যের সঙ্গে বোধহয় সেনাপতিই নামছে। ভেনকে দেখে জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস কোথায়?

ভেন বলল—আসুন। সবাই ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি দরজায় ধাক্কা দিল।

ফ্রান্সিসের কানেও শব্দ গেছে। ও উঠে পড়েছে ততক্ষণে। মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বলল কী ব্যাপার?

—সেনাপতি এসেছে—আমায় বন্দী করবে বোধহয়? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পালাও। মারিয়া বলল।

—দেরি হয়ে গেছে—পালানো যাবে না। ফ্রান্সিস বলল। দরজায় তখনও ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে। ফ্রান্সিস বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল। দরজা খুলে দাঁড়াল।

সেনাপতি বলল—তাহলে পালাওনি।

—পালাবার তো কোন কারণ ঘটেনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার দুই কারারক্ষীকে তুমি আহত করেছো। সেনাপতি বলল।

—মেরে তো ফেলিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আর দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলতে পারতে না।

তার আগেই—যাক গে—তুমি কি আমাদের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চালাতে চাও। আমার দুজন তরোয়াল দক্ষ সৈন্যকে এনেছি। তুমি লড়বে?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না।

—না লড়েই পরাজয় স্বীকার করলে। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

সেনাপতি হাসল। বলল—তবে যে শুনি ভাইকিংরা বীর দুঃসাহসী। তরোয়াল চালনায় দক্ষ।

—সেটা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রমাণ পাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—থাক গে—তোমাকে বন্দী করা হল। সেনাপতি বলল।

—তাহলে তো আমাকে কয়েদঘরে গিয়ে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই। সেনাপতি বলল। তারপর মারিয়াকে আর ভেনকে দেখিয়ে বলল—এরাও তো বন্দী ছিল।

—হ্যাঁ—রাজকুমারী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাই তাঁকে চিকিৎসার জন্যে এখানে আনা হয়েছিল। ঐ বৃদ্ধ ভেন—আমাদের চিকিৎসক—বৈদ্য। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। এরা এখানেই থাকুক। তুমি চলো। সেনাপতি বলল।

—এখুনি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কোন ব্যাপারে দেরি করা আমি পছন্দ করি না। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি দরজার দিকে এগোল। ফ্রান্সিস পেছনে। পিছু ফিরে ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—দুশ্চিন্তা করো না। আমরা মুক্তি পাবোই। মারিয়া স্থির বিছানায় বসে রইল। সবাই চলে গেলে মারিয়া বালিশে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসকে নিয়ে জাহাজ থেকে নামল। সঙ্গের তিনজন ঘোড়সওয়ার সৈন্যও নামল।

বালিয়াড়ি পার হয়ে ঘাসের প্রান্তরে এল। একজন সৈন্য তিনটি ঘোড়ার লাগাম ধরেছিল।

সবাই ঘোড়াগুলোর দিকে এল। সেনাপতি নিজের ঘোড়ায় উঠল। সৈন্য দুজনও ঘোড়ায় উঠল। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে বলল—তুমি একজনের পেছনে বসো। ফ্রান্সিস একজন সৈন্যের পেছনে বসল। তিনটি ঘোড়া ছুটল।

ফ্রান্সিস ওপরে তাকাল। আকাশ অনেকটা সাদাটে হয়ে এসেছে। ভোর হতে দেরি নেই। রাজধানী দামিলা পৌঁছোবার আগেই সূর্য উঠল। রোদ ছড়াল বাঁপাশে জঙ্গলের মাথায় প্রান্তরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সকলে দামিলা পৌঁছল। সেনাপতি ঘোড়া চালিয়ে কয়েদঘরের সামনে এল। পাহারারত এক রক্ষীকে ডাকল। রক্ষী এগিয়ে এল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে সেনাপতি বলল— এটাকে কয়েদঘরে ঢোকা। রক্ষীটি একটা বড় চাবি নিয়ে কয়েদঘরের তালা খুলল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। নিজেই কয়েদঘরে ঢুকল।

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে যারা জেগে উঠেছিল তারা ফ্রান্সিসকে ঢুকতে দেখে অবাক। ওরা তখন ভাবছিল ফ্রান্সিস মুক্ত থাকলে তবু পালাবার আশা ছিল। কিন্তু এখন তো সেই আশা আর রইল না। তবু ফ্রান্সিসকে দেখে ঘুম ভেঙে গেল। ওরাও ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-। বাকি বন্ধুদের ঘুম ভেঙে গেল। ওরাও ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির পাশে গিয়ে বসল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস, তুমি ধরা দিলে কেন? সব বন্ধুরা তখন বসে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরেছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল এখন কী করবে।

—রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে দেখা করবো। বলবো যদি আমাকে আর আমার বন্ধুদের মুক্তি দেন তাহলে ঐ নররাক্ষসের হাত থেকে আপনার পৈতৃক ধনসম্পদ উদ্ধার করে দিতে পারি। দেখি রাজা গঞ্জালেস কী বলে। ফ্রান্সিস বলল।

কিছু পরেই ঢাং ঢ্যাং শব্দে দরজা খুলে গেল। সকালের খাবার দিতে দুজন সৈন্য ঢুকল। প্রত্যেকের সামনে পাতা পেতে গোল রুটি আর তরকারির ঝোল দিল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে সৈন্য দুজন চলে গেল। শব্দ তুলে দরজা বন্ধ হল। ফ্রান্সিস লোহার দরজার সামনে গেল। একজন রক্ষীকে বলল—আমি সেনাপতির সঙ্গে কথা বলবো। সেনাপতিকে ডাকো।

—উনি এখন বিশ্রাম করছেন। ডাকা যাবে না। রক্ষীটি বলল।

ফ্রান্সিস লোহার দরজা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল নিকুচি করেছে বিশ্রামের। তুমি ডাকো। ফ্রান্সিসের চড়া গলা শুনে বন্ধুরা এগিয়ে এল। একসঙ্গে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-

রক্ষীটি বেশ ভীত হল। অন্য রক্ষীটি এগিয়ে এল। সব শুনে বলল—দরজা ধাক্কানো বন্ধ কর। আমি সেনাপতিকে ডেক-এ আনছি।

রক্ষীটি চলে গেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরাও ফিরে গেল নিজের নিজের জায়গায়। কিছু বসল, কিছু শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। লোহার দরজার সামনে এসে বলল—কী ব্যাপার? তোমরা নাকি হৈ চৈ করছো। লোহার দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছো?

ফ্রান্সিস উঠে এল। বলল—আপনার সঙ্গে আমার খুবই প্রয়োজন। তাই একজন রক্ষীকে বললাম—আপনাকে ডেক-এ দেওয়ার জন্য। ও শুনল না কথা। তাই আমার ক্রুদ্ধ বন্ধুরা ধ্বনি তুলেছে। দরজায় ধাক্কা দিয়েছে।

—যাক গে—শান্ত হয়ে না থাকলে কিন্তু সবাইকে বেত মারা হবে। সেনাপতি বলল।

—খুব ভালো কথা—ফ্রান্সিস বলল—তারপর বলল—রাজসভা বসলে আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কেন? সেনাপতি বলল।

—আমার কয়েকটা জরুরী কথা বলার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজার সামনে আজেবাজে বকবে না। সেনাপতি বলল।

—আজেবাজে নয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রাজসভা বসলে তোমাকে আমার সৈন্যরাই এসে নিয়ে যাবে। সেনাপতি বলল।

—অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি চলে গেল। রক্ষীরা পাহারা দিতে লাগল।

একটু বেলায় দুজন সৈন্য কয়েদঘরের সামনে এল। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল—ফ্রান্সিস কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—আমি।

—সেনাপতি তোমাকে রাজদরবারে নিয়ে যেতে বলেছেন। একজন সৈন্য বলল।

—চলো ভাই। আমি তৈরি। ফ্রান্সিস বলল।

ঢং ঢঢাং শব্দে দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল। সৈন্য দুজনের সঙ্গে চলল রাজবাড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস রাজসভায় এল। তখন বিচার চলছে। সেনাপতির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবেন।

—দাঁড়াও—দেখছি। সেনাপতি বলল।

বিচারটা শেষ হল। সেনাপতি একটু এগিয়ে গিয়ে মাথা একটু নিচু করে

আর অস্ত্র বর্ম ওরা যা চায় দিন।

ফ্রান্সিস রাজা গঞ্জালেসকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজাসভার বাইরে এল। সেনাপতি ওর সঙ্গে এল। দুজনে চলল কয়েদঘরের দিকে।

সেনাপতি কয়েদঘরের রক্ষীদের আদেশ করল—এই যুবক যে দুজন বন্ধুর মুক্তি চাইবে তাদের মুক্তি দাও। তারপর অস্ত্রঘরে গিয়ে ওরা যা যা অস্ত্র চায়—দেবে।

সেনাপতি বলল—কবে যাবে নররাক্ষসের গুহায়?

—আজ দুপুরে খেয়েদেয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ—নররাক্ষসদের সঙ্গে লড়তে পারো কিনা। ওকে মেরে ফেলার সাধ্য কারো নেই। খুব বেশি হলে ওকে আহত করতে পারো। কিন্তু সেটা করতে গিয়েও তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সেনাপতি বলল।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—নররাক্ষসকে আমরা হত্যা করবো। রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক সম্পদ উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—দেখা যাক। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি চলে গেল। ফ্রান্সিস রক্ষীকে বলল—আমরা দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবো। তখন আমাদের মুক্তি দিয়ো। অস্ত্রঘরেও তখন যাবো।

রক্ষী দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস ঢুকল। বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বসল। বলল—খাওয়া হয়ে গেলে আমি শাঙ্কো আর বিস্কো নররাক্ষসকে নিকেশ করতে যাবো। তোমরা আমাদের সাফল্য কামনা কর। হ্যারি আস্তে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-। বন্ধুরাও একসঙ্গে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—আমি তোমাদের মুক্তি চেয়েছিলাম। কিন্তু বাদ সাধলেন মন্ত্রীমশাই। তিনি বললেন—নররাক্ষসকে হত্যা করতে পারলে আমার বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া হবে।

ফ্রান্সিস রক্ষীকে ডাকল। রক্ষী দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো বিস্কো বেরিয়ে এল। রক্ষী ওদের নিয়ে চলল অস্ত্রাগারে।

অস্ত্রাগারের সামনেও রক্ষীদের পাহারা। কয়েদঘরের রক্ষী ওদের কাছে গেল। বলল—সেনাপতির হুকুম—এই তিনজন যা যা চায় তা এদের দিতে হবে। রক্ষী অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দিল। তিনজনে অস্ত্রাগারে ঢুকল। তিনজনেই তরোয়াল নিল। বর্ম শিরস্ত্রাণ নিল। পরল সেসব। একটা মশাল আর চকমকি পাথর নিল। তারপর তরোয়াল কোমরে গুঁজে বেরিয়ে এল। অস্ত্রাগারের রক্ষী বলল—তোমরা কার সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছো?

—নররাক্ষসের সঙ্গে। বিস্কো বলল।

—বলো কি। রক্ষী বলে উঠল। রক্ষীদের একজন বলল—তোমাদের প্রাণটা বেঘোরে যাবে। আজ পর্যন্ত কেউ নররাক্ষসকে আহতও করতে পারেনি।

—আমি ওর দুটো আঙ্গুল কেটে দিয়েছি। গিয়ে দেখে আসতে পারো। ফ্রান্সিস বলল।

—এ অসম্ভব। রক্ষী বলল।

—আমরা অসম্ভবকেই সম্ভব করি। আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল। সব রক্ষীরা অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল।

তিনজনে চলল খাদের দিকে। খাদের একেবারে শেষে এসে ঢাল দিয়ে নামল। তারপর খাদ দিয়ে চলল। খাদে জংলা গাছ ঝোপ কয়েকটা বড় গাছ। তিনজনে চলল। সামনে ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস গতকালের দেখা ছোট গুহাটার সামনে এল। বলল—নররাক্ষস নিশ্চয়ই এই গুহাটায় থাকে। গুহা দেখে বিস্কো বলল—আমাদের তো শুয়ে পড়ে ঢুকতে হবে।

—হ্যাঁ। নররাক্ষসকে ডাকাডাকি করা যাক। বেরিয়ে এলে লড়াইটা এখানেই হতে পারে। শাঙ্কো বলল।

তিনজনে গুহার মুখে এসে ডাকতে লাগল—নররাক্ষস বেরিয়ে আয়। তোর সঙ্গে আমরা লড়তে এসেছি। সাহস থাকে তো গুহা থেকে বেরিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ সময় গেল। নররাক্ষস বেরিয়ে এল না। ফ্রান্সিস বলল—ও বেরিয়ে আসবে না।—এটা বোঝা যাচ্ছে। যাকগে—আমাদেরই ঢুকতে হবে। তার আগে দুটো কাজ। একটা লম্বা গাছের ডাল চাই। আর মশালটা জ্বালতে হবে।

ফ্রান্সিস দেখল কিছু দূরে একটা ওক গাছ। বলল—ভুলে কুড়ুলটা আনা হয়নি। তরোয়ালের কোপ দিয়ে ডালটা কাটতে হবে। চলো।

ওক গাছটা থেকে একটা লম্বা ডাল বেছে নিল। তিনজনে গাছে বেয়ে বেয়ে উঠল। ডালটার কাছে এল। তরোয়ালের ঘা মারতে লাগল ডালটার গোড়ায়। খুব মোটা ডাল নয়। তিনটি তরোয়ালের পরপর কয়েকটা কোপে ডালটা কেটে গেল। নিচে ঝোপ ঝাড়ে পড়ল।

তিনজনে নেমে এল। গুহার মুখের কাছে এল। চক্‌মকি ঠুকে বিস্কো মশালটায় আগুন লাগাল। ফ্রান্সিস মশালটা হাতে নিয়ে বলল—চলো।

গুহার মুখে ফ্রান্সিস প্রায় শুয়ে পড়ল। তারপর গুহাটায় ঢুকে গেল। একটু যেতেই দেখল গুহাটা বেশ বড়। ফ্রান্সিস মশালের আলোয় চারপাশ দেখতে লাগল। এবড়ো খেবড়ো পাথরের গা। ফ্রান্সিস কাটা ডালটা টেনে নিল।

ততক্ষণে বিস্কো শাঙ্কো ঢুকে পড়েছে। এতক্ষণে দুর্গন্ধে তিনজনেরই গা গুলিয়ে উঠল।

হঠাৎ ওরা দেখল পাথুরে গায়ে একটা বড় ফাটলের মত। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নররাক্ষস। ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল—সাবধান। গুহার পাথরে পাথরে কথাটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। নররাক্ষসকে প্রথম দেখেছিল ফ্রান্সিসই। এবার শাঙ্কো দেখল। ফ্রান্সিস আগেই তরোয়াল কোমরের ফেট্টি থেকে খুলে বের করেছে। শাঙ্কো আর বিস্কোও এবার তরোয়াল খুলল।

নররাক্ষস হো হো করে হেসে উঠল। গুহাটায় সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নররাক্ষস গুহার গায়ের একটা বড় ফাটল দিয়ে ছোট গুহায় ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ ছোট গুহাটায় নররাক্ষস ঢুকে পড়ে বলেই কেউ ওকে সামনা সামনি লড়াইয়ে নামাতে পারে না। ঐ গুহাটায় ঢুকতে গিয়েই বোধহয় এর আগে যারা নররাক্ষসকে হত্যা করতে এসেছিল তারা নিজেরাই মারা পড়েছে। ঐ গুহায় আমরা এখন ঢুকবো না।

ফ্রান্সিস গাছের লম্বা ডালটা টেনে নিল। ফ্রান্সিস বলল—হাত লাগাও। তিনজনে মিলে লম্বা ডালটা ছোট গুহাটায় ঢোকাল। তারপর ডালটা ঘোরাতে লাগল। এই ডালটা তরোয়াল বা বর্শা নয়। অনেকদূর গেল ডালটা। ডালের খোঁচা খেয়ে উত্যক্ত করতে লাগল নররাক্ষসকে। নররাক্ষস আর লুকিয়ে আক্রমণ করতে পারল না। গুহা থেকে কুঠার হাতে বেরিয়ে এল। কুঠারটা বেশ বড়। অত্যন্ত ধারালো মুখটায় মশালের আলো পড়ে চক্‌চক্‌ করছে।

নররাক্ষস কুঠার হাতে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিস্কো সরে যেতে গিয়েও পারল না। কুঠারের মুখটা বিস্কোর কাঁধ ছুঁয়ে গেল। অনেকটা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—বিস্কো পেছনে সরে যাও। বিস্কো পেছনে সরে গেল। এবার ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে লাগল। শাঙ্কোও তরোয়াল উঁচিয়ে আঘাত করার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস তরোয়াল চালিয়ে কুঠারের সঙ্গে লড়তে লাগল। অত্যন্ত শক্তিধর নররাক্ষস অনায়াসে ঐ ভারি কুঠারটা ঘোরাতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল বেশিক্ষণ লড়াই চালাতে পারবে না।

ফ্রান্সিস হঠাৎ লাফ দিয়ে নররাক্ষসের সামনে গিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে বসে পড়ল। নররাক্ষস কুঠার চালাল। কিন্তু কুঠার ঘুরে গেল ফ্রান্সিসের মাথার ওপর দিয়ে। এই সুযোগটাই পেতে চাইছিল ফ্রান্সিস। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তরোয়ালের কোপ বসাল নররাক্ষসের ডান কাঁধে। তরোয়ালটা গেঁথে গেল যেন। রক্ত ছুটল। নররাক্ষস কুঠার চালানো থামল। ফ্রান্সিসদের মন পড়ল নররাক্ষসের দুটো আঙ্গুলও কেটে দিয়েছিল। ও বুঝতে পারছিল নররাক্ষস কুঠারটা খুব শক্ত করে ধরতে পারছে না। শরীরে জোরটাও কমে এসেছে।

নররাক্ষসের গা রক্তাক্ত হয়ে গেল। ওদিকে শাঙ্কো তখন সুযোগ খুঁজছে। পেয়েও গেল সুযোগ। নররাক্ষস তখন কুঠার মাথার ওপর তুলে ধরেছে। শাঙ্কো বিদ্যুৎগতিতে দুপা এগিয়ে তরোয়ালের কোপ বসাল নররাক্ষসের পায়ে। পা কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। নররাক্ষস হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নররাক্ষসের মাথায় সজোরে তরোয়ালের কোপ বসাল। মাথা কেটে গেল। রক্ত বেরোলো। রক্তধারা নররাক্ষসের চোখে মুখে নেমে এল।

নররাক্ষস চিৎকার করে উঠল। ঐ প্রচণ্ড চিৎকারে গুহাটা যেন কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত বিস্কো ভাবল। তারপর ছুটে এসে নররাক্ষসের বুকে তরোয়াল

প্রচণ্ড জোরে ঢুকিয়ে দিল। তরোয়ালটা আর বের করল না। তরোয়ালটা বুকে বিঁধে রইল। নররাক্ষস গুহার মেঝেয় পড়ে গেল। এপাশ ওপাশ গড়াতে লাগল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। দজনেই ভীষণ হাঁপাতে লাগল।

নররাক্ষস গোঙাতে লাগল। নররাক্ষস মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। তারপর স্থির হয়ে গেল। নররাক্ষস মারা গেল।

ফ্রান্সিস একটা পাথরের চাঙের ওপর বসল। বিস্কো পাশে বসল। ফ্রান্সিস বিস্কোর কাটা জায়গাটা দেখল। তখনও রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস কোমরের কাপড়ের ফেট্টিটা খুলল। লম্বা করে এক ফালি ছিঁড়ল। বিস্কোর আঘাতের জায়গাটা ভালো করে বেঁধে দিল। ব্যথাটা কমল বিস্কোর।

শাঙ্কো তখন নররাক্ষসের গুহাটা দেখছিল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—এই গুহাটায় একজন ঢুকতে পারবে?

ফ্রান্সিস বলল—ঐ গুহাতেই রয়েছে রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক ধনভাণ্ডার। ওসব বের করে আনতে হবে। কিন্তু মশাল নিয়ে ঢোকা যাবে না।

ফ্রান্সিস তরোয়ালটা বিস্কোর হাতে দিল। ছোট গুহাটার কাছে গেল। মাথা ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারে আরো ঢুকল। অন্ধকারে হাতে কী যেন ঠেকল। আরো ঢুকে জিনিসটা হাত দিয়ে দেখে বুঝল একটা বাক্স। লম্বাটে।

ফ্রান্সিস বাক্সের কড়াটা ধরে টানতে টানতে অন্ধকারে নিয়ে চলল গুহার মুখের দিকে। গুহার মুখ দিয়ে ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে বেরিয়ে এল। বাক্সটা উঁচু কর ধরে নেমে এল। দেখা গেল একটা পেতলের বাক্স। বাক্সটা সারা গায়ে লাল নীল সবুজ মিনে করা। তারই মধ্যে মধ্যে হীরের টুকরো বসানো। ফ্রান্সিস বাক্সটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কোন চাবির ফুটো নেই। তাহলে টানা আছে। ও একপিঠের ঢাকাটা ঠ্যালা দিল। টানা পরে খুলে গেল। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল সোনার কত বিচিত্র গয়না গাঁটি। সে সবের নিচে দেখল হীরে মণি-মাণিক্য। শাঙ্কো বিস্কোও দেখল। যাক্। রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক ধনরত্ন উদ্ধার করা গেছে। এবার মুক্তি।

ওরা একে একে গুহা থেক গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল। এবার ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলল যেখানে এই খাদটা শুরু হয়েছে সেইদিকে। ওদের গায়ের পোশাকে গুহার লালচে ধূলোর আস্তরণ ওরা ঝাড়ল ধূলো উড়ল। কিন্তু পোশাক পরিষ্কার হল না। খাদের শেষে এসে ওরা যখন উঠে এল দেখল রাজা গঞ্জালেস মন্ত্রী ও সেনাপতি দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্রান্সিস রাজা গঞ্জালেসের কাছে গেল। বাক্সটা রাজাকে দিল। রাজা গঞ্জালেসের মুখে হাসি আর ধরে না। তাড়াতাড়ি টানা খুলল। দেখল গয়না গাঁটি মণি রত্ন।

ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা এবার তাহলে আমার বন্ধুদের মুক্তি দিন। আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। রাজা সেনাপতিকে বললেন—ওদের ছেড়ে দাও।

এবার রাজা ফ্রান্সিসকে বলল—নররাক্ষসকে কি হত্যা করতে পেরেছো।

—হ্যাঁ। নররাক্ষস ঐ গুহাতেই মরে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতির সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের সামনে এল। সেনাপতি একজন রক্ষীকে বলল—সবাইকে মুক্তি দাও। কারারক্ষী দরজা খুলে দিল। ভাইকিংরা বেরিয়ে এল। ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-।

ফ্রান্সিসের তখন চিন্তা মারিয়া সুস্থ আছে তো? তাই ও আর দেরি করতে চাইল না। শাঙ্কো তখন বন্ধুদের বলছে নররাক্ষসকে কী করে ওরা হত্যা করল তার ঘটনা।

এবার সবাই রওনা হল জাহাজঘাটার দিকে।

সন্ধ্যার সময় ওরা জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠল সবাই। তখন সবাই আনন্দে মাতোয়ারা।

ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এসে দেখল মারিয়া অনেকটা সুস্থ। ফ্রান্সিস বলল—সূর্যাস্ত তো দেখেছো?

—হ্যাঁ। মারিয়া হেসে বলল।

—এবার কেবিনে চলো। শুয়ে বিশ্রাম করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সারাদিন শুয়ে থাকতে ভালো লাগে নাকি। মারিয়া বলল।

—রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক ধনভাণ্ডার কী করে উদ্ধার করলাম সেই গল্প শুনবে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চলো। মারিয়া বলল।

দুজনে কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস গায়ের পোশাকটা খুলে ফেলল। দেখল গায়েও লালচে ধূলো লেগেছে। বলল—দাঁড়াও—একটু গা ধুয়ে আসি।

ও বেরোতে যাবে তখনই ভেন ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—ভেন—মারিয়া এখন কেমন আছে?

—সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে শরীরের দুর্বলতাটা কাটতে একটু সময় লাগবে। ভেন বলল।

—দুর্বলতা কাটাবার ওষুধ দিয়েছো তো? ফ্রান্সিস বলল।

—দিয়েছি। রাজকুমারী খান না। ভেন বলল।

—কেন? ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়া বিছানায় হাতের তেলো দিয়ে চাপড় মেরে বলে উঠল—হা ভগবান। সে যে কী তেতো তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

—ঠিক আছে—ঐ ওষুধ আমিও খাবো। তাহলে তো তোমার খেতে আপত্তি নেই? ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তুমি—মানে—মারিয়া কথাটা শেষ করতে পারল না।

—হ্যাঁ। খাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আমিও খাবো। মারিয়া বলল।

ভেন দুজনের কথা শুনছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল।

পরদিন ভোরে লোকজনের কথাবার্তায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখল—মারিয়া বসে আছে।

—কী ব্যাপার বলো তো?

—রাজা গঞ্জালেসের নতুন জাহাজ এসে এখানে নোঙর করেছে। দামিলা থেকে লোক আসছে তো আসছেই। শুনে এলাম—রাজা গঞ্জালেস আর রানি নাকি জাহাজ দেখতে আসবেন।

ফ্রান্সিস হাত মুখ ধুয়ে ডেক-এ উঠে এল। দেখল একটা ঝক্ঝকে নতুন জাহাজ ওদের জাহাজের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটায় কামান আছে। ও এবার নিজেদের জাহাজটার দিকে তাকাল। কী বিশ্রী। জাহাজের রং বিবর্ণ। খোলটার কত জায়গায় যে রং চটে গেছে। পালগুলোয় কালো কালো ছোট তালি মারা। ফ্রান্সিস পরক্ষণেই ভাবলো—হোক হতচ্ছাড়া চোহারা। কত সুখদুঃখের স্মৃতি এই জাহাজের সঙ্গে জড়িত। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে গিয়ে মাস্তুলটা জড়িয়ে ধরল।

সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই শোনা গেল লোকজনের উচ্চকণ্ঠে বলা কথা—রাজা রানী আসছেন—রাজারানী আসছেন।

ভাইকিংরা ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস মারিয়াও এল। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—যুদ্ধ অবধারিত। কয়েকদিন পরেও হতে পারে আবার আজকালের মধ্যেও শুরু হতে পারে।—তার আগেই আমরা জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুই ঘোড়ায় টানা রাজার গাড়ি এসে দাঁড়াল। রাজা গঞ্জালেস ও রানি গাড়ি থেকে নামলেন। রাজা হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন নতুন জাহাজটার দিকে। রানিও জাহাজটা দেখে মুগ্ধ। মন্ত্রী ও সেনাপতি রাজার কাছে এলেন। মাননীয় রাজা—সেনাপতি বলল জাহাজটায় উঠে ভালো করে দেখুন।

কাঠের পাটাতন ফেলাই ছিল। রাজা বেশ সাবধানে পাটাতন পার হয়ে জাহাজে উঠলেন। রানী আর মন্ত্রী ঐ পাটাতনে পা ফেলে যেতে পারবে না এটা বোঝাই গেল। দুজনে তীরে রইলেন।

রাজা গঞ্জালেস জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। খুব খুশি হলেন।

রাজা সেনাপতিকে বললেন—জাহাজে দুটো কামান রাখা হয়েছে। আমাদের এখন গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। গোলা বারুদ কিনতে হবে। সেনাপতি বলল—

—হ্যাঁ মহারাজ এটা করতে হবে আর করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কারণ রানি উরাকা যে কোন সময় আপনার রাজত্ব আক্রমণ করতে পারে। কথাটা শুনে রাজা মাথা ওঠানামা করলেন। বোঝা গেল—এই আশঙ্কার কথা তিনি বোঝেন।

জাহাজটার মাস্তুল পাল দাঁড়টানা ঘর সবই দেখলেন রাজা। তারপর নেমে এলেন। প্রজাদের ভিড় থেকে ধ্বনি উঠল—রাজা রানি দীর্ঘজীবী হোন। রানি

হাত তলে হাসলেন।

রাজা রানি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

ভাইকিংরা জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে এসব দেখল।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—

—এখন আমরা কী করবো?

—ফ্লেজারকে বলো দেশের দিকে জাহাজ চালাতে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস বলেছে এখন জাহাজ দেশের দিকে যাবে। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। হ্যারি বলল—পাল খুলে দাও। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড় টানতে যাও। নোঙর তোল।

ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। কয়েকজন ভাইকিং মাস্তুল বেয়ে কিছুটা উঠে পালের কাঠের ওপর দাঁড়াল। গোটানো পাল খুলে দড়ি দিয়ে বাঁধল। পালগুলো ফুলে উঠল। তবে হাওয়ার খুব জোর নেই।

সাত আটজন ভাইকিং তখন দাঁড়ঘরে গিয়ে দাঁড় টানতে লাগল। সমুদ্রের জলে শব্দ উঠল—ছপ্ ছপ্ ছপ্।

জাহাজ মোটামুটি জোরে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল।

বিকেল নাগাদ জোর বাতাস ছুটল। জাহাজ দ্রুত ছুটল। ভাইকিংরা খুব খুশি। আর দাঁড় টানতে হচ্ছে না। নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। সকলের মনেই প্রশ্ন—স্বদেশ আর কতদূর?

জাহাজ তীরের কাছ দিয়েই চলেছে। তীরের গাছপালা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সূর্যাস্ত দেখতে মারিয়া তখন ডেক-এ উঠে এসেছে। তাকিয়ে রয়েছে পশ্চিম আকাশের দিকে। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—রাজকুমারী ফ্রান্সিসকে রাজি করান যাতে ও স্বদেশের দিকেই জাহাজ চালায়।

—আমি তো কতবার বলেছি—আর নয়। এবার স্বদেশে ফেরো। কিন্তু ও কোন কথা শুনলে তো।

আস্তে আস্তে সূর্য পশ্চিম দিগন্তের জলের ঢেউয়ের মধ্যে যেন ডুবে গেল। পশ্চিম দিগন্তে লালচে আভা ছড়িয়ে রইল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশে চাঁদের আলো উজ্জ্বল হল। তারা দেখা গেল। মারিয়া নিজের কেবিনে চলে গেল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। দেখল—ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া। মারিয়া বিছানায় বসে ছেঁড়া কাপড় জামা সেলাই ফোঁড়াই করছে। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

—জাহাজ দেশের দিকে চলুক। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলল—তুমি তো আবার কোনও গুপ্তধনের খোঁজ পাবে। ব্যস্—ছুটলে সেই গুপ্তধন উদ্ধার করতে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঐসব কাজের জন্যেই তো দেশ ছেড়ে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হ্যারি আর কোন কথা বলল না। নিজের কেবিনঘরে চলে এল।

রাত গভীর তখন। কালো আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। অজস্র

তারা জ্বলজ্বল করছে। সমুদ্র আকাশ বেশ অন্ধকার।

মাস্তুলের মাথায় নিজের বসবার জায়গাটিতে নজরদার পেড্রো বসেছিল। চারদিকে নজর রাখছিল। তীরভূমি নজরে পড়ে কিনা। জলদস্যুদের জাহাজ আসছে কিনা। কিছুক্ষণ থেকেই পেড্রো দেখছিল প্রায় অন্ধকার সমুদ্রে ওদের জাহাজের কাছ দিয়ে একই গতিতে চলেছে ছায়ার মত একটা জাহাজ। পেড্রো এবার ঝুঁকে পড়ে সেই জাহাজটা দেখল ভালো করে। জাহাজটার মাথায় একটা পাতাকা উড়ছে। কিন্তু কোন দেশের পাতাকা তা বোঝা গেল না। তবে এটা বুঝল যে ওটা জলদস্যুদের জাহাজ নয়। তাহলেই হল।

প্রথমে পেড্রোর একটু তন্দ্রামত এল। তারপর ঘুম। পেড্রো ঘুমিয়ে পড়ল।

আসলে ঐ জাহাজটা ছিল জলদস্যুদের জাহাজ। প্রায় অন্ধকার সমুদ্রে জলদস্যুরা নৌকো জলে নামাতে লাগল। নৌকোয় চড়ে দলে দলে জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের জাহাজে এসে উঠতে লাগল নিঃশব্দে। পেড্রো তখন গভীর ঘুমে। জলদস্যুরা হালের কাছে জমায়েত হতে লাগল।

নিজেদের জাহাজ থেকে পাখি ডাকার সঙ্কেত ভেসে এল। ওরা এবার খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এর ওপর উঠে আসতে লাগল। ডেক-এর ওপর নিঃশব্দে চলাফেরা করতে লাগল।

একজন জলদস্যু মাস্তুল বেয়ে ঘুমন্ত পেড্রোর কাছে এল। পেড্রোর গলায় তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে খোঁচা দিল। পেড্রো ধড়মড় কর উঠে দাঁড়াতে গেল। তখনই দেখল ওর গলায় তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে রয়েছে এক জলদস্যু। ইয়া গোঁফ ইয়া জুলপি। জলদস্যুটি আস্তে বলল—নেমে এসো। কোন শব্দ নয়। পেড্রো আর কী করে। জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচতেই ওর নজরদারি। সেই ওর সামনেই খোলা তরোয়াল সাক্ষাৎ এক জলদস্যু। পেড্রো মাস্তুল বেয়ে নামতে লাগল। পেচনে খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুটিও নামতে লাগল।

ওদিকে অন্য জলদস্যুরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরের সামনে এল। কয়েকজন ফ্রান্সিসদের অস্ত্রঘরের সামনে এল। দেখল তরোয়াল হাতে একজন ভাইকিং অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে।

পাহারাদার ভাইকিংটি কিছু বোঝার আগেই আক্রান্ত হল। ডান হাতে তরোয়ালের কোপ পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। পাহারাদারটি জলদস্যুদের হাতে বন্দী হল। দুজন জলদস্যু অস্ত্রঘরের পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল।

ওদিকে অন্য জলদস্যুরা কেবিনঘরে ঢুকে ঢুকে ভাইকিংদের গায়ে আস্তে জোরে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে জাগাতে লাগল। ঘুম ভেঙে ভাইকিংরা দেখল—খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা দাঁড়িয়ে। ওরই মধ্য একজন ভাইকিং জলদস্যুদের নজর এড়িয়ে অস্ত্রঘরের সামনে এল। দেখল—অস্ত্রঘরের সামনে পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল হাতে দুজন জলদস্যু। ওরা হতাশা হল। খালি হাতে লড়াই করতে গেলে জীবন সংশয় হবে। ওরা জলদস্যুদের নজরে পড়ে গেল। বন্দী হল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সূর্য ওঠেনি। ভাইকিংদের সবাইকে ডেক-এ নিয়ে এল জলদস্যুরা। জলদস্যুরা ভাইকিংদের মধ্যে মারিয়াকে দেখে বেশ অবাকই হল। মারিয়াকে একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখল।

সূর্য উঠল। রোদ ছড়াল। কালো আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারিও বন্দী। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, আবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়লাম। পেড্রো আবার আমাদের বিপদে ফেলল। এখন এদের হাত থেকে কী করে উদ্ধার পাবো।

—হ্যারি, মন খারাপ করো না। উপায় একটা হবেই। আমাদের নিয়ে ওরা কী করবে সেটা আগে বুঝি। তারপর ফন্দি করে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ থামানো হল। জলদস্যুদের জাহাজও থামল।

এক সর্দারগোছের জলদস্যু ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বলল—তোমাদের মধ্যে সর্দার কে?

—আমি। ফ্রান্সিস বলল।

—চলো—গ্যাব্রিয়েল-এর কাছে। জলদস্যুটি বলল।

—হ্যাঁ চলো—আমার এক বন্ধুও যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

জলদস্যুটা একটু ভেবে বলল—বেশ আসুক।

ফ্রান্সিসরা ঢেউ-এর ধাক্কায় দোল খাওয়া দুটো জাহাজের মধ্যের ফাঁকটুকু সাবধানে পার হয়ে গ্যাব্রিয়েল-এর জাহাজে এল।

সর্দার জলদস্যুটির নির্দেশে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা কেবিনঘরের দরজার সামনে এল। দরজা বন্ধ। সর্দারটি দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল—আয়। সর্দার দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল। দেখল বিছানায় বসে আছে একটা মোটা লোক। মুখে দাড়ি গোঁফ। বিছানাটায় পরার কাপড় চোপড় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বোধহয় লোকটার কোন পোশাকই পছন্দ হয়নি। তাই ছুঁড়ে ফেলেছে। লোকটার গা খালি। বোঝা গেল এই লোকটিই দস্যুদলের নেতা—গ্যাব্রিয়েল।

গ্যাব্রিয়েল কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝে নিতে চাইছে ফ্রান্সিসরা ভয় পেয়েছে কিনা। তারপর হো—হো—করে হেসে উঠল। বলল— আমি ভেবেছিলাম তোমাদের জাহাজ লুঠ করবো। তা একে তোমরা ভিনদেশী লোক আবার দরিদ্র। ছেঁড়াখোঁড়া কীসব পোশাক পরে আছো। দেখলেই ভিখিরি বলে মনে হয়।

—এজন্যে আমরা বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। হ্যারি বলল।

গ্যাব্রিয়েল আবার হেসে উঠল। বলল—থাকতো এসব—এসব তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু আমার যে একটা জাহাজ খুবই দরকার—তার কী করবো?

—আপনি তো যথেষ্ট ধনী। একটা জাহাজ কিনে নিন। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু—আমি জাহাজ কিনবো না। তোমাদের শক্তপোক্ত জাহাজটা আমি নেব। আবার গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল।

হাসতে হাসতে বলল—ঐ একটা জিনিসই তোমাদের কাছে আছে যা কেড়ে নিয়ে আমাদের লাভ হবে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। হ্যারি বলল— আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

গ্যারিয়েল হেসে উঠল। বলল—এতো জলের মতো সোজা কথা। তোমাদের এখানে কোথাও নামিয়ে দেব। তারপর তোমাদের জাহাজটা আমরা নিয়ে চলে যাবো। এবার বুঝলে?

—বুঝলাম। কিন্তু তা অসম্ভব। আমরা জাহাজ দেব না। ফ্রান্সিস বলল।

গ্যাব্রিয়েল এবার আরও জোরে হেসে উঠল। বলল—তোমার কথা শুনে এত হাসি আসছে মানে—তাহলে তো তোমাদের খালি হাতে আমাদের সঙ্গে লড়তে হয়। লড়াই হলে তোমরা কেউ বেঁচে থাকবে? অ্যাঁ?

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—পরোয়া করি না কতজন বাঁচবো কতজন মরবো। আমরা আমাদের জাহাজ নিতে দেব না।

হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস মাথা গরম করো না। তাতে আমাদের বিপদই বাড়বে। এবার গ্যাব্রিয়েল গম্ভীর গলায় বলল—তাহলে তো উপায় নেই। তোমাদের সবাইকে খতম করে জাহাজ কেড়ে নিতে হবে।

হ্যারি বলল—তার দরকার নেই। আমরা এমনিতেই আপনাকে জাহাজ দিয়ে দেব।

—এই তো একটা বুদ্ধিমানের মত কথা। গ্যাব্রিয়েল বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—এ কী বলছেন?

—আমি ঠিকই বলেছি। পরে এই নিয়ে কথা হবে। এখন নয়। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। কত দুঃখকষ্ট কত আনন্দ উল্লাস জড়িয়ে আছে ওই জাহাজটার সঙ্গে। সেটা দিয়ে দেব? বিনা যুদ্ধে? কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে জাহাজটা দিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ফ্রান্সিস মাথাটা আস্তে ঝাঁকিয়ে বলল—ঠিক আছে। আমরা কথা বলে নিই।

—বেশ তো—সব দিক ভেবেচিন্তে দেখবে আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তোমাদের উপায় নেই। গ্যাব্রিয়েল বলল।

হ্যারি গ্যাব্রিয়েলকে জিজ্ঞেস করল—এ জায়গাটা কি পোর্তুগালের মধ্যে।

—হ্যাঁ। এখানে সেতুবল নামে একটা ছোট-বন্দর আছে। ওরই কাছাকাছি তোমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তোমাদের জাহাজ নিয়ে আমরা চলে যাবো। কথাটা বলে গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কোনও কথা বলল না। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। ডেক-এ এসে দাঁড়াল। মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস জলদস্যুদের নেতা কী বলল?

হ্যারি বলল—ওরা আমাদের এই জাহাজ থেকে কোথাও নামিয়ে দিয়ে এই জাহাজ নিয়ে চলে যাবে।

—বলো কি? মারিয়া বিস্ময়ে বলে উঠল। সারি দিয়ে দাঁড়ানো ভাইকিংরা

মারিয়ার দিকে তাকাল। কিন্তু ঠিক বুঝল না জলদস্যুদের নেতা কী বলেছে।

এবার হ্যারি ওদের দেশীয় ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, জলদস্যুদের নেতা গ্যাব্রিয়েল আমাদের এখানে এই পোর্তুগাল দেশের একটা অংশে সমুদ্রতীরে কোথাও নামিয়ে দিয়ে আমাদের জাহাজ চালিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। ওরা বুঝল ওদের অস্ত্রহীন অসহায় অবস্থা। তবু দু একজন বলে উঠল—ফ্রান্সিস, তুমি বলো আমরা এক্ষুনি লড়াইয়ে নামবো। হ্যাঁ—নিরস্ত্র অবস্থাতেই। জলদস্যুদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমরা লড়াই চালাবো।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—ভাইসব, আমি সবদিক ভেবেছি। আমাদের জাহাজটা আমাদের কতটা প্রিয়, কতটা ভালোবাসার তোমরা জানো। কিন্তু আজ আমরা অসহায় দর্শকমাত্র। কিছু করার নেই। যে দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটতে চলেছে সেটা মেনে নাও। এটা আমার অনুরোধ।

সবাই চুপ করে রইল। নিজেদের নিরুপায় অবস্থাটা সকলেই বুঝতে পারল।

দুপুরে রাঁধুনি বন্ধুরা রান্নাবান্না সারল। অবশ্য তিনজন জলদস্যু ওদের পাহারায় ছিল।

জাহাজের ডেক-এই ভাইকিংদের খেতে দেওয়া হল। হ্যারি কিছুই খেতে পারছিল না। একবার ফুঁপিয়ে উঠল। পাশে-বসা ফ্রান্সিস বাঁ হাতটা হ্যারির কাঁধে রাখল। বলল—হ্যারি এসব নিয়ে ভেবো না। পেট পুরে খাও। গায়ের জোর রাখো।

বিকেলের দিকে গ্যাব্রিয়েল ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। সেই দরাজ হাসি হাসতে লাগল। হ্যারির মনে হল লোকটা বোধহয় হাসতে হাসতে নরহত্যা করতে পারে।

গ্যাব্রিয়েল গলা চড়িয়ে বলল—আজ রাতেই তোমাদের তীরে নামিয়ে দেওয়া হবে। মুক্তি! তাই না? গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল।

হ্যারি বলল—না—রাতের অন্ধকারে আমরা কোথাও নামব না। এটা আমাদের কাছে অচেনা দেশ। কাল সকালে আমরা নামবো। গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল—বলছিলাম রাতে নামলে একটা রাত আগে মুক্তি পেতে। তাছাড়া এখানে দিন কয়েকের মধ্যেই রানি উরাকার সঙ্গে রাজা গঞ্জালেস-এর যুদ্ধ শুরু হবে। এসময় দিনের বেলা আমাদের দেখলে রানি উরাকার সৈন্যরা আমাদের গুপ্তচর ভেবে বন্দী করতে পারে।

হ্যারি বলল—না—আমরা কাল সকালেই নামবো।

গ্যাব্রিয়েল হো হো করে হেসে উঠল। বলল—বেশ। তাই হবে। গ্যাব্রিয়েল গলা চড়িয়ে নিজের দলের যোদ্ধাদের বলল—খুব সাবধানে পাহারা দিবি। কেউ যেন পালাতে না পারে। কাউকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে দিবি না। আর একটা কথা—দুটো জাহাজই থামিয়ে রাখ। কাল সকালে চালাবি। যেখানে থামাতে বলবো সেখানে থামাবি।

গ্যাব্রিয়েল চলে গেল নিজেদের জাহাজে।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেল। ওদিকে কয়েকজন জলদস্যু ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ওদের জাহাজের পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধল। জলদস্যুরাই দাঁড় বেয়ে জাহাজ দুটো আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে চলল তীরভূমির দিকে।

তীরভূমির কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা থামানো হল। কাঠের পাটাতন ফেলা হল। ফ্রান্সিসরা নামবার জন্য তৈরি হল। ওরা নামছে তখন গ্যাব্রিয়েল নিজের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে হাত নাড়তে থাকল। বলে উঠল— বন্ধুগণ—চিরবিদায়।

হ্যারি একটু চমকাল। গ্যাব্রিয়েল চিরবিদায় কথাটা বলল কেন? পরক্ষণেই ভাবল গ্যাব্রিয়েল একটা নরঘাতক জলদস্যু। ওর বিদ্যেবুদ্ধি মতই কথাটা বলেছে।

মারিয়া অনেকক্ষণ থেকেই রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। পাটাতন দিয়ে নামার সময় জোরে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস পেছনেই ছিল। কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিসের নিজের চোখও ভিজে উঠেছে তখন।

ভাইকিংরা সবাই তীরে নামতে লাগল। সবাই নামলে জলদস্যুরা কাঠের পাটাতন তুলে নিল। দুটো জাহাজই তীর থেকে দূরে ভেসে যেতে লাগল।

তীর থেকে উঠে ফ্রান্সিসরা দেখল চারদিকে কোন জনবসতি নেই। কিছু জংলা গাছের এলাকা ছাড়িয়ে ওরা এল। দেখল—ছাইরঙা মাটি। ওখানে আসতেই এক ভাইকিং বন্ধু পায়ের পাতায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—ফ্রান্সিস—সাপ।

এতক্ষণ সবাই দেখল সেই সাপের আড্ডা। কত বিচিত্র বর্ণের ছোট বড় সাপ ঐ এবড়ো খেবড়ো ছাইরঙা মাটির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকালের রোদ লেগে সাপগুলোর গায়ের আঁশ চক্‌চক্ করছে। কিছু সাপ গর্তেও ঢুকে আছে। তখনই আবার আর এক ভাইকিং বন্ধু চিৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। দুই বন্ধুকে কাঁধে নিয়ে ছুটে এলাকাটা পার হয়ে যাও।

ভাইকিংরা দুই বন্ধুকে কাঁধে তুলে নিয়ে এক ছুটে এলাকাটা পার হয়ে গেল। সবাই ততক্ষণে ছুটে ঐ সাপের আড্ডা পার হয়ে একটা ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

সাপে-কাটা দুই বন্ধুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে প্রান্তরের ঘাসে বসিয়ে দেওয়া হল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। কোমর থেকে ছোরাটা বের করল। ঘাসের ওপর বসল। এক বন্ধুর সাপে কাটা পা-টা ধরল। তারপর কামড়ানোর জায়গাটা ছোরা দিয়ে একটু চিরে ধরল। তারপর ঐ জায়গাটায় মুখ দিয়ে চুষতে লাগল। চুষল আর থু থু করে রক্ত ফেলে দিল। বারতিনেক এরকম করে অন্য বন্ধুর কাছে গেল। একইভাবে কাটা জায়গাটা চিরে চুষতে লাগল। থুতু রক্ত ফেলতে

লাগল। তারপর চোষা বন্ধ করল। শাঙ্কো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দুই বন্ধু সুস্থ হল। বোঝা গেল শাঙ্কোর থুতুর সঙ্গে সাপের বিষ বেরিয়ে গেছে।

ঐ ঘাসের প্রান্তরে ভাইকিংরা বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—ঐ জলদস্যু গ্যাব্রিয়েল আমাদের রাতে ওখানে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল। রাতে ঐ সাপের আস্তানা পার হতে গেলে আমরা কেউ হয়তো বাঁচতাম না। গ্যাব্রিয়েল কেন আমাদের লক্ষ্য করে 'চিরবিদায়' কথাটা বলেছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি।

বেলা বাড়তে লাগল। দুপুর হল। এবার সবাই বুঝতে পারল খিদে পেয়েছে। খাদ্য চাই। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস কী করবে এখন? সকলেই তো তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—এখানকার ছোট বন্দরটা সেতুবল—সেখানে চলো। ঐদিকে লোকজনের বসতি আছে। একটা সরাইখানা হয়তো পাবো।

ভাইকিংরা সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পূবমুখো হাঁটতে লাগল। পেছনে ভাইকিং বন্ধুরা।

কিছুদূর যেতেই ভাইকিংরা একটা রাস্তা পেল। সেই রাস্তা ধরেই ওরা চলল। সেতুবল জাহাজঘাটায় যখন পৌঁছল তখন দুপুর সবাই কম-বেশি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর।

সেতুবলের বসতি এলাকায় এল ওরা। ফ্রান্সিস বলল—সবাই না গিয়ে আমি শুধু যাচ্ছি। একটা সরাইখানা পাই কিনা দেখি।

ফ্রান্সিস বন্দরের দিকে চলল। রাস্তার দুদিকেই বাড়িঘর দোর। ফ্রান্সিস সব দেখতে দেখতে চলল। তখনই দেখল একটা সরাইখানার মতো দোকান। ছোট দোকান। ফ্রান্সিস দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের মালিক এগিয়ে এল। বলল—কিছু খাবেন? ফ্রান্সিস বলল—পঁচিশ তিরিশজন লোকের জন্যে আপনি রুটি মাংস রান্না করতে পারবেন?

—তা পারবো। তবে একটু সময় লাগবে। দোকানি বলল।

—লাগুক। আপনি সব জোগাড় টোগাড় করুন। আমি বন্ধুদের নিয়ে আসতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে এল। বলল—চলো সব। একটা ছোট সরাইখানা মত পাওয়া গেছে। আমি রান্নার জোগাড় করতে বলে এসেছি। তোমরা চলো।

সবাই ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে চলল। ঐ সরাইখানায় এল। দোকানি এসে ফ্রান্সিসকে বলল—যদি কিছু অগ্রিম দেন তাহলে বড় ভালো হয়।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। সব শুনে শাঙ্কো ওর কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দিল। দোকানি স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে খুব খুশি।

ফ্রান্সিস বন্ধু রাঁধুনি দুজনকে বলল—তোমরাও একটু হাত লাগাও। ঐ

রোগাপটকা চেহারার দোকানি এতজনের রান্না একা পারবে না। রাঁধুনি বন্ধুরা দোকানিকে সাহায্য করতে গেল। রান্নার আয়োজন শুরু হল।

দোকানটা ছোট। সকলের বসার জায়গা হল না। কিছু দোকানের ভেতরে বসল। কিছু পাশের মাঠমত জায়গাটায় বসল।

সন্ধ্যের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। সবাই দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস দোকানির কাছে এল। আর একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। দোকানি আরো খুশি হল। ফ্রান্সিস বলল—এখানে এখন কোন রাজা রাজত্ব করছেন?

—রাজা নয়—রানি। রাজা আলফনসোর মেয়ে উরাকা এখন রানি। দোকানি বলল।

—জাহাজঘাটা কোনদিকে? হ্যারি জানতে চাইল। দোকানি দক্ষিণদিক দেখিয়ে বলল—ঐদিকে।

ফ্রান্সিসরা দিক ঠিক করে হাঁটতে লাগল। রাস্তার লোকজন ফ্রান্সিসদের দেখে বেশ অবাক হল। ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা বিদেশী পোশাক-পরা লোকগুলো কোথা থেকে এল? ময়লা ছেঁড়া পোশাক-পরা মারিয়াকে দেখেই লোকজন আশ্চর্য হল বেশি।

ফ্রান্সিসরা চলল জাহাজঘাটার দিকে। জাহাজঘাটার কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ একদল সৈন্য ফ্রান্সিসদের ঘিরে ফেলল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কেউ বাধা দিও না। ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই ঘোড়ায় চড়ে একজন বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ এল। সৈন্যরা মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। বোঝা গেল—অশ্বারোহী সেনাপতি।

রাস্তার লোকজনদের মধ্যে তখন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। সেনাপতি ডান হাত তুলে গলা চড়িয়ে বলল—আপনারা দূরে চলে যান। কোন ভয় নেই। লোকজনের ভয় ত্রাস একটু কমল। আস্তে আস্তে লোকজন চলে যেতে লাগল। কৌতূহলী কিছু লোক থেকে গেল। কী ব্যাপার দেখে যাবে।

বড় গোঁফওয়ালা সেনাপতি ঘোড়া থেকে নেমে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—তোমাদের দলনেতা কে?

—আমি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

—তোমরা কোন দেশের লোক? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা জাতিতে ভাইকিং। এখানে বেড়াতে এসেছি। হ্যারি বলল।

—ও। আমরা শুনেছি ভাইকিংরা খুব দুঃসাহসী জাতি। জাহাজ চালাতে ওস্তাদ। সেনাপতি বলল। ফ্রান্সিসরা চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। সেনাপতি বলল— কাল এখানে রানি উরাকা আসবেন। কাল এখানে তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হবে। তোমরা বিদেশি। তোমাদের বিশ্বাস কী? কালকের প্রতিযোগিতা চলাকালীন তোমরা কী গণ্ডগোল পাকাবে—কে জানে। তাই তোমাদের বন্দী করা হল। তোমাদের আজ ও কালকের দুই রাত বন্দী হয়ে থাকতে হবে। রানি উরাকা চলে গেলে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে।

—কিন্তু আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। হ্যারি বলল।

—না-তা করোনি। কিন্তু রানির নিরাপত্তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। সেনাপতি বলল।

—দেখুন আমরা কিছুদিন আগে রাজা গঞ্জালেস-এর রাজত্বের রাজধানী দামিল গিয়েছিলাম। জানতে গিয়েছিলাম আমরা কোথায় এসেছি। রাজা গঞ্জালেসের সৈন্যরা আমাদের বন্দি করল। ওরা বলল—তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর। আমরা বিদেশি। গুপ্তচরবৃত্তি করে আমাদের কী লাভ। তাদের সেনাপতিকে সেইকথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কী রাজা গঞ্জালেস কী সেনাপতি কেউই আমাদের কথা বিশ্বাস করল না। কয়েকদিন কয়েদঘরে কাটাতে হল।

—মুক্তি পেলে কী করে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—সে অনেক ব্যাপার। সংক্ষেপে বলি—রাজা গঞ্জালেস-এর পৈতৃক ধনভাণ্ডার লুকোনো ছিল একটা গুহায়। গুহার পাহারাদার ছিল বীভৎস দেখতে এক নররাক্ষস। তাকে হত্যা করে আমরা সেই ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে দিয়েছিলাম। তাই আমরা ছাড়া পেয়েছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমরা তোমাদের কয়েদখানায় রাখবো না। তবে দুরাত সৈন্যদের ঘরে থাকতে হবে। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞাস করল—কালকে যে প্রতিযোগিতা হবে তাতে কী পুরস্কার দেওয়া হবে?

—সোনার তীর ধনুক। সেনাপতি বলল।

—আমরা কালকের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তা পারবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার জায়গা থেকে তোমরা তো পালিয়েও যেতে পারো। সেনাপতি বলল।

—এটা একটা কথা হল? আমার স্ত্রী আমার বন্ধুদের ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাবো?

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। তীর তো গোল চাকতিতেই লাগাতে পারবে না। মাঝখানে লাগানো তো দূরস্থান। ইচ্ছে হয়েছে ইচ্ছে মেটাও। তোমাদের একজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার পরেই তাকে দুর্গে ফিরে আসতে হবে। সেনাপতি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে বসল। তরোয়াল ঘুরিয়ে ডানদিকে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের চলবার ইঙ্গিত করল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের প্রায় ঘিরে নিয়ে চলল। দূর থেকে পাথরের ছোট দুর্গটা দেখা গেল।

সবাই যখন দুর্গদ্বারে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সকলেই দুর্গে ঢুকল। সেনাপতি তরোয়াল তুলে একটা ঘর দেখাল। বলল—ঐ ঘরে এদের বন্দী করে রাখো। সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ঘরটায় ঢুকল ফ্রান্সিসরা। দেখল কয়েকজন লোক ঘরের ঘাসপাতা বাঁধা বিছানায় শুয়ে বসে আছে। বোঝা গেল তাঁরা সৈন্য। ফ্রান্সিসদের সৈন্যাবাসেই রাখা হল।

ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে ভালো করে তাকাল। মাথার চুল উসকোখুস্‌কো। মুখ শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। মারিয়াকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া যাক—এই ভেবে ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে গেল। বসল। বলল—মারিয়া তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

মারিয়া হাসল। মাথা নাড়ল—না।

—তুমি যদি চাও তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে তোমাকে আর হ্যারিকে আমাদের দেশের দিকে যাচ্ছে এমন কোন জাহাজে তুলে দিতে পারি। আমাদের এত কষ্টের জীবন তুমি সহ্য করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না—আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো। এক সঙ্গে দেশে ফিরবো। আমার জন্যে ভেবো না। তুমি যেখানে যেভাবে থাকবে আমিও সেইখানে সেভাবেই থাকবো। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। বড় ক্লান্তি সারা শরীরে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখের ওপর হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। উঠল—একেবারে যখন খেতে দেওয়া হল।

পরের দিন ভোর থেকেই সাজো সাজো রব। এলাকার মানুষদের মধ্যে খুশির জোয়ার। রানি উরাকা আসছেন। সৈন্যরা যুদ্ধের সাজ পরল। রাস্তার দুপাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতি ওর জবরজং পোশাকটা পরে ঘোড়ায় চড়ে সব দেখাশুনো করতে লাগল। এখন রানি উরাকার জন্যে প্রতীক্ষা।

কিছুক্ষণ পরে রানি উরাকা সাদা ধব্‌ধবে একটা ঘোড়ায় চড়ে এলেন। পেছনে পেছনে এল রাজবাড়ির গাড়ি। তাতে কয়েকজন অমাত্য বসে আছেন।

রানির মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট। গলায় বড় বড় মুক্তোর মালা। রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠছে। রানির সোনা-রুপোর সূতোয় কাজ করা পোশাক। জনতার ভিড়ের মধ্যে ধ্বনি উঠল—রানি উরাকার জয় হোক। রানি খুশি হয়ে হেসে হাত নাড়লেন।

প্রান্তরের একপাশে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সামিয়ানার নিচে রানির বসবার আসন। আরো কয়েকটা আসন রাখা হয়েছে। অমাত্যরা সেখানে এস বসলেন। রানি একটু পরে নিজের আসনে বসলেন। একটু বেলা হতেই দুর্গের পাশের প্রান্তরে লোক জড়ো হতে লাগল। এক প্রান্তে একটা কাঠের খুঁটিতে বাঁধা হল একটা গোল শক্ত কাগজের বৃত্ত। একটু পরপর বৃত্তগুলো ছোট হতে হতে কেন্দ্রে এসে শেষ হয়েছে। তীর ঐ গোলগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে লাগাতে হবে।

ওদিকে সেনাপতি কথা রাখল। শাঙ্কোকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হল। শাঙ্কো তীর ধনুক চাইল। পেলও। তখনই শাঙ্কোর চোখে প্রায় জল এল। নিজেদের জাহাজে গুছিয়ে রাখা তীরধনুকের কথা মনে পড়ল।

প্রতিযোগিতা শুরু হল। একে একে পনেরোজন প্রতিযোগী তীর ছুঁড়ল। কোন তীরই কেন্দ্রবিন্দুতে লাগল না। এবার এল ঐ দেশের সেরা তীরন্দাজ। তার ছোঁড়া তীর কেন্দ্রবিন্দুর কাছে লাগল। এবার শাঙ্কোর পালা। শাঙ্কো তীর ধনুক নিল। নিশানা ঠিক করে তীর ছুঁড়ল। শাঙ্কোর তীরও কেন্দ্রবিন্দুতে লাগল না। সেরা তীরন্দাজের তীরের কাছে লাগল।

আর এক দফা তীর ছোঁড়ার কথা সেনাপতি বলল। পনেরোজন তীরন্দাজী তীর ছুঁড়ল। কোনটাই কেন্দ্রবিন্দুতে লাগল না। এবার সেরা তীরন্দাজী এগিয়ে এল। শাঙ্কোর দিকে একবার তাকাল। তারপর ধনুকের ছিলায় তীর বসাল। নিশানা দেখে তীর ছুঁড়ল। তীরটি কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে বিঁধল। সমস্ত প্রান্তর ভরে উঠল দর্শকদের আনন্দধ্বনিতে।

এবারা শাঙ্কো এগিয়ে এল। ধনুক ধরে ছিলায় তীর পরাল। হাওয়াটা আন্দাজ করল। তারপর আস্তে আস্তে ছিলাটা টেনে নিয়ে তীর ছুঁড়ল। তীরটা আগের সেরা তীরন্দাজীর কেন্দ্রবিন্দুতে গেঁথে যাওয়া তীরটা দুফালি করে কেন্দ্রবিন্দুতে ঢুকে পড়ল। প্রথমে দর্শকরা বুঝল না। শাঙ্কো এগিয়ে গিয়ে প্রথমে ওর তীরটা খুলল। তারপর দোফালা হওয়া সেরা তীরন্দাজীর তীরটি তুলল। এবার সবাই বুঝল যে শাঙ্কোর তীর সেরা তীরন্দাজীর তীর ফালা করে কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে। দর্শক জনতা আনন্দধ্বনি করল।

এবার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। রানির সোনার তীর ধনুক হাতে নিলেন। শাঙ্কো গিয়ে রানির সামনে দাঁড়াল। রানি শাঙ্কোকে সোনার তীরধনুক দিলেন। শাঙ্কো মাথা পেতে নিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—মাননীয়া রানি—আপনার কাছে আমার একটা আর্জি ছিল।

রানি মৃদুস্বরে বললেন—পরে তোমার কথা শুনবো। অন্য পুরস্কার দেওয়া চলল। ঐ অনুষ্ঠানটা শেষ হলে রানি সেনাপতিকে ডেক-এ পাঠালেন। সেনাপতি এসে বললেন—যে যুবকটি তীর চালনায় প্রথম হয়েছে তাকে ডেক-এ আনুন। সেনাপতি এগিয়ে গেল। লোকজনের ভিড় তখন অনেক কমে গেছে। শাঙ্কো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সেনাপতি কাছে এসে বলল—তুমি এসো। রানি ডাকছেন।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে রানির সামনে এসে দাঁড়াল। রানি বললেন—তুমি কী কথা বলতে চেয়েছিলে?

শাঙ্কো বলল—মাননীয়া রানি—আমরা জাতিতে ভাইকিং। জাহাজে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই আর গুপ্তধন খুঁজে বার করি। আমরা কোন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারি এই আশঙ্কায় সেনাপতি মহাশয় আমাদের দুর্গে বন্দী করে রেখেছেন।

—কথাটা সত্যি? রানি সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন। সেনাপতি বলল—

—হ্যাঁ মাননীয়া রানি—তবে হাত পা বেঁধে রাখিনি। ওদের বলেছি আপনি

রাজধানীতে ফিরে গেলেই ওদের মুক্তি দেব। সেনাপতি বলল।

—মাননীয়া রানি—আমরা এখনই মুক্তি চাই। শাঙ্কো বলল।

রানি বললেন—তোমার মত একজন দুর্ধর্ষ তীরন্দাজের অনুরোধ আমি কি রক্ষা না করে পারি। রানি সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—ভাইকিংদের মুক্তি দিন। ওরা যেমন খুশি চলাফেরা করুক।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে এল। ঘোড়ায় চড়ল। দুর্গের দিকে ঘোড়া ছোটাল।

দুর্গে এসে সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মাননীয়া রানি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন তোমরা যেখানে খুশি যেতে পারো।

ফ্রান্সিস বলল—তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় কে প্রথম হল?

—তোমাদের যে বন্ধুটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—।

সেনাপতি মৃদু হাসল। তারপর ঘরের বাইরে এসে ঘোড়ায় উঠল।

শাঙ্কো এল। সবাই শাঙ্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। আনন্দে ওরা হৈ হল্লা শুরু করল। শাঙ্কো সোনার তীরধনুকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলল—এটা মনে হচ্ছে খাঁটি সোনার। এটা পাবে বলেই আমি শাঙ্কোকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পাঠিয়েছিলাম এই তীরধনুক বিক্রি করে জাহাজ কিনবো। তারপর ঐ জাহাজে চড়ে দেশে ফেরা।

ফ্রান্সিসরা যখন সেতুবল বন্দরে এল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বন্দর এলাকায় একটা বড় সরাইখানা পেল। ফ্রান্সিস সরাইখানাটায় ঢুকল। মালিক একটা কাঠের আসনে বসেছিল। মালিক মাঝবয়সী। ঢোলাহাতা জোব্বামত পরে আছে। ফ্রান্সিস মালিকের কাছে গেল। বলল—আমরা জাতিতে ভাইকিং। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো আমাদের নেশা। আপনার সরাইখানায় আমরা আজ রাতে খাবো থাকবো।

—বেশ। মালিক বলল।

—ক'টা স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে? ফ্রান্সিস বলল।

—দুটো স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। মালিক বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। বলল—দুটো স্বর্ণমুদ্রা মালিককে দাও। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করে মালিককে দিল। তারপর সবাইকে সরাইখানায় আসতে বলল। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এসে কাঠের তক্তাপাতা বিছানায় বসল। কিছু ভাইকিং সরাইখানার ধারে একটু মাঠমত জায়গায় গিয়ে বসল।

ফ্রান্সিস সরাইখানার মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তখনই মাকিল বলল—বোঝাই যাচ্ছে আপনারা বিদেশী। আপনারা এখানে এলেন কী করে?

—জাহাজে চড়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজটা কি বন্দরে রেখে এসেছেন? মালিক বলল।

—না—আমাদের জাহাজ চুরি হয়ে গেছে। একদল জলদস্যু এই কাণ্ড করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—জলদস্যুদের নেতার নাম জানেন? মালিক বলল।

—হ্যাঁ—গ্যাব্রিয়েল। ফ্রান্সিস বলল।

—উরি বাবা—গ্যাব্রিয়েল তো সাংঘাতিক জলদস্যু। ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। আপনাদের খুব ভাগ্যি যে আপনারা প্রাণে বেঁচে আছেন। মালিক বলল।

—হুঁ। আমরা ওদের খুঁজে বের করবো। আমাদের জাহাজ উদ্ধার করবো। তাই একটা জাহাজ কিনবো স্থির করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা তো আলফানের জাহাজ কিনতে পারেন। মালিক বলল।

—আলফান কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আলফান একজন মূর ব্যবসায়ী। ওর বাড়ি এখানেই। ব্যবসা চালাতে জাহাজ নিয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ায়। ইদানিং আলফানের খুব অর্থকষ্ট যাচ্ছে। তাই জাহাজ বিক্রি করছে।

—তাহলে তো আলফানের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস সরাইখানার বাইরে এল।

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি এদিকে এসো। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—

—কী ব্যাপার?

—শোনো—সোনার ধনুক তীরটা তোমার কাছেই আছে তো?

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—চলো জাহাজঘাটায় যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন বলো তো? হ্যারি বলল।

—সারইখানার মালিক বলল—আলফান নামে এক মূর ব্যবসায়ী তার একটি জাহাজ বিক্রি করবে। দেখা যাক জাহাজটা কেমন। কত দাম বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—চলো। হ্যারি বলল।

জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখল বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল। সমুদ্রতীরের ঢাল বেয়ে নামল দুজনে।

পাতা পাতাটন দিয়ে প্রথম জাহাজটায় উঠল ওরা। একজন নাবিক রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—আরফানের জাহাজ কোনটা? নাবিকটি আঙুল দিয়ে শেষ জাহাজটা।

ফ্রান্সিসরা শেষ জাহাজটায় উঠল। 'দেখল একজন বয়স্কলোক জাহাজের ডেক পার হয়ে এগিয়ে এল। কাছে আসতে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তার মাথার চুল কোঁকড়া। থুতনিতে দাড়ি। বেশ বলিষ্ঠ দেহ। বলল—আপনারা কী চান?

—আপনার নামই কি আলফান? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আলফান মাথা ওঠা নামা করল। ফ্রান্সিস বলল—একটু দূরে এক সরাইখানা- ওয়ালা আমাদের বলল যে আপনি নাকি একটা জাহাজ বিক্রি করবেন।

—হ্যাঁ—আলফান বলল।

—শুনুন—হ্যারি বলল—আমাদের জাহাজ চুরি হয়ে গেছে আর এই বিদেশে বিভুঁয়ে বেশ কয়েকদিন কাটছে আমাদের।

—বুঝতে পারছি—আপনারা বিদেশি। আলফান বলল।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল।

—আসুন—জাহাজটা দেখুন। আলফান বলল।

আলফান পাটাতন দিয়ে নেমে এল। পেছনে ফ্রান্সিস আর হ্যারি। ফ্রান্সিসের কানে এল মারিয়ার ডাক—ফ্রান্সিস—আমরাও এসেছি। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল মারিয়া আর শাঙ্কো আসছে। কাছে এসে মারিয়া হেসে বলল—তোমরা জাহাজঘাটায় এসেছো শুনে আমরাও এলাম। শাঙ্কো বলল—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস?

—একটা জাহাজ কিনবো। সেটা দেখতে যাচ্ছি। চলো।

পাটাতন পাতা দিয়ে আলফান পাশের ছোট জাহাজটার ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসরাও উঠল।

কেবিনে নামবার সিঁড়ির কাছে একটা কাচঢাকা আলো জ্বলছিল। আলফান আলোটা তুলে নিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। ফ্রান্সিসরাও নামল। দুটো বেশ বড় কেবিনঘর। আলফান বলল—ডানদিকের ঘরটায় বাবা থাকতেন। বাঁ দিকের ঘরটা ছিল শোবার আর সাজগোজ করার ঘর। বাবা বেশ শৌখিন ছিলেন। দেশ বিদেশের সুগন্ধি এঘরে রাখতেন। আমি সে-সব এখন আমার ঘরে রেখেছি। শুধু রয়ে গেছে ঐ আয়নাটা। আলফান সেই ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিসরাও ঢুকল। কাঠের দেওয়ালে টানা পাটাতন। সেই পাটাতনে আটকানো একটা বেশ বড় ডিম্বাকৃতির আয়না। আয়নাটার মাঝ বরাবর ফাটা।

—আপনার বাবা তো এই আয়না ব্যবহার করতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। দিনরাতের মধ্যে কতবার যে মাথার চুল আঁচড়াতেন। আলফান বলল।

কাচঢাকা আলোয় সব দেখতে দেখতে হ্যারি বলল।

—আপনি বোধহয় এই ছোট জাহাজটা বেশি ব্যবহার করেন না।

—না। তবে মাঝে মাঝে রাতে থাকতে আমি। আলফান বলল।

এবার ফ্রান্সিসরা কাঠের তক্তাপাতা বিছানা রান্নাঘর আর একটা ছোট কেবিনঘর সব দেখল। বোঝাই যাচ্ছে খুব শৌখিন ছিল এই ছোট জাহাজটা।

সবাই ওপরের ডেক-এ উঠে এল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—খুব সুন্দর জাহাজটা। এটা কেন।

ফ্রান্সিস হাসল। মৃদুস্বরে বলল—আগে দরদস্তুর হোক।

আলফান কাচঢাকা আলোটা টাঙিয়ে রাখল। হ্যারি বলল—

—দেখুন—আপনার এই জাহাজটা অপছন্দের কোন কারণ নেই। কিন্তু আমাদের আর্থিক ক্ষমতা বেশি নেই। আমরা বহুদিন দেশছাড়া। কাজেই জাহাজটার উপযুক্ত মূল্য হিসেবে এই সোনার তীরধনুক দিতে পারি। স্বর্ণমুদ্রা আমাদের কাছে বেশি নেই। কথাটা বলে হ্যারি কাপড়ে প্যাঁচানো সোনার তীরধনুকটা বের করে। আলফানকে দিল।

আলফান তীরধনুকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বলল—কতটা আসল সোনা আছে এটাতে?

—তা কী করে বলবো। তাহলে কোনও স্বর্ণকারকে দেখাতে হয়। হ্যারি বলল।

আলফান বলল—আমি বলি কি এটা আমার কাছে থাক। আপনারা কালকে আসুন। আমি এর মধ্যে আমার জানাশুনো এক স্বর্ণকারকে দেখিয়ে নেব।

—না। আমরা এটা হাতছাড়া করবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাকে বিশ্বাস করছেন না। আলফান বলল।

—ফ্রান্সিস বলল—দেখুন আমি কাউকেই অবিশ্বাস করতে চাই না। কিন্তু বিশ্বাস করে ঠকেছি। তবু আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাই নি। একটু থেমে বলল—আপনি তীরধনুক রাখলেন। কালকে এসে যখন চাইব তখন তো আপনি তীরধনুকের কথা অস্বীকার করতে পারেন। আমরা বিদেশী। আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? আপনি এই অঞ্চলের ধনী ব্যবসায়ী। আপনার ক্ষমতা প্রতিপত্তি অনেক বেশি। এই সোনার তীরধনুক আপনার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এই মূল্যের ওপর। হ্যারি বলল—একটা কথা বলছি। আলফান—আপনি তো এই অঞ্চলের মানুষ। ব্যবসায়ী। নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত কোন স্বর্ণকার এখানে আছে।

—তা আছে। আলফান বলল।

—তাহলে—এখন তো রাত বেশি হয়নি। চুলন না তার দোকানে। হ্যারি বলল। আলফান একটু ভাবল। পরে বলল—যাবেন—চলুন।

সবাই সমুদ্রতীর থেকে রাস্তায় উঠে এল। একটা বাজার এলাকায় এল। দোকানে দোকানে কাচঢাকা বাতি জ্বলছে। লোকজনের তেমন ভিড় নেই। সবাই চলল।

বেশ কিছুটা এসে আলফান একটা দোকানে ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। দোকানে বসার জায়গা কম। মারিয়া আর হ্যারিকে বসিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কো দাঁড়িয়ে রইল।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে স্বর্ণকারের দোকান। কাঠের অলমারিতে বেশকিছু গয়না গাঁটি রাখা। কর্মচারীরা সোনার কাজ করছে প্রদীপ জ্বেলে।

মালিক একটা উঁচু জায়গায় বসেছিল।

আলফানকে দেখে দোকানের মালিক উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল—আসুন—আসুন। আপনি এলেন। খবর পাঠালে আমিই যেতাম। আলফান হ্যারির হাত থেকে সোনার তীরধনুকটা নিল। মালিকের হাতে দিয়ে বলল—দেখুন তো এটা আসল সোনার কিনা। মালিক হাত বাড়িয়ে নিল। বসল। হাত বাড়িয়ে একটা কালো পাথর বের করল। পাথরটা কষ্টিপাথর। প্রথমে তীর পরে ধনুকটা কষ্টিপাথরে ঘষল। পাথরের গায়ে সোনালি দাগ দেখল। মাথা তুলে বলল—খাদ আছে তবে আসল সোনাই বেশি।

আলফান বলল—ধরুন এ দুটো গালিয়ে সোনার চাকতি করা হল। কটা চাকতি হবে? একটুক্ষণ ভাবল মালিক। তারপর বলল—সাত আটটা চাকতি হবে।

—ঠিক আছে। এই দুটো রেখে দাও। আমাকে চাকতি গড়ে দেবে। আরফান বলল।

ফেরার পথে আলফান বলল—আপনারা কালকেই জাহাজটা নিতে পারেন। দাম তো আমি পেয়ে গেলাম।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ফিরে এল। সব ভাইকিংরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস সব ঘটনা বলল। ভাইকিংরা আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—।

মারিয়া হেসে বলল—কী সুন্দর জাহাজটা।

—এবার দেশের দিকে—তাই না। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—বাঃ এটা কি আমি একা চাইছি? তোমার কি দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই? মারিয়া বলল।

—আছে বৈকি। কিন্তু ওখানে নিশ্চিন্ত অলস জীবনে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস চলল জাহাজঘাটার দিকে। সকলেই আনন্দে অধীর। যা-হোক একটা জাহাজ পাওয়া গেছে। এবার দেশে ফেরা।

আলফান ওর বড় জাহাজটার ডেক-এ দাঁড়িয়েছিল।

ফ্রান্সিস আলফানের কাছে গেল। আলফান বলল—এবার জাহাজটা বুঝে নিন আপনারা। তবে জাহাজটার ডেক দেওয়াল কেবিনঘর সবকিছুই পরিষ্কার করতে হবে। তার জন্যে লোক লাগলে আমি দেব।

—দরকার পড়বে না। আমারাই সাফটাফ করবো। তবে সাফটাফ করতে গেলে যেসব জিনিস লাগে সেসব আমাদের দেবেন, তা হলেই হবে। হ্যারি বলল।

আলফান সেসব নিজের জাহাজ থেকে এনে দিল। ভাইকিং বন্ধুরা ঝাটা বুরুশ বালতি নিয়ে জাহাজটা পরিষ্কার করতে লেগে পড়ল। মারিয়ার নির্দেশেই কাজ হতে লাগল।

শাঙ্কো আর বিস্কো বন্দরের বাজারে গেল। আটা ময়দা চিনি এমনি সব খাওয়ার জিনিস বেশি করে কিনে নিয়ে এল।

ফ্রেজার আর পেড্রো সঙ্গে আর কয়েকজনকে নিয়ে গেল বন্দরে। দুটো পিপে ভর্তি করে খাবার জল নিয়ে এল।

বিকেলের মধ্যেই জাহাজটার চেহারা ফিরে গেল।

পেড্রো জাহাজের কোনাখামচি থেকে তিনটে কাচঢাকা আলো বের করল। তেল ভরে রাখল।

এ সময়ে আলফান ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। চারদিক দেখে টেখে বলল—বাঃ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন।

আলফান ওর খাবার সাজঘরে এল। সঙ্গে ফ্রান্সিস। আলফান চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—এ ঘরটাও বেশ পরিষ্কার করেছেন। বাবার সাজঘর ছিল এটা। ফ্রান্সিস বলল—

—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম।

—কী ব্যাপার? আলফান বলল।

—আপনি এই ঘরটা একইভাবে রেখে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ। শুধু সুগন্ধি তেল, সেন্ট, আতর এসব আমার কাছে রেখেছি। আলফান বলল।

—এই ঘরটা কি তাহলে আপনার বাবার আমলে যেমন ছিল তেমনি আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। আলফান বলল।

—কেন বলুন তো? ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে আলফান বলল বাবার সৃষ্টিটা আমি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি।

—আপনি আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। বাবার স্মৃতিবিজড়িত এই ঘরটায় মাঝে মাঝে আসি। বসি। বাবার কথা ভাবি। আলফান বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। আয়নাটার কাছে গেল। আয়নাটা দেখল। বলল—আলফান, এই আয়নাটা যেভাবে লাগানো হয়েছে তাতে শুধু লম্বা চেহারার মানুষই এই আয়নায় মুখ দেখতে পারবে।

আলফান হেসে বলল—না, আয়নাটা নামানো ওঠানো যায়। আলফান এসে আয়নাটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে আয়নাটা অর্ধেকটা নামাল। আবার অর্ধেকটা ওঠাল। আবার অর্ধেকটা সম্পূর্ণ ঘোরাল না। বলল—এইবার আপনার মুখ দেখতে পারবেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। দেখল ওর মুখ দেখা যাচ্ছে। ফাটা আয়না সত্ত্বেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। সন্দেহ নেই দামি কাচের আয়না।

—এই আয়নাটা কি আপনার বাবার আমলে যেমন ছিল তেমেনই আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—একইভাবে আছে। আলফান বলল।

—এই ঘরের সবকিছুই তো এখান থেকে সরিয়েছেন। এই আয়নাটা

সরাননি কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—অন্তত একটা বাবার স্মৃতিচিহ্ন থাক এখানে। এজন্যে। আলফান বলল।

যাবার সময় আলফান বলল—আপনারা কবে জাহাজ ছাড়বেন।

—কাল সকালেই। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজটার অনেককিছুই কিন্তু মেরামত করতে হবে। আলফান বলল।

—সেসব আমরা লিসবন বন্দরে করাবো। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতে এই ছোট জাহাজে শুতে অনেকেরই অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু কোনও ভাইকিং বন্ধু এই নিয়ে ফ্রান্সিসকে একটা কথাও বলল না। সব অসুবিধে মেনে নিল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া হলে জাহাজ নোঙর তুলে ছাড়া হল। বেগবান বাতাস। পালগুলো ফুলে উঠল।

জাহাজ দ্রুতগতিতে চলল।

ফ্রান্সিস সেই সাজঘরটায় এল। ওর কেমন মনে হল আলফান যে ঘরটা একই রকম রেখেছে তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। শুধু বাবার স্মৃতি নয়—

আলফান কিছু ভেঙে বলেনি। হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। বলল—কী দেখছো?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—এই ঘরটায় নিশ্চয়ই গোপনীয় কিছু আছে।

—তোমার এরকম কথা মনে হল কেন? হ্যারি বলল।

—আলফান যে এই ঘরটার কিছুই পালটায় নি তার পেছনে কোনও একটা কারণ আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী? হ্যারি জানতে চাইল।

—তাই তো বুঝতে পারছি না। এই ঘরটা আলফান ওর বাবার আমলের মতোই রেখেছে। কারণ এতে ওরপক্ষে সব খোঁজা সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী খুঁজবে? হ্যারি বলল।

—নিশ্চয়ই গোপনে রাখা এমন কিছু। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আলফান বহুদিন খুঁজেছে। কিছুই পায়নি। হ্যারি বলল।

—না পায়নি। তাই হতাশ হয়ে জাহাজটা বিক্রি করল। ফ্রান্সিস বলল।

—হতে পারে। হ্যারি বলল।

—হ্যারি—চলো সবকিছু ভালো করে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ঘরটার বোনাটোনা সব দেখল। লুকিয়ে রাখা কিছুই খুঁজে পেল না।

ফ্রান্সিস আয়নাটার সামনে এল। আয়নাটা ঘুরিয়ে নিজের মুখ দেখল। আরও ঘোরাল। কাঠের দেওয়াল। কাঠের ছাত দেখল। আবার দেওয়াল। দেওয়ালের পরে মেঝে। ফ্রান্সিস আয়না ঘোরানো বন্ধ করে বলল—হ্যারি এই আয়নাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তখনকার মত দুজনে চলে এল।

একদিন কাটল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঢেউ ভেঙে চলেছে।

আকাশ নির্মেঘ। চারদিকে ঝলমল্ রোদ। পালে জোর হাওয়া। ভাইকিংদের দাঁড় টানতে হচ্ছে না। ডেক-এর এখানে ওখানে ওরা শুয়ে বসে আছে। গল্প গুজব করছে।

সেদিন দুপুরে ফ্রান্সিস সেই সাজঘরে এল। এই কেবিনঘরে নিশ্চয়ই রহস্যময় কিছু আছে। আলফান সেটা বলেনি। ফ্রান্সিসের কেমন একটা বিশ্বাস এটা।

ফ্রান্সিস আয়নাটার কাছে এল। আয়নাটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। সেই কাঠের ছাত, দেওয়াল মেঝে আয়নায় দেখা যাচ্ছে। দুচারবার ঘুরিয়ে থামতেই হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল আয়নায় দেখা যাচ্ছে ছাত আর দেওয়ালের জোড়ের কাছে একটা লম্বাটে কাঠের ছোট তক্তামতো। ফ্রান্সিস আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই তক্তার গায়ে খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু লেখা। ফ্রান্সিস পেছন ফিরল। সেই কাঠের তক্তার গায়ে কি লেখা? ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। লেখাটা কী বুঝতে পারল না। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকতে গেল। হ্যারিকে নিয়ে এল। ঐ লেখাটা দেখাল। হ্যারিও অবাক।

হ্যারি বলল—কাছে উঠে গেলে বোঝা যাবে কী লেখা।

ফ্রান্সিস ছুটল শাঙ্কো আর বিস্কোকে ডাকতে।

শাঙ্কো বিস্কো এল। অন্য ভাইকিং বন্ধুরাও ঘরের দরজার কাছে ভিড় করল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—

—খুঁজে পেতে দ্যাখো একটা মইটই পাও কি না। না পেলে জাহাজে যে কাঠ রাখা আছে তাই দিয়ে একটা মই বানাও।

শাঙ্কো আর বিস্কো চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট মই তৈরি করে আনল। মই পাতা হল। মই দিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে লেখাটার সামনে গেল। কোন ভাষায় লেখা কিছুই বুঝল না। ও নেমে এল। হ্যারিকে উঠতে বলল। হ্যারি মই বেয়ে লেখাটার কাছে এল। লেখাটা দেখতে দেখতে বলল—পোর্তুগীজ ভাষায় কিছু লেখা। তবে উল্টো করে লেখা। আয়নায় দ্যাখো, সোজা পড়া যাবে। বলো, আমি এখানে মিলিয়ে দিচ্ছি।

ফ্রান্সিস আয়নায় লেখাটা পড়ে পড়ে বলল—আয়না তোমার ভাগ্য গড়ে দেবে।

হ্যারি বলল—ঠিক এটাই লেখা আছে ঐ লম্বাটে কাঠের তক্তায়।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজল। ভাবল। চোখ খুলে বলে উঠল—এই তক্তাটা খুলতে হবে। খুলতে পারলে পাওয়া যাবে আলফানের বাবার ধনসম্পদ। হ্যারি ততক্ষণে নেমে এসেছে। ফ্রান্সিস মই বেয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে বলল— একটা পেরেক তোলা হাতুড়ি দাও। শ্যাঙ্কো ছুটল। খুঁজে খুঁজে কাঠ রাখার ঘরে হাতুড়ি পেল। এনে ফ্রান্সিসকে দিল।

ফ্রান্সিস তক্তার গায়ে পোঁতা পেরেক খুলতে লাগল। একপাশের দুটো পেরেক খুলতেই তক্তাটা আলগা হল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করে সোনার চাকতি

পড়তে লাগল কাঠের মেঝের ওপর। টুং টাং শব্দ হতে লাগল। ফ্রান্সিস বাকি দুটো পেরেকও খুলে ফেলল। সব সোনার চাকতি পড়ে গেল।

ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুললো—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস নেমে এল। বলল—একটা দড়ির বস্তা আনতে। আনা হল বস্তা। সব সোনার চাকতি ঐ বস্তাটায় রাখা হল। ভাইকিংরা আনন্দে হৈ হৈ শুরু করেছে তখন।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—এই সোনার দাবিদার আলফান। কিন্তু সে এখানে নেই। জাহাজ ঘুরিয়ে ফিরে গিয়ে আলফানকে ওর পৈতৃক সম্পদ দেব তাও সম্ভব নয়। কাজেই এই সোনার মালিক এখন আমরা। লিসবনে পৌঁছে দুটো কাজ করতে হবে এই সোনা দিয়ে। একটা ভালো জাহাজ কিনবো। তারপর লিসবন বন্দর শহরে নিজেদের পোশাক কিনবো। গ্যাব্রিয়েল ঠিকই বলেছিল—আমরা যেন ভিখিরি হয়ে গেছি। ফ্রান্সিস বলল।

দিন চারেক পরে ফ্রান্সিসরা পোর্তুগালের রাজধানী বন্দর শহর লিসবনে এসে পৌঁছল।

সবে ভোর হয়েছে তখন। বেশ কুয়াশায় ঢাকা লিসবন শহর। বন্দরে কত জাহাজ। জাহাজগুলোর মাথায় কত দেশের পতাকা উড়ছে। কিছু জাহাজ জাহাজঘাটায় রয়েছে। আর কিছু জাহাজ বন্দর থেকে একটু দূরে দূরে নোঙর ফেলে ভাসছিল।

হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ কিছুদূরে দুটো জাহাজকে দেখল। একটা জাহাজ দেখতে ঠিক ওদের জাহাজের মত। কতদিন যে ওদের ঐ জাহাজে কেটেছে। কুয়াশায় ঢেকে গেল জাহাজ দুটো। হ্যারি দ্রুত পায়ে ছুটে গেল জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে। বলল—

—ফ্লেজার—জাহাজ থামাও। এক্ষুনি।

ফ্লেজার জাহাজ থামাল। হ্যারি ছুটল ফ্রান্সিসকে ডাকতে। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মারিয়াও ডেক-এ উঠে এল।

হ্যারি হাত পঞ্চাশেক দূরে দুটো জাহাজ দেখল। তখনই কুয়াশা কেটে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল জাহাজ দুটো। নিজেদের জাহাজটা দেখেই ফ্রান্সিস চিনল। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে থেমে গেল।

ততক্ষণে ওদের জাহাজটা যে দেখা গেছে সেটা সব ভাইকিং বন্ধুরা জানল। সবাই জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—ভাইসব—সামনের জাহাজটা গ্যাব্রিয়েলের। পেছনে বাঁধা জাহাজটা আমাদের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্যাব্রিয়েল আমাদের জাহাজ বিক্রি করতেই এখানে এসেছে। এখনও খদ্দের পায়নি। অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমরা অপেক্ষা করবো না। আজ রাতেই আমাদের অভিযান।

সেদিন রাতে ভাইকিংরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। রাত একটু গভীর হতে সবাই ডেক-এ এসে দাঁড়াল। ভাইকিংরা নিরস্ত্র। জলদস্যুরা সশস্ত্র। একটা অসম

লড়াই।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমরা ঐ জলদস্যুদের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করতে পারবো না। ওরা নরপশু। ওদের মনে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। কাজেই আমরা মুখোমুখি লড়াইয়ে যাবো না। আমরা আমাদের জাহাজের পেছন দিয়ে উঠবো। পাহারাদার জলদস্যুদের বুদ্ধিবলে হারিয়ে জাহাজ উদ্ধার করবো। জাহাজ চালিয়ে পালাবো। ফ্রান্সিস থামলো।

ফ্রেজার বলল—আমি এই জাহাজটা আমাদের জাহাজের ঠিক পেছনে গিয়ে থামব। হালের খাঁজে পা রেখে রেখে শাঙ্কো জাহাজে উঠবে। দড়ির মই ফেলে দেবে। আমরা সবাই উঠবো। তারপর লড়াই পাহারাদার জলদস্যুদের সঙ্গে।

ফ্রেজার জাহাজের হুইল ধরল। আস্তে আস্তে জাহাজ পেছোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট জাহাজটা ফ্রেজার ওদের জাহাজের ঠিক পেছনে আনল।

শাঙ্কো ওদের জাহাজের ঝুলন্ত দড়িদড়া ধরে হালের খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। সিঁড়ি ঘরের আড়ালে দাঁড়াল। তার আগে দড়ির মইটা নামিয়ে দিল। মই বেয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি উঠে এল। ডেক-এ গড়িয়ে গিয়ে ওরা সিঁড়িঘরের পেছনে চলে এল। উঠে দাঁড়াল। সিঁড়িঘরের আড়াল থেকে ডেক-এর দিকে মাস্তুলের দিকে তাকাল। কুয়াশায় অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল চারজন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এ ঘোরাঘুরি করছে।

ওদিকে ফ্রান্সিসের দেখাদেখি চার-পাঁচজন ভাইকিং বন্ধু ডেক-এর পাটাতনে গড়িয়ে গিয়ে ফ্রান্সিসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে গেলো। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—ডেক-এর শেষের দিকে যে দুটো জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে বসে আছে তার মধ্যে বাঁ দিকেরটা তোমার ডানদিকেরটা আমার। ফ্রান্সিস থামল। তারপর আস্তে বিস্কোকে ডাকল। বলল—যে দুটো জলদস্যু খোলা তরোয়াল । কানে বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ। ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। তারপর ছুটে ডেক পার হয়ে গিয়ে ডানদিকের জনদস্যুটার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। এই হঠাৎ আক্রমণে জলদস্যুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ও পেছনে উল্টে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে জলদস্যুটার বুকে ঢুকিয়ে দিল। ওদিকে শাঙ্কোও অন্য জলদস্যুটার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে।

এবার অন্য জলদস্যু চারজন অন্য ভাইকিংদের হাতে মারা গেল।

শাঙ্কো দ্রুত পায়ে জাহাজের সামনে এল। জলদস্যুদের জাহাজটার সঙ্গে মোটা কাছিতে বাঁধা ওদের জাহাজটা শাঙ্কো ছোরা বের করল। ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে কাছিটা কেটে ফেলল। ওদের জাহাজটা আস্তে আস্তে হাত কুড়ি-পঁচিশ সরে এল।

ওদিকে নিচের অস্ত্রঘরে দুজন জলদস্যু অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছিল। হাতে খোলা তরোয়াল। সেই দুটোকে বিস্কো আর অন্য দুইজন ভাইকিং মোকাবিলা করল।

অন্ধকার থেকে দ্রুত ছুটে গিয়ে বিস্কো একটা জলদস্যুর মাথায় ভাঙা দাঁড় দিয়ে ঘা মারল। ঐ জলদস্যু আর উঠল না। অন্য জলদস্যুটার হাতে ভাঙা দাঁড়ের ঘা মারতে হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ওটাকে ধরে আর শুয়ে থাকা জলদস্যু দুটিকে বিস্কোরা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নিজেদের জাহাজটা বেশি দূরে সরে আসার পর ভাইকিংরা ধ্বনি দিল—ও-হো-হো।

পেড্রো ছুটে গিয়ে মাস্তুলটাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। কয়েকজন ভাইকিং আনন্দে ডেক-এ গড়াগড়ি খেতে লাগল। একজন ভাইকিং বন্ধু ডেক-এর কাঠে জুতো ঠুকে ঠুকে তাল দিতে লাগল। আরও কয়েকজন ভাইকিং তালে তালে হাত-পা ছুঁড়ে নাচতে লাগল।

সম্রাটের রাজকোষ

হুয়েনভা বন্দর শহর। ফ্রান্সিসদের জাহাজ তীরে ভেড়ানো। ফ্রান্সিস বলেই রেখেছে পরদিন ওরা নিজেদের দেশের দিকে জাহাজ চালাবে। ভাইকিংরা খুব খুশি। কতদিন পরে দেশে ফেরা। নিজেদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা কত মূল্যবান ধনসম্পদ কত বুদ্ধি খাটিয়ে ফ্রান্সিস উদ্ধার করেছে। কতবার ওরা মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এসেছে। বিশেষ করে ফ্রান্সিস হ্যারি শাঙ্কো আর বিস্কো সব কাহিনী ওরা দেশবাসীকে বলবে।

মানুষের সঙ্গে যেমনি লড়াই করেছে তেমনি প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গেও লড়াই করেছে। কতবার ঝড়ের প্রচণ্ড শক্তিশালী ঝাপটায় ওদের জাহাজ ডুবতে ডুবতে উঠে পড়েছে ঢেউয়ের মাথায়। সমুদ্রের জলে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে ওরা বেঁচে গেছে।

সেদিন গভীর রাত। জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্র। ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো নাচছে।

মাস্তুলের মাথায় বসে থাকা নজরদার পেড্রোর একটু তন্দ্রামত এসেছিল। তন্দ্রাভাবটা চলছিল পেড্রোর। হঠাৎ ধড়ফড় করে জেগে উঠল। একবার চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে তখনই দেখল দক্ষিণ দিক থেকে দুটো জাহাজ আসছে বন্দরের দিকে। দেখল—একটা যুদ্ধ জাহাজ আর একটা শৌখিন ছোট জাহাজ।

পেড্রো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিচের জাহাজের ডেক-এর দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—সাবধান, দুটো জাহাজ আসছে এদিকে। ফ্রান্সিসকে খবর দাও। দু' চারজন ভাইকিং ডেক-এ ঘুমিয়েছিল। দুজনের ঘুম ভেঙে গেল পেড্রোর ডাকে। পেড্রোর কথা শুনল। উঠে দাঁড়াল। ছুটলো ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়া।

মাস্তুলের ওপর থেকে গলা চড়িয়ে পেড্রো বলল—দক্ষিণ দিকে দ্যাখো। ফ্রান্সিসরা দেখল দুটো জাহাজ এই হুয়েনভা বন্দরের দিকেই আসছে। একটা যুদ্ধ জাহাজ। একটা শৌখিন জাহাজ।

—কী করবে ফ্রান্সিস? হ্যারি বলল।

—বুঝতে পারছি না জাহাজ দুটো এক গভীর রাতে এদিকে এই হুয়েনভা বন্দরে আসছে কেন?

—ফ্রান্সিস আমি নিশ্চিত ওরা লড়াই করতে আসছে। এই হুয়েনভা থেকে রাজধানী সেভিল পর্যন্ত রাজা ফার্নান্দোর রাজত্ব। যারা আসছে তারা লড়াই করে হুয়েনভা বন্দর দখল করবে। হ্যারি বলল।

দুটো জাহাজ খুব দ্রুতবেগে আসছে। তত্ক্ষণে ঐ জাহাজ দুটো অনেক কাছে

এসে পড়েছে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার—জানি না কেন দুটো জাহাজ এই হুয়েনভা বন্দরে আসছে। এরা কারা আমরা জানি না। কিন্তু এই সমুদ্রতীরের জাহাজ ঘাটায় আমরা থাকবো না। জাহাজ ছাড়ো। যতটা সম্ভব মাঝ সমুদ্রের দিকে জাহাজ নিয়ে চলো। এখানে এখন থাকা বিপজ্জনক।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ আরব সমুদ্রের দিকে সরে এল। ফ্রান্সিসরা দেখল দুটো জাহাজ থেকেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা দলে দলে নেমে এল। এত সৈন্য। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। চারদিক নিঃশব্দ। শুধু সমুদ্রের শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। আর তীরে ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ।

সৈন্যরা যুদ্ধ জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল। যতটা সম্ভব জুতোয় কোনরকম শব্দ না তুলে ওরা নেমে আসতে লাগল। পরপর। তারপর রাস্তায় উঠে সারি বেঁধে দাঁড়াল। সেনাপতি নামল জাহাজ থেকে। একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—সৈন্যবাহিনী—এখান থেকে পাঁচশো হাত দূরে ডানদিকে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যদের সৈন্যাবাস। নিঃশব্দে ঐ সৈন্যাবাসে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঐ সৈন্যদের প্রস্তুত হবার সময় দেওয়া চলবে না। তারপর নিরস্ত্র ওদের হত্যা করতে হবে। চলো সব।

সৈন্যদল ছুটল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওরা সৈন্যাবাসের কাছে গেল। সৈন্যাবাসে কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা সৈন্যাবাসে ঢুকে দেখল—একজন সৈন্যও নেই। ওরা প্রত্যেকটি ঘর দেখল। কোন ঘরে কোন সৈন্য নেই।

ওরা বাইরে এল। চাঁদের আলোয় পূবদিকে তাকিয়ে দেখল ওখানকার প্রান্তরে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ দুই সৈন্যবাহিনীই স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাজা রিকার্ডো তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রান্তরের দিকে ফার্নান্দোর সৈন্যবাহিনীর দিকে ছুটে গেল. রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যবাহিনীও ছুটে এল। দুই সৈন্যবাহিনী পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল লড়াই।

ফ্রান্সিস তাদের জাহাজ থেকে শুনতে পেল তলোয়ারের ঠোকাঠুকির শব্দ। সৈন্যদের যুদ্ধকালীন চিৎকার আহতদের গোঙানির শব্দ। লড়াই চলল।

নজরদার পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল—একটা লোক আমাদের জাহাজের দিকে সাঁতরে আসছে। এবার ফ্রান্সিসরাও উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল একটা লোক দ্রুত সাঁতরে আসছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজের হাল ধরে একটু বিশ্রাম নিল লোকটা। তারপর হাল বেয়ে বেয়ে ওপরে ডেক-এ উঠে এল। ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। ভাইকিংরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। ওরা বুঝে উঠতে পারল না—লোকটা কে? তবে পরনে এদেশীয় লোকেদের পোশাক।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি এবার লোকটার কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—এবার উঠে

বসো। লোকটা আস্তে আস্তে বসল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি কে? আর কোথাও না গিয়ে আমাদের জাহাজে এলে কেন?

—আপনারা বিদেশী। তাই নির্ভয়ে এলাম। জানি এখানে কোন বিপদ নেই। লোকটা বলল।

—তুমি বুঝলে কী করে যে আমরা বিদেশী? হ্যারি বলল।

—জাহাজের গড়ন দেখে। আমাদের দেশের জাহাজের সঙ্গে প্রায় কোন মিলই নেই। লোকটি বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—

—তুমি বেশ বুদ্ধিমান। তোমার নাম কী?

—আলখাতিব। আমি সোনীয়। লোকটা বলল।

—তুমি কোত্থেকে এলে? হ্যারি বলল।

—রাজা ফার্নান্দোর কয়েদঘর থেকে। আলখাতিব বলল।

—কী করে পালালে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এখান থেকে বেশ কিছু দূরে ক্যামেরিনাল বন্দর। আলখাতিব বলল।

—হ্যাঁ সেই বন্দর শহরে আমরা থামি নি। পার হয়ে এখানে এসেছি। হ্যারি বলল।

—ঐ ক্যামেরিনাল এলাকার রাজা—রিকার্ডো। এই রিকার্ডো জাহাজে তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে ফার্নান্দোকে হারাতে। সেভিল অঞ্চল দখল করতে। আলখাতিব বলল।

—ও! তাহলে দুই রাজার লড়াই? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আর একটা মজার ব্যাপার কি জানেন? রিকার্ডো ফার্নান্দোর বড় ভাই। দুই ভাইয়ের লড়াই লেগেই আছে। রিকার্ডোর সৈন্যরা সৈন্যাবাস আক্রমণ করেছিল। কয়েদঘরের চারপাশে লড়াই চলছিল। আমরা কুড়ি পঁচিশজন বন্দী ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোহার দরজা ভেঙে পালিয়েছি। আলখাতিব বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—যাও—আলখাতিবকে শুকনো পোশাক দাও। ওর থাকার ব্যবস্থা কর। আলখাতিব শাঙ্কোর সঙ্গে চলে গেল। অনেক ভাইকিং গিয়ে শুয়ে পড়ল। ডেক-এ দাঁড়িয়ে রইল ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মারিয়া। কেউ কেউ ডেক-এ বসে রইল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল যুদ্ধের ফলাফল জানতে।

ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। তারাগুলোর উজ্জ্বলতা কমে আসছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আকাশ সাদাটে হয়ে আসছে। পূবদিকের দিগন্তে কমলা রং ফুটে উঠল। সূর্য উঠতে দেরি নেই।

যুদ্ধের উন্মাদনা থিতিয়ে এসেছে। সৈন্যদের হৈ হৈ চিৎকার থেমে গেছে। তবে আহতদের আর্তনাদ গোঙানি এখনও শোনা যাচ্ছে।

ভোর হল। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল। সূর্যের স্নিগ্ধ আলো ছড়াল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায় দূরে তীরভূমির গাছপালায়। ফ্রান্সিস

বলল—হ্যারি—এই পৃথিবী কত সুন্দর। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত এই আলো এই বাতাস। নির্দয় মানুষেরা এই পরিবেশেও পরস্পর হানাহানি করে। আহত হয়ে মরে। আশ্চর্য!

তখন একটু বেলা হয়েছে। সকালের খাবার নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়া ডেক-এ এল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে রইল তীরভূমির দিকে। আল-খাতিবও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দাঁড়াল।

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ দেখল রিকার্ডোর সৈন্যরা দলে দলে ছুটে আসছে। ওদের জাহাজে উঠে আসছে। ফ্রান্সিস বলল—আলখাতিব—রিকার্ডোর সৈন্যরা কি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসছে?

—হ্যাঁ। যুদ্ধে রাজা রিকার্ডো মনে হয় হেরে গেছেন। আলখাতিব বলল। তখনই দেখা গেল একটা ঘোড়ার পিঠে কে বসে আছে। তাকে ঘিরে সৈন্যরা জাহাজঘাটার দিকে আসছে। আলখাতিব বলে উঠল—যা ভেবেছি তাই। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে রাজা রিকার্ডো। বোধহয় আহত। ঐ দেখুন—আরো সৈন্য আসছে। আহতদের কাঁধে করে নিয়ে আসছে।

রাজা রিকার্ডোকে সৈন্যরা ধরাধরি করে জাহাজে উঠতে সাহায্য করল। রাজা রিকার্ডোকে জাহাজে তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নোঙর তোলা হল। পরিশ্রান্ত, আহত সৈন্যদের তখনও আনা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের তীরে রেখেই জাহাজ চলতে শুরু করল। যুদ্ধ করে ক্লান্ত আহত সৈন্যদের কথা রাজা রিকার্ডো একবারও ভাবলো না। জাহাজঘাটায় শুইয়ে রাখা আহত সৈন্যদের আর্তনাদে গোঙানিতে ভরে উঠল জাহাজঘাটা। কিন্তু রাজা রিকার্ডোর জাহাজ ফিরল না। মাঝ সমুদ্রের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—মনে আছে সেই রাজা হুয়েমাক-এর কথা। আহত তৃষ্ণার্ত সৈন্যদের সঙ্গে রাজা হুয়েমাক রাত জেগে তাদের চিকিৎসা ও জলপানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সভ্যদেশের রাজা হয়ে রিকার্ডো তার সৈন্যদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আহত সৈন্যদের সুস্থ সৈন্যদের রাজা ফার্দিনান্দোর দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে এল। যুদ্ধজয়ী রাজা ফার্নান্দো ঐ পরিত্যক্ত সৈন্যদের হত্যাও করতে পারে। হত্যা না করলেও বন্দী করে রেখে দেবে। কয়েদঘরের জঘন্য পরিবেশে তিলে তিলে মরবে ওরা।

ফ্রান্সিসরা দেখল জাহাজঘাটা থেকে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা সমুদ্রতীর ধরে এদিক ওদিক পালাচ্ছে।

রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছাকাছি এল। অন্য যুদ্ধ জাহাজটা এল পেছনে পেছনে। শৌখিন জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের খুব কাছে এল। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া তখনও ওদের জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজ আমাদের জাহাজের কাছে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের

গায়ে আস্তে ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। ফ্রান্সিসরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্রান্সিস একবার ভাবল দ্রুত জাহাজ চালিয়ে চলে যাই। তাহলে রাজা রিকার্ডোর যুদ্ধ-জাহাজ ওদের ধাওয়া করে ধরে ফেলবে। ওদের নিশ্চয়ই বন্দী করবে। আবার শুরু হবে বন্দীজীবন। তার চেয়ে দেখা যাক না রাজা রিকার্ডো কী বলে—কী করে।

রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজ থেকে রোগা লম্বা চেহারার একজন সশস্ত্র লোক ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। সঙ্গে তিন চারজন সৈন্যও এল। রোগা লম্বা সৈন্যটি বলল—তোমাদের দলনেতা কে?

—আমি। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

—তোমরা বিদেশী? লোকটি বলল।

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপ ঘুরে বেড়ানো আমাদের নেশা। কোথাও কোন গুপ্তধনের খোঁজ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—উদ্ধার করে সেই গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাও। লোকটি বলল।

—আপনি কিন্তু তার কোন প্রমাণ পান নি। মিথ্যে সন্দেহ। ফ্রান্সিস বলল।

লম্বা রোগা লোকটি বলল—যাক গে ওসব। আমি রাজা রিকোর্ডোর সেনাপতি। লোকটি বলল। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্যই হল—এই লম্বা রোগা তালপাতার সেপাই রাজা রিকার্ডোর সেনাপতি? এবার সেনাপতি বলল—

—তোমাদের বন্দী করা হল।

—কেন? কোন অপরাধে? হ্যারি বলল।

—আমরা প্রায় নিঃশব্দে খুব সতর্কতার সঙ্গে রাজা ফার্নান্দোর সেনানিবাস আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যবাহিনীর একজন সৈন্যও সেনানিবাসে নেই। সশস্ত্র সৈন্যরা সামনের প্রান্তরের শেষে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি বলল।

—ওঁরা নিশ্চয়ই আপনাদের আক্রমণের সংবাদ আগে থেকে ওদের জানিয়েছিল। হ্যারি বলল। সেনাপতি ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। বলল—ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি। ওরা কী করে আমাদের আক্রমণের সংবাদ জানল?

—হয়তো তাদের নিয়োগ করা কোন গুপ্তচর আগেভাগে খবরটা জেনে ওদের জানায়। ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতি আবার ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল—হ্যাঁ—সেই গুপ্তচর হবে তোমরা? ফ্রান্সিস হ্যারি কোন কথা বলতে পারল না। ওরা দুজনে অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—

—আমরাই যে সেই গুপ্তচর তার প্রমাণ আপনারা কীভাবে পেলেন?

—রাজা রিকার্ডোই প্রথমে বুঝতে পারেন। আমাদের জাহাজ দুটো যখন তীরে ভিড়ল তোমরা তোমাদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে এখানে চলে এলে। সেনাপতি বলল।

—আমরা যুদ্ধে জড়াতে চাইনি। ফ্রান্সিস বলল।

—গুপ্তচরবৃত্তি কি যুদ্ধে জড়ানো না? সেনাপতি বলল।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। গুপ্তচরবৃত্তি করে আমাদের কী লাভ? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা। সেনাপতি বলল। ফ্রান্সিস রাগস্বরে গলা চড়িয়ে বলল—না —আমরা গুপ্তচরবৃত্তি করি নি। আমরা এই প্রথম রাজা ফার্নান্দো আর রাজা রিকার্ডোর লড়াইর খবর জানলাম। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি একটু চুপ করে থেকে বলল—তাহলে শোন—লড়াই শুরুর পরে আমাদের জাহাজের নজরদার একটা লোককে সমুদ্রে সাঁতরে গিয়ে তোমাদের জাহাজে উঠতে দেখেছে।

—হ্যাঁ—একজন এ দেশীয় লোক—নাম আলখাতিব আমাদের জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাকে দিয়েই তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করিয়েছো। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। আলখাতিবকে ডাকছি। ওকেই জিজ্ঞেস করুন। ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করে বিস্কোর দিতে তাকাল। বলল—আল খাতিবকে নিয়ে এসো।

বিস্কো কিছুক্ষণের মধ্যেই আলখাতিবকে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল—খাতিব বলো তো তুমি কি আগে আমাদের কখনো দেখেছো।

—না। আলখাতিব মাথা নেড়ে বলল।

সেনাপতি বলল—শোন্—তুই আগে থেকেই এদের চিন্‌তিস। এদের কথামতই তুই গুপ্তচরের কাজ করতিস।

আলখাতিব ভীত মুখে বলে উঠল—না—না—আমি এদের আজকেই প্রথম দেখলাম।

—তুই কোথায় থাকিস? সেনাপতি বলল।

—এই হুয়েনভা নগরে। আমাদের বাড়িঘর তৈরির পৈতৃক ব্যবসা।

—তুই সমুদ্র সাঁতরে এই জাহাজে এসে উঠলি কেন? সেনাপতি বলল।

—এরা বিদেশী বলে। এখানে বিপদে পড়বো না বলে। আলখাতিব বলল।

—বিপদের কথা ভেবেছিলি কেন? সেনাপতি বলল।

—এখানে রাজা ফার্নান্দোর কয়েদঘরে আমি বেশ কয়েক বছর বন্দী হয়ে ছিলাম। আজকে লড়াইয়ের ডামাডোলে কয়েদঘরের লোহার দরজা ভেঙে আমরা যারা বন্দী ছিলাম সবাই পালিয়েছি। আলখাতিব বলল।

—তোকে বন্দী করা হয়েছিল কেন? সেনাপতি বলল।

—সে অনেক কথা। আলখাতিব বলল।

—তবু অল্প কথায় বল্। সেনাপতি বলল।

একটু থেমে আলখাতিব বলতে লাগল—সেভিলে প্রায় দেড়শ বছর আগে মার্ভিস নামে এক রোমান সম্রাট রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর রাজকোষের বহু মূল্যবান পাথর সোনার চাকতি এসব জিরান্ডা

টাওয়ারে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই জিরাল্ডা টাওয়ার তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি আমার প্রপিতামহের মোনক্কার সাহায্য নিয়েছিলেন। আমরা বংশানুক্রমিক সেই গল্প শুনে আসছি। মোনক্কা ছিলেন স্থপতি—বাড়িঘর তৈরি করতেন।

—হুঁ। তারপর? সেনাপতি মাথা ওঠানামা করে বলল।

—রাজা ফার্দিনান্দোর এক মন্ত্রী জানতো সেটা। ঐ মন্ত্রীই রাজাকে বলে আমাকে বন্দী করায়। চাবুক মেরে আমার কাছ থেকে জানতে চায় এই রাজকোষ গোপনে রাখার ব্যাপারে আমি কিছু জানি কি-না। আমি বললাম আমি এসবের কিছুই জানি না। মন্ত্রী সেকথা মানলে না। আমাকে কয়েদঘরে বন্দী করল। আজকের লড়াইয়ের ডামাডোলের মধ্যে কয়েদঘর থেকে পালালাম।

—হুঁ। যাক তোমাকে রাজা রিকার্ডোর কাছে যেতে হবে।

—আমরা? ফ্রান্সিস বলল।

—আর হ্যাঁ—ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাকেও যেতে হবে।

—বেশ যাবো। সঙ্গে আমার এক বন্ধুও যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—চলো। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে শৌখিন জাহাজটার দূরত্ব মাত্র তিন হাত। সেনাপতি আর সঙ্গের দুজন সৈন্য লাফিয়ে আগে শৌখিন জাহাজটায় উঠল। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো পরে উঠল। সবশেষে আলখাতিব।

ওরা রাজা রিকার্ডোর শয়নকক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। একপাট দরজা বন্ধ। সেনাপতি দরজায় টোকা দিল।

—ভেতরে এসো। রাজা রিকার্ডোর গম্ভীর গলা শোনা গেল।

সেনাপতি দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকল। ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ঢুকতে বলল।

ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। দেখল—রাজা রিকার্ডো একটা সুসজ্জিত বিছানায় বসে আছেন। রাজার বাহুতে পট্টি বাধা। বোঝাই যাচ্ছে যুদ্ধে আহত হয়েছেন। গায়ে একটা ফুলতোলা দামি কাপড় জড়ানো। সেনাপতি মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মহারাজ—এই তিনজনেই গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। ফ্রান্সিস বলে উঠল—মিথ্যে কথা।

—তোমরা বিদেশী? রাজা রিকার্ডো বললেন। রাজার বেশ ভারি গলা।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথায় দেশ তোমাদের? রাজা বললেন।

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—তোমাদের কথা শুনেছি। বীর জাতি। একটু থেমে বললেন—কিন্তু একটা কথা আমাকে বোঝাও তো। আমরা নিঃশব্দে রাজা ফার্দিনান্দোর সৈন্যাবাস আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সৈন্যাবাসে কোন সৈন্য নেই। তারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রান্তরের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। এটা কী করে হল?

—ওরা আগে খবর পেয়েছিল বোধহয়। হ্যারি বলল।

—বোধহয় না। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তচর আগেভাগে আমাদের আক্রমণের কথা তাদের জানিয়েছিল। রাজা বললেন।

—হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—হতে পারে নয়। তাই হয়েছে। তোমরাই আগেভাগে আমাদের আক্রমণের কথা ফার্নান্দোকে জানিয়েছো। রাজা রিকার্ডো বললেন।

—কিন্তু আমাদের কী স্বার্থে? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা বিদেশী। তোমাদের অর্থাভাব থাকবেই। অর্থের লোভে তোমরা এই কাজ করেছো। তোমাদের সুবিধে হল তোমরা বিদেশী। কাজ সেরে প্রাপ্য অর্থ নিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। রাজা রিকার্ডো বললেন।

—তা তো আমরা করি নি। আমরা সবাই এখনও এ তল্লাট ছেড়ে পালাই নি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তীর থেকে দূরে গিয়ে তোমাদের জাহাজ নোঙর করেছো। রাজা বললেন।

—আমরা যুদ্ধে জড়াতে চাই নি। হ্যারি বলল।

—কিন্তু আমার যুদ্ধ জাহাজ এই হুয়েনভা বন্দরে আসবে যুদ্ধ করার জন্যে—এই সংবাদটা তোমরা আগেই ফার্নান্দোকে জানিয়েছো। রাজা বললেন।

—এসব মিথ্যে অপবাদ। হ্যারি বলল।

রিকার্ডো চিৎকার করে বল উঠল—থামো। তারপর সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন—সবকটাকে বেত মারুন।

সেনাপতি ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একজন পাহারাদারকে নিয়ে কেবিনে ঢুকলো। তার হাতে চাবুক জড়ানো। রিকার্ডো প্রথমে আলখাতিবকে দেখিয়ে বলল—আগে এটাকে মার। গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তিটা আগে ওটাকে বুঝিয়ে দে। পাহারদার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস ডানহাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল—আমাদের অন্যায়ভাবে চাবুক মারা হচ্ছে। চাবুকের মার খাবার মত কোন কাজ আমরা করি নি। রাজা রিকার্ডো এক ঝটকায় উঠে পড়লেন। গা থেকে চাদরটা খসে পড়ল। খালি গায়ে দ্রুত পাহারাদারের কাছে এলেন। চাবুকটা কেড়ে নিয়ে এলোপাথারি ফ্রান্সিসদের গায়ে চাবুক মারতে লাগলেন। ফ্রান্সিস হ্যারিকে আড়াল করে দাঁড়াল। এই চাবুকের মার ব্যারি সহ্য করতে পারবে না। চাবুকের মার চলল। আলখাতিব সহ্য করতে পারল না। আর্তনাদ করে উঠল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিঃশব্দে মার খেতে লাগল। রাজা রিকার্ডো এক সময় চাবুক ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। বাঁ বাহুতে তরোয়ালের কোপ পড়েছে। আহত। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা রিকার্ডো চাবুক মারা বন্ধ করলেন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন—সব কটাকে বন্দী করুন। আমার রাজ্যে নিয়ে চলুন। চাবুকের মারের জন্যে পিঠ জ্বলে যাচ্ছে

ফ্রান্সিসদের। আন্দাজে বুঝল—পিঠে রক্ত বেরিয়েছে। চাবুক পিঠ কেটে বসে গেছে। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে মার খেয়েছে। এবার চোখ খুলে বলল—

—আমার বন্ধুদের কী হবে?

—আমার যুদ্ধ জাহাজের একেবারে নিচে আছে ছোট কয়েদঘর। সবাইকে সেখানে রাখা হবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—হ্যারি—তুমি ভালো আছো তো।

—তুমি তো আমাকে চাবুকের মার খেতেও দাওনি। সব মার নিজে গায়ে নিয়েছো। হ্যারি বলল।

—শাঙ্কো? ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল।

—আমি ভালো আছি। শাঙ্কো বলল।

—জ্বালা যন্ত্রণা। ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো হবেই। কিন্তু আমি সহ্য করছি। আমার জন্যে ভেবো না। শাঙ্কো বলল।

তখনই একজন সৈন্য ছুটতে ছুটতে কেবিনঘরে ঢুকল। রাজা রিকার্ডোকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—একদল বিদেশী আমাদের যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ করেছে। তখনই বাইরে হৈ হল্লা চিৎকার আহতের আর্তনাদ শোনা গেল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে চেলে বলল—হ্যারি—সর্বনাশ হল। এই অবস্থায় বোকার মত লড়াইয়ে নেমেছে।

রাজা রিকার্ডো চিৎকার করে বলল—যারা সুস্থ আছে তাদের লড়াইয়ে নামতে বলো। হোক লড়াই।

—একটু ধৈর্য ধরতে পারল না। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—হা ঈশ্বর—ওরা এটা কী করল। শাঙ্কো বলল।

রাজা রিকার্ডো বলল—যাও তোমাদের বন্ধুদের লড়াই বন্ধ করতে বলো।

—বেশ—আমরা যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজ থেকে ফ্রান্সিসরা রিকার্ডোর যুদ্ধ জাহাজে উঠে এল। দেখল ভাইকিংদের সঙ্গে রিকার্ডোর সৈন্যদের জোর লড়াই চলছে জাহাজের ডেক-এ। ফ্রান্সিস দুহাতে চেটো গোল করে মুখের কাছে এনে চিৎকার করে বলল—ভাইসব—লড়াই থামাও। তখন বিস্কোকে দেখল ফ্রান্সিস। বিস্কো তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল—আমরা শুনেছি—তোমাদের চাবুক মারা হয়েছে। তার বদলা নিচ্ছি। ফ্রান্সিস আবার চিৎকার করে বলল—বিস্কো ফ্রেজার—তোমরা লড়াই থামাও। আমার কথা শোন। বদলা নেবার সময় এখন নয়।

আস্তে আস্তে লড়াই থেমে গেল। ডেক-এ শোনা গেল আহতদের আর্তনাদ গোঙানি। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। বলল—বিস্কো শাঙ্কো তোমরা দেখ আমাদের বন্ধুদের কী অবস্থা। শাঙ্কো বিস্কো আহত বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে এল ডেক-এ। দেখা গেল তিনজন ভাইকিং বন্ধু মারা গেছে। তিনটি বন্ধুর মৃতদেহ ডেক-এ রাখা

হল। ফ্রান্সিসরা তাদের ঘিরে দাঁড়াল। ভাইকিং বন্ধুরা কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসের চোখেও জল। কত সুখ আনন্দ দুঃখের বন্ধু এরা তিনজন। ভেনকে ডাকা হল। মারিয়াও ততক্ষণে লড়াই থেমে গেছে দেখে যুদ্ধ জাহাজের ডেক-এ এসেছে। মৃত বন্ধুদের দেখে মারিয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস দেখল। কিছু বলল না।

ততক্ষণে ভেন এসে গেছে। ওর জোব্বামত পোশাকের পকেট থেকে একটা ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেল বের করল। একটা পাতা খুলে একটু পড়ল। বলল—আমেন। সবাই মৃদুস্বরে বলল, আমেন।

তিনটি মৃতদেহ পর পর তুলে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হল। বন্ধুরা কিছুক্ষণ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে লক্ষ্য করল যে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল একটু বেচাল হলে এরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সেনাপতি ভেন-এর কাছে গেল। বলল—আমাদেরও সাতজন সৈন্য মারা গেছে। তাদের শেষকৃত্যটা আপনি করুন।

—চলুন। ভেন বলল।

ভেনকে সেনাপতি নিয়ে ডেক-এর শেষদিকে এল। দেখা গেল সাতটা মৃতদেহ পড়ে আছে। ভেন জোব্বামত পোশাকের পকেট থেকে ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেলটা বের করল। আধপাতা পড়ল। অন্য সৈন্যরা মৃতদেহগুলি পরপর সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। এতগুলি মৃত মানুষ। সবাই জলে নিক্ষিপ্ত হল। নিজের বন্ধুদের জন্যে তো বটেই শত্রু-পক্ষর মৃত সৈন্যদের জন্যেও ফ্রান্সিসের চোখ ভিজে উঠল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—

—রাজা রিকার্ডো তোমাদের কী শাস্তি দিয়েছেন তা তুমি জানো?

—হ্যাঁ জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার বন্ধুদের সেটা বলো। সেনাপতি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—রাজা রিকার্ডো বলেছে এই জাহাজের নিচের দিকে একটা কয়েদঘর মত আছে আমাদের সেখানে বন্দী করে রাখবে যাতে আমরা পালাতে না পারি। ক্যামেরিনালে রাজা রিকার্ডোর রাজত্ব। সেখানে আমাদের বন্দী করে রাখা হবে। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস আমরা এভাবে বন্দীদশা মেনে নেব?

—এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অসময়ে লড়াইয়ের ফল তো দেখলে—তিনজন প্রিয়বন্ধুকে হারালাম। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি তাড়া লাগাল—এবার সবাই সিঁড়ির দিকে চলো। নিচে নামতে হবে। ভাইকিংরা আর কেউ কিছু বলল না। সিঁড়িঘরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস সেনাপতিকে বলল—দেখুন—একটা অনুরোধ ছিল।

—সেনাপতি বলল—বলো।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদ-ঘরের কষ্ট ইনি সহ্য করতে পারবেন না। এঁকে কোন কেবিনঘরে রাখুন।

—দেখি—রাজাকে বলে। সেনাপতি বলল।

মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না—না। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।

—মারিয়া—জাহাজের নিচের কয়েদঘরে কী অমানুষিক কষ্ট তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি কাছেই ছিল। বলল—ফ্রান্সিস ঠিক কথাই বলেছেন রাজকুমারী। আমাদের সঙ্গে আপনার থাকা চলবে না।

মারিয়া আর কোন কথা বলল না।

সেনাপতি চলে গেল শৌখিন জাহাজটায়। রাজার সঙ্গে কথা বলে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল উনি রাজকুমারীকে দেখতে চান কথা বলতে চান।

—বেশ তো—চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাজামশাই একা কথা বলতে চান। সেনাপতি বলল।

—বেশ—রাজকুমারীকে নিয়ে যান। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েকজন সৈন্যসহ সেনাপতি শৌখিন জাহাজের ডেকটা কাছাকাছি আনল। মারিয়াকে বলল—উঠে যান। মারিয়া দুই জাহাজের অলী ফাঁকটা ডিঙিয়ে গেল। তারপর সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

মারিয়াকে রাজার কেবিনঘরে পৌঁছে দিয়ে সেনাপতি চলে এল। রাজা রিকার্ডোর কেবিনঘরটা মারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মারিয়া রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছে। এসব ওর কাছে নতুন কিছু নয়। ও অবাক হল না। যেমন ফ্রান্সিসরা হয়েছিল।

রাজা রিকার্ডো হেসে বললেন—শুনলাম তুমি নাকি রাজকুমারী।

—হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—কোন দেশের? রাজা বললেন।

—ভাইকিং দেশের। মারিয়া বলল।

—তা রাজপ্রাসাদ আর সেখানকার আরাম আয়েস ছেড়ে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

—আমার স্বামীর ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। মারিয়া বলল।

—যাবেন? রাজা বললেন।

—এইভাবে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন আমার স্বামী। আমিও তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। মারিয়া বলল।

—ও। এসব এক ধরনের পাগলামি। রাজা বললেন।

—বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হবে। মারিয়া বলল।

—তোমার ভালো লাগে এসব? রাজা বললেন।

—নিশ্চয়ই। মারিয়া বলল।

—যাক গে—এসব কথা। একটু থেমে রাজা রিকার্ডো বললেন—

—তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দামি দামি গয়নাগাঁটি আছে? আঙ্গুলের আংটিটা দেখিয়ে মারিয়া বলল—শুধু এই আংটিটা ছাড়া আমার কোন গয়নাগাঁটি নেই।

—উঁহু—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আপনি তল্লাশি করান। মারিয়া বলল।

—তোমাদের জাহাজে তল্লাশি তো হবেই। রাজা বললেন।

—তাহলে তো সবই জানবেন। মারিয়া বলল।

—তোমার স্বামীর নাম কী? রাজা বললেন।

—ফ্রান্সিস। মারিয়া বলল।

—আমার হাতে আজ চাবুকের মার খেয়েছে। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। মারি মাথা ওঠানামা করে বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের দুজনকে আলাদা কেবিনঘরে দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

—দুজন নয়—একজন। মারিয়া বলল।

—তার মানে? রাজা বললেন।

—শুধু আমি থাকবো। ফ্রান্সিস থাকবে না। মারিয়া বলল।

—সে কি ঐ কয়েদঘরে থাকবে নাকি? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রান্সিস ঐ কয়েদঘরেই থাকবে। মারিয়া বলল।

—ও। তাহলে তুমি একাই থাকবে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ।

দরজায় দ্বারী ছিল পাহারায়। গায়ে যোদ্ধাদের বেশ। হাতে পেতলের ঝক্‌ঝকে বর্শা। রাজা রিকার্ডো তুড়ি দিল। দ্বারী এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল। রাজা বললেন—সেনাপতিকে ডাক। দ্বারী চলে গেল। একটু পরেই সেনাপতি এল। রাজা বললেন—

—এই রাজকুমারী যে কেবিনঘরে থাকতো সেই ঘরটায় তল্লাশি চালাও। নিশ্চয়ই সোনাদানা দামি পাথর টাথর পাওয়া যাবে। কী বলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এরা গুপ্তধনও খুঁজে বেড়ায়। কাজেই এদের কেবিনঘরে মূল্যবান কিছু পাওয়া যাবেই। সেনাপতি বলল।

—হুঁ। তাহলে আপনি যান আর তল্লাশি চালান আর এই রাজকুমারীকে একটা কেবিনঘরে রাখবেন। রাজা বললেন।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে বলল—ঠিক আছে। আপনার হুকুমমত সব কাজ হবে।

মারিয়াকে নিয়ে সেনাপতি বেরিয়ে আসছে তখন মারিয়া ঘরটা আর একবার ভালো করে দেখল। ভাবল—আমাদের প্রাসাদে বাবার মন্ত্রণাকক্ষও এর চেয়ে সুন্দর। তবে রাজা রিকার্ডো বড়লোক সন্দেহ নেই। ওদিকে ভেন যুদ্ধে আহত বন্ধুদের চিকিৎসা করতে শুরু করল। ভালো ওষুধ পেয়েছে। তাই ভাবল—সবাইকে সুস্থ করা যাবে। মারিয়া সেনাপতি যদ্ধ জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

বলল— রাজা কী বললেন?

ঐ রাজার কেমন ধারণা হয়েছে আমার কেবিনে মূল্যবান কিছু গোপন রাস্তা আছে। সেনাপতিকে হুকুম দিয়েছে সেসব খুঁজে বের করতে। আমি আঙুলের একটি আংটি দেখিয়ে যখন বললাম — এই আংটি ছাড়া আমার কাছে দামি কিছু নেই। কথাটা শুনে রাজা যেভাবে তাকালে তাতে বুঝলাম কথাটা উনি বিশ্বাস করেন নি। মরুক গে।

রাজকুমারীকে এনে যখন তার জন্যে নির্দিষ্ট কেবিনঘরে রাখা হল তখন মারিয়ার নিজেকে বড় একা মনে হল। কিন্তু উপায় নেই। রাজা রিকার্ডোর সন্দেহের এখনও নিরসন হয় নি। এখনও তার বিশ্বাস ফ্রান্সিস হ্যারি আর আলখাতিব গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। এই গুপ্তচরদের বিশেষ করে আলখাতিবের আগাম খবরের জন্যেই তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

ওদিকে সেনাপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—আমার সঙ্গে চলো তোমাদের কেবিনঘরগুলো তল্লাশি চালাবো।

—শুধু আমার আর রাজকুমারীর কেবিনঘরটা তল্লাশি নিলে হত না? ফ্রান্সিস বলল।

—না আমরা সব কেবিনঘর দেখবো। সেনাপতি বলল।

—বেশ। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও যাবো। হ্যারি বলল। সেনাপতি হ্যারির দিকে তাকাল। বলল — বেশ তো চলো।

তিনজনে যুদ্ধজাহাজ থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। সেনাপতি একে একে খালি কেবিনঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দামি কিছুই পেল না। ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল—তোমার আর রাজকুমারীর কেবিনঘর কোনটা? ফ্রান্সিস ওর আর রাজকুমারীর কেবিনঘরটা দেখাল। সেনাপতি সেদিকে চলল। ফ্রান্সিস তখন উত্তেজনায় একটু কেঁপে কেঁপে উঠেছে। মারিয়ার চামড়ার ব্যাগে সোনার অনেক চাকতি রাখা আছে। মারিয়া তো সেসব সরাবার সময়ও পায়নি। ধরা পড়তেই হবে। রাজা রিকার্ডো সব নিয়ে নেবে। হাসবে। উল্লসিত হবে। ভালো দাঁও মারা গেছে। যে ভাবে হোক যখন ওরা মুক্তো হবে তখন হাতে একটা সোনার চাকতিও থাকবে না। এসব ভাবতে ভাবতে নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। সেনাপতি হ্যারিও ঢুকল।

সেনাপতি কাপড় চোপড় সরিয়ে খুঁজতে লাগল। দুটো লম্বাটে ছোট বাক্সও পেল। একটাতে দেখল সেলাই ফোঁড়াইয়ের সরঞ্জাম। অন্য বাক্সটায় বোতাম পিন এসব রয়েছে।

কিন্তু সেনাপতি হাল ছাড়ল না। মারিয়ার ব্যাগগুলি খুলে খুলে দেখতে লাগল। বড় বড় ব্যাগগুলোর নতুন পুরোনো পোশাক। সেই পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ সেনাপতি তল্লাশি চালান। দামি বলতে পেল—

হাতলে সোনারুপোর কাজ করা দুটো চিরুনি। দুটো চিরুনিই সেনাপতি নিল।

— ও দুটো চিরুনি রাজকুমারীর। চিরুনি দুটো রেখে দিল। হ্যারি বলল।

—বা। এতে সোনারুপোর কাজ করা। কাজেই দামি। রাজাকে দিতে হবে। একেবারে খালি হাতে রাজার কাছে গেলে রাজা যাচ্ছেতাই বলে আমাকে অপমান করবে। সেই অপমানের হাত থেকে তো বাঁচা যাবে। সেনাপতি বলল।

—তাহলে নিয়ে যান। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে যুদ্ধজাহাজে ফিরে এল। সেনাপতি রাজা রিকার্ডোর কাছে চলল। ফ্রান্সিস জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল—মারিয়া সোনার চাকতিগুলো দামি পাথরগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। সেসব রাজা রিকার্ডোর হাতে পড়ল না - আমরা বেঁচে গেলাম।

—দেখতে হবে না ফ্রান্সিস, এ রাজকুমারীর কাজ। উনি দারুর বুদ্ধিমতি। হ্যারি বলল।

দুজনে খুঁজে খুঁজে মারিয়ার কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—ঘরটা কেমন? মারিয়া বলল — একটা যুদ্ধ জাহাজ আর কত বিলাসী আয়োজন থাকে। যা আছে তার সমস্তই অধিকার নিতে হবে। এবার হ্যারি গলা নামিয়ে বলল—রাজকুমারী—রাজা রিকার্ডোর সেনাপতি আমাদের জাহাজে আপনার আর ফ্রান্সিসের ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজছে।

—কিচ্ছু পায় নি এই তো। মারিয়া দেখে বলল।

—হ্যাঁ শুধু আপনার চিরুনি দুটো পেয়েছে। ঐ দুটোতে তো সোনারুপোর কাজ আছে। তাই নিয়েছে। হ্যারি বলল।

—চিরুনি দুটো ফেরৎ নিতে হবে। মারিয়া বলল।

—কিন্তু আমাদের সোনার চাকতিগুলো—ফ্রান্সিস বলতে গেল। মারিয়া হেসে ফ্রান্সিসকে হাত তুলে থামাল। ডান পায়ের কাছে গাউনটা তুলল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দেখল—একটা কাপড়ের ব্যাগমত পায়ের সঙ্গে ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

—এটা তো—হ্যারি বলতে গেল।

—হ্যাঁ কাপড়ের ব্যাগ। এর মধ্যেই ঠেসে ভরা আছে সোনার চাকতিগুলো আর মণি-মাণিক্য দামি পাথর—আর সব দামি জিনিস। মারিয়া বলল।

আশ্চর্য! ফ্রান্সিস আর হ্যারি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি কখন—মানে—

—রাজা রিকার্ডোর জাহাজ আমাদের জাহাজের দিকে আসছে দেখেই বুঝলাম আমরা বিপদে পড়লাম। রাজা রিকার্ডো সোনার খোঁজে আমাদের জাহাজ তল্লাশি করবেই। তখনই এই ব্যবস্থা করলাম। ফ্রান্সিস হেসে বলল—তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

সেনাপতি এসে দাঁড়াল। বলল—তোমরা এখানে? কয়েদঘরে চলো।

ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া দুশ্চিন্তা করো না, ভয় পেয়ো না। আমরা মুক্তো হবোই।

দুজনে সেনাপতির সঙ্গে হেঁটে চলল। সিঁড়ি ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলল—হ্যারি আবার সেই বন্দি জীবন, বিনা অপরাধে।

—রাজা রিকার্ডোর সন্দেহ অত সহজে যাবে না। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ—কপালে ভোগান্তি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

নিচে যে ঘরটার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল সেখানে এই দিনের বেলাও অন্ধকার অন্ধকার একটা কাচ ঢাকা মোমবাতি জ্বলছে। তাতেই যতটুকু অন্ধকার কেটে গেছে। মোটা লোহার গরাদ দেওয়া ঘর। দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছিল। তাদের একজনকে সেনাপতি ইঙ্গিত করল। সে কোমরে ঝোলানো চাবির গোছা থেকে চাবি নিয়ে ঘরের দরজা খুলল। শব্দ হল ঢ—অং। সেনাপতি বলল—ভেতরে ঢোক। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকাল? আর কেউ নেই। শুধু পাহারাদার দুজন আর সেনাপতি। কয়েদঘরের দরজা খোলা। একবার যদি নিজেদের ডাক দেয়। দরজা খোলা পেয়ে ওরা অনায়াসে ছুটে আসতে পারে। সেনাপতি আর দুজন পাহারাদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। পাহারাদার দুজন আর সেনাপতিকে উল্টে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা দিয়ে, অনায়াসে ওরা পালাতে পারে। ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল অসম্ভব। তাহলে মারিয়াকে ফেলে পালাতে হয়। মারিয়ার নিরাপত্তার জন্যে ওরা মনের দিক থেকে দুর্বল।

খোলা দরজা দিয়ে ফ্রান্সিসরা ঢুকল। শব্দ তুলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শুয়ে বসে থাকা ভাইকিংরা চেয়ে দেখল। শুধু বিস্কো উঠে এল। বলল—ফ্রান্সিস—পালাবার সব রাস্তাই বন্ধ। তা ছাড়া ওসব ভেবেও লাভ নেই। রাজকুমারীকে ফেলে রেখে তো পালাতে পারবে না।

—দেখা যাক। সময় বুঝে সবদিক ভেবে মারিয়াকে নিয়ে পালাবো। এখন জাহাজ তো যাবে রাজা রিকার্ডোর রাজ্যের দিকে। রাজধানী ক্যামেরিনাল বন্দর শহরে জাহাজ ভিড়বে। জাহাজ থেকে আমাদের নামিয়ে ক্যামেরিন্যালের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবে। ওখানকার পাহাড়ের ব্যবস্থাটা দেখবো। মারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পালাবার সময় মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারি।

ওদিকে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ওদের যুদ্ধজাহাজের হালের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধলো। রাজা রিকার্ডো সেনাপতিকে হুকুম দিল জাহাজ ছাড়বার জন্য।

কিছুক্ষণ পর যুদ্ধজানের নোঙর তোলা হল। শৌখিন জাহাজের নোঙরও তোলা হল। তার পাল খুলে দেওয়া হল।

জনা দশেক সৈন্য দাঁড়ঘরে নেমে এল। সমুদ্রের জলে দাঁড় টানার শব্দ হল — ছলাৎ-ছলাৎ-ছপ্‌ছপ্‌।

জাহাজ তিনটি চলল।

সারারাত জাহাজ চলল।

ভোর হয় হয়। তখন জাহাজ তিনটি ক্যামেরিনাল বন্দর শহরের জাহাজঘাটায় পৌঁছল।

রাজা রিকার্ডো যুদ্ধে হেরে গেছে। এই দুঃসংবাদ রাজা রিকার্ডোর রাজধানীতে আগেই পৌঁছে গেছে।

সূর্য উঠলো। দলে দলে ক্যামেরিনালের অধিবাসীরা জাহাজঘাটায় জমায়েত হতে লাগল। রাজা রিকার্ডো শৌখিন জাহাজ থেকে নামলেন। প্রাসাদের মধ্যে কোন আনন্দের হৈ-হল্লা নেই। সবাই চুপচাপ। রাজা রিকার্ডো একটা খয়েরী রঙের ঘোড়ায় চেপে রাজপ্রাসাদের দিকে ঘোড়া ছোটালেন।

কিছুক্ষণ পরে যুদ্ধ জাহাজ থেকে সৈন্যরা একে একে নামল। জাহাজঘাটায় সৈন্যরা কয়েকজন ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে এল। এই গাড়িগুলোয় চাষীরা শস্য নিয়ে যায়। আটদশজন আহত সৈন্যকে সৈন্যরা ধরাধরি করে নামাল। তারপর ঐ গাড়িগুলোয় শুইয়ে দিল বসিয়ে দিল। আহত সৈন্যদের নিয়ে গাড়িগুলো আস্তে আস্তে সৈন্যাবাসের দিকে চলল।

আটজন সৈন্য এবার কয়েদঘরের সামনে এল। প্রত্যেকের হাতেই চার-পাঁচ হাত দড়ি, কয়েদঘরের লোহার দরজা খোলা হল। একজন একজন করে ভাইকিংদের কয়েদঘরের বাইরে নিয়ে আসা হতে লাগল। তারপর দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা হতে লাগল। একজন একজন করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ডেক-এ নিয়ে আসা হতে লাগল।

ফ্রান্সিস হাত বাঁধা অবস্থায় ডেক-এ উঠে এল। দেখল—মারিয়া চুপ করে ডেক-এর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে, জাহাজঘাটে নামতে লাগল। ওদের পেছনে মারিয়াও নামল।

এবার বেশ কয়েকজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস দেখল—ক্যামেরিনাল বন্দর শহরটা খুব বড় না। লোকবসতিও মনে হল বেশি নয়। কিন্তু বাড়িঘরদোর বেশ সাজানো গোছানো। সামনেই চাররাস্তার মোড়ে ফুলের বাগান। অজস্র ফুল আছে। মাঝখানে এক পরীর মূর্তি। শ্বেতপাথরের। পরী ঝারি থেকে জল ঢালছে। জমা জল থেকে ফোয়ারা। বেশ উঁচু পর্যন্ত ফোয়ারার জল উঠছে।

ফ্রান্সিসরা রাস্তা দিয়ে চলল। বিদেশী পোশাক পরা দুহাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। চারপাশের লোকজন ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে বিদেশী। কিন্তু ওদের বন্দী করা হল কেন? ওদের বোধহয় কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবে।

এর মধ্যেই সূর্য আকাশে উঠে এসেছে। চড়া রোদ। ফ্রান্সিসদের অসহ্য গরমের মধ্যে হাঁটতে হচ্ছে। খাওয়া এখনও জোটে নি। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া ওদের পেছনে পেছনে আসছে। মাথা ঢেকে বড় রুমাল বেঁধে নিয়েছে মারিয়া।

সৈন্যাবাসের সামনের মাঠটায় এল ওরা। পাহারাদার সৈন্যরা ওদের দক্ষিণ দিককার একটা পাথরের ঘরের দিকে নিয়ে চলল।

ঘরটার সামনে এসে সবাই দাঁড়াল। দুজন সৈন্য গেল ঘরটার লোহার দরজার

দিকে। একটু পরেই ফিরে এল। গলা চড়িয়ে বলল—সবাই এই কয়েদঘরে ঢোকো। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গিয়ে দেখল লোহার দরজা খোলা। দুজন পাহারাদার সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। একজন চাবির গোদা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। অন্য বন্ধুরা একে একে কয়েদঘরে ঢুকতে লাগল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—

—রাজকুমারী মারিয়াকে বন্দী করে কোথায় রাখা হবে?

—এই নিয়ে কথা বলতে হবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি।

—রাজা রিকার্ডোর অন্দরমহলে রাজকুমারীকে রাখতে বলো। হ্যারি বলল।

—তাই বলবো। কিন্তু সেনাপতি রাজি হবে কিনা তাই ভাবছি। সৈন্যরা তাড়া দিল। হ্যারি কয়েদঘরে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিস তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দুজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এই বিদেশী ভূত—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ফ্রান্সিসের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ভাবল—এই সৈন্যটাকে আমি খালি হাতেই নিকেশ করতে পারি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ফ্রান্সিস সৈন্যটাকে বলল—তোদের সেনাপতির সঙ্গে কথা বলবো। তাই দাঁড়িয়ে আছি। সেনাপতি কোথায়?

—সেনাপতি তোর চাকর নাকি—ডাকলেই আসবে। একজন সৈন্য বলল।

—আমরাই কি তোদের চাকর নাকি। ফ্রান্সিস বলল।

—চাকর ছাড়া কি। সৈন্যরা বলল।

—তবে রে। কথাটা বলেই ফ্রান্সিস সৈন্যটির কোষবদ্ধ তরোয়ালটা দ্রুত হাতে এক ঝট্‌কায় খুলে আনল। তরোয়ালটা উঁচিয়ে বলল—তুইও একটা তরোয়াল নে। দু তিনজন সৈন্য তরোয়াল কোষমুক্ত করে ছুটে এল। ফ্রান্সিসের তখন রুদ্রমূর্তি। তরোয়াল উঁচিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। লড়াই শুরু হয় হয়। মারিয়া ছুটে এল। চিৎকার করে বলল—ফ্রান্সিস—রেগে যেও না। মাথা ঠাণ্ডা কর। আমাদের বিপদ বাড়িও না। তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিসের অনড় শরীরটা নড়ল। তরোয়ালটা ছুঁড়ে ফেলল। সৈন্যরাও তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

একজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার বলো তো? ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। সেনাপতিকে অনুরোধ করবো একে যেন রাজ-অন্তঃপুরে রাখা হয়।

—কিন্তু সেনাপতি তো এখন নিজের বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে সেনাপতির এখন মন খারাপ। উনি এখন কিছু শুনতে চাইবেন না। সৈন্যটি বলল।

—তাহলে আমাকে পাহারা দিয়ে সেনাপতির বাড়িতে নিয়ে চল। আমাদের সমস্যাটা বুঝিয়ে বললে—উনি শুনবেন। উনি হয়তো রাজিও হবেন। সৈন্যটি একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—চলো। দেখা যাক।

মারিয়া তখন একটা কাঠের বাটিভর্তি জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে

ধরল। ফ্রান্সিস হাসল। মারিয়াও হাসল। নিশ্চিন্ত হল যে, ফ্রান্সিসের মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে এটা ফ্রান্সিস বুঝল জল দেখে। বাটিমুখে ঠেকিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে নিল। বাটিটা মারিয়াকে ফিরিয়ে দিল। মারিয়া বলল—আমিও খাবো।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল। ঐ বাটিটা ছিল কয়েদঘরের। একজন সৈন্যাকে মারিয়া ফিরিয়ে দিল। তারপর চলল ফ্রান্সিসের সঙ্গে। সেই সৈন্যটিই ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি একা যেও না। আরো দু'তিনজন সৈন্য সঙ্গে নাও। নইলে তুমি একা আমাদের নিয়ে যাচ্ছো—সেনাপতি এটা ভালো চোখে দেখবে না।

—তাও তো বটে। সেনাপতি রেগে গেলে বিপদে পড়বো। সৈন্যটি। তখন আরও তিন সঙ্গীকে সঙ্গে নিল। সবাই চলল সেনাপতির বাড়ির দিকে।

ওদিকে লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে বন্ধুরা দেখছিল ফ্রান্সিস-মারিয়া যাচ্ছে। হ্যারি বলল— ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই সেনাপতির কাছে যাচ্ছে।

—কেন? শাঙ্কো বলল।

—রাজকুমারীর খাবার ব্যবস্থা করতে। হ্যারি বলল।

—ফ্রান্সিস কী চায়? শাঙ্কো বলল।

—ফ্রান্সিস চায় রাজকুমারী রাজা রিকার্ডোর অন্তঃপুরে থাকুক। হ্যারি বলল।

—দেখ—সেনাপতি রাজি হয় কিনা দেখ। শাঙ্কো বলল।

—মনে হয় রাজি হবে। হ্যারি বলল।

ওরা ফ্রান্সিসের চলে যাওয়া দেখতে লাগল।

তিনজন সৈন্যসহ ফ্রান্সিস মারিয়া সেনাপতির আবাসের সামনে এল। দেখল একজন প্রহরী পেতলের বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। সৈন্যটি ঐ প্রহরীর কাছে গিয়ে কী বলল। বোধহয় সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবে এরকম কিছু বলল। প্রহরীটি ইঙ্গিতে ওদের অপেক্ষা করতে বলে বাড়িটার প্রধান দরজার সামনে গেল। বিরাট দরজা ওক কাঠের। সেই কাঠ কুঁদে কুঁদে নানা নকশা আঁকা।

দরজা খুলে প্রহরীটি ভেতরে গেল। কিছু পরে বেরিয়ে এল। বলল—এসো। দু'জন সৈন্য বাইরে রইল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া সৈন্যটির সঙ্গে ভেতরে ঢুকল।

একটা ঘর। ঘরের দুদিকে দুটো জানালা। তাতেও ঘরটার অন্ধকার অন্ধকার ভাবটা কাটেনি। ঘরের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার ওক কাঠের। পায়াগুলোও বাঁকা। বসার জায়গায় সাটিন কাপড় ঢাকা। তার নিচে পাখির পালকের গদী। ঘরের দেয়ালে পালিশ করা রঙিন ছবি আঁকা। ফ্রান্সিস বসল। একটু পরেই সেনাপতি ঢুকল। পরণে সাধারণ পোশাক। ঢোলা হাতা হলুদ জামা। তাতে নীল সুতোর কাজ করা।

সেনাপতি ঢুকতে ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি হাতের ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলল। দুজনে বসল। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে

বলল—তোমরা এসেছো কেন?

—আমাদের একটা কথা বলার ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি সেই সৈন্যটার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি একা এই দুজনকে নিয়ে এলে কেন? তুমি তো জানো ওরা বন্দী।

—আজ্ঞে বাইরে আমার দুজন সঙ্গী রয়েছে। সৈন্যটি বলল।

—হুঁ। সেনাপতি মুখে শব্দ করল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কী বলতে চাও বলো।

—একটা নিবেদন আছে আমাদের। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। সেনাপতি বলল।

মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—হুঁ। সেনাপতি মুখে শব্দ করল। বলল—তোমরা কী বলতে চাও বলো।

ফ্রান্সিস বলল—বলছিলাম যে কয়েদঘরে আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে ইনি থাকতে পারবেন না। ঐ পরিবেশ এর সহ্য হবে না।

—হুঁ। তারপর?

—যদি রাজকুমারীকে রাজ-অন্তঃপুরে থাকতে অনুমতি দেন তাহলে আমরা উপকৃত হব।

সেনাপতি মাথার চুলে একবার আঙ্গুল বুলিয়ে বলল—কিন্তু এই অনুমতি তো আমি দিতে পারি না। রাজা অনুমতি দেবেন। আমাকে রাজার কাছে যেতে হবে। তোমরা বসো। আমি রাজা মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আসছি। তবে তোমাদের অনুরোধ রাখবেন কিনা বলতে পারছি না। কারণ যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাজার মন মেজাজ ভালো নেই। তবু তোমাদের কথা বলবো। তারপর দেখা যাক।

সেনাপতি উঠে দাঁড়ালো তারপর খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সেনাপতি ফিরে এল। চেয়ারে বসে বলল—রাজা সম্মতি দিয়েছেন। তোমাদের রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। একমাত্র দিনের বেলা রাজকুমারী সকালে ও বিকেলে তোমাদের মোট দুবার দেখতে যেতে পারবেন। ফ্রান্সিস মারিয়া দুজনেই খুশি।

সেনাপতি চেয়ার ছেড়ে উঠল। ফ্রান্সিস মারিয়াও উঠে দাঁড়াল। সেনাপতি সৈন্যটিকে বলল—ওদের রাজকুমারীকে তুমি অন্দরমহলে পৌঁছে দিও।

ফ্রান্সিস ও মারিয়া সেনাপতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

সৈন্যটি এবার মারিয়াকে বলল—আপনি আমার সঙ্গে চলুন। মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—দিনে দুবার তোমাদের দেখতে যাবো।

—তাতেই হবে। আমাদের জন্যে ভেবো না। তুমি নিজে ভালো থেকো। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুটা এসে সৈন্যটি মারিয়াকে বলল—আমার সঙ্গে আসুন। সৈন্যটির সঙ্গে

মারিয়া চলে গেল।

রাজা-অন্তঃপুরে ঢোকার দরজাটার সামনে এসে সৈন্যটি ও মারিয়া দাঁড়াল। কালো দরজায় নানা রঙীন চিত্র। মারিয়া চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাতেই একজন পরিচারিকা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সৈন্যটি পরিচারিকাটির দিকে এগিয়ে গেল। বলল—শোন—রাজার হুকুম—এই রাজকুমারী অন্তঃপুরে বন্দী থাকবে। নজর রাখবে পালাতে না পারে। এঁর স্বামী আর তার বন্ধুরা কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। ইনি সকালে ও বিকেলে দুবার কয়েদঘরে যেতে পারবেন। তোমরা কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সাবধান পালাতে দেবে না।

—আসুন। পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া রাজঅন্তঃপুরে ঢুকল। মারিয়া দেখল—মেঝে শ্বেতপাথরের। পাথরের দেয়ালে নানা রঙের ছবি আঁকা। পরিচারিকারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু এগোতেই কানে এল বীণার সুরেলা বাজনা। যত এগোচ্ছে বাজনা তত স্পষ্ট হচ্ছে। কী সুন্দর সুরঝংকার। মারিয়া গানবাজনা কম শোনেনি। ও রাজপ্রাসাদের একটা ঘরই আছে নানা বাজনার। মারিয়ার অদ্ভুত ভালো লাগল। মারিয়া যে ঘরে বাজনার আসর বসেছে সেখানে এল।

একটি সুসজ্জিত বিছানায় বসে এক মহিলা তন্ময় হয়ে গ্রীক-বীণা বাজাচ্ছেন। চোখ বুঁজে বাজাচ্ছেন। তাই মারিয়াকে দেখলেন না। সহচরীরা গোল হয়ে বসে বীণার বাজনা শুনছে। মারিয়াও একপাশে বসে পড়ল।

বাজনা চলল।

একসময় বাজনা থামল। মারিয়ার তখন কান্না পাচ্ছে। এত সুন্দর বাজনা। আবার নিজেদের প্রাসাদেও তো বাজনা শুনেছে। সে কথাটাই মনে পড়তে মারিয়ার দুচোখ জলে ভরে উঠল।

মারিয়ার দিকে মহিলাটি তাকালো। যে পরিচারিকাটি মারিয়াকে নিয়ে এসেছিল সে মহিলাটিকে বলল—রাণিমা। রাণি ফিরে তাকালেন।

পরিচারিকা মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—রাণিমা—ইনি এক দেশের রাজকুমারী। এখানে এসে বন্দী হয়েছেন। মাননীয় রাজা এঁকে অন্তঃপুরে থাকতে বলেছেন।

রাণি হেসে বললেন—তোমার নাম কী?

—মারিয়া।

—তুমি কোনদেশের রাজকুমারী? রাণি বললেন।

—ভাইংকিং দেশের। মারিয়া বলল।

—তুমি বন্দী হলে কেন? রাণি বললেন।

—আপনি তো জানেন রাজা রিকার্ডো রাজা ফার্নান্দোর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছেন। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ শুনেছি। রাণি বললেন।

—আমরা জাহাজ চালিয়ে হুয়েনভা বন্দরে এসেছিলাম। মারিয়া বলল।

—আমরা মানে কারা? রাণি বললেন।

—আমি আমার স্বামী আর তার বন্ধুরা। মারিয়া বলল।

—ও। তারপর? রাণি বললেন।

—যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় রাজা রিকার্ডোর কেমন সন্দেহ হয় আমরা গুপ্তচর। আমরাই আগেভাগে রাজা ফার্নান্দোকে এই আক্রমণের কথা বলে দিয়েছি। মারিয়া বলল।

—তোমরা কি তাই করেছো? রাণি বললেন।

—না। আমরা এ দেশের কাউকে চিনি না, জায়গাও চিনি না।

—ও। তোমার স্বামী আর বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকেও বন্দী করা হয়েছে। রাণি বললেন।

—হ্যাঁ। তবে আমাকে কয়েদঘরে থাকতে হয়নি। রাজা রিকার্ডো আমাকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। মারিয়া বলল।

—হুঁ। তাহলে তুমি বন্দী? রাণি বললেন।

—হ্যাঁ। আমরা দেশে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম তখনই গুপ্তচর এই বদনাম দিয়ে আমাদের বন্দী করা হয়েছে। মারিয়া বলল।

—তোমরা ভাইংকিং জাতি। রাণি বললেন।

—হ্যাঁ। তোমরা বীর নির্ভীক। জাহাজ চালাতে ওস্তাদ তাই তো? রাণি বলল।

—হ্যাঁ— লোক তাই বলে। মারিয়া বলল।

—জিপসি কাদের বলে জানো তো? রাণি বলল।

—হ্যাঁ—জিপসিদের নিজেদের দেশ বলে কিছু নেই। যাযাবর—দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। মারিয়া বলল।

—গতমাসে একদল জিপসি এসেছিল। একটি জিপসি মেয়ে, এক ভাইকিং যুবকের দুঃসাহসী অভিযানের কাহিনী নিয়ে রচিত গান শুনিয়ে গিয়েছে। রাণি বললেন।

—সেই ভাইকিং যুবকের নাম ফ্রান্সিস। তাই না? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। তুমি চেনো তাকে? রাণি বললেন।

—ফ্রান্সিস আমার স্বামী। মারিয়া বলল।

—সেকি! ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের তাহলে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে? রাণি বললেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—ও। রাণি থামলেন। তারপর বললেন—রাজার মনটন এখন ভালো নেই। ভাই ফার্নান্দোর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। আহতও হয়েছেন। কয়েকটা দিন যাক। রাজা একটু সুস্থ হলে তোমাদের মুক্তির কথা বলবো।

—ঠিক আছে। মারিয়া বলল। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

মারিয়া অন্দরমহলেই রয়ে গেল। পরিচারক পরিচারিকারা মারিয়াকে যত্নেই রাখল। রাণিও মারিয়াকে একেবারে বান্ধবীর মত মেনে নিল। মারিয়া সুখেই রইল।

কিন্তু ফ্রান্সিসদের জন্য দুর্ভাবনা কিছুতেই যেতে চায় না। সুসজ্জিত টেবিল ঝকঝকে কাঁটা চামচ থালা প্লেট। সুস্বাদু খাবার। এসবের মধ্যেও মারিয়ার মন বিষণ্ণ। ফ্রান্সিসরা না জানি কী অখাদ্য খাচ্ছে। কেমন আছে ওরা।

রাণি প্রতিদিন সকালে রাজা রিকার্ডোকে দেখতে যান। মারিয়াও সঙ্গে যায়। রাজা উঠে বিছানায় বসে থাকেন। রাণি এলে খুশি হন। মারিয়ার সঙ্গেও দু একটা কথা বলেন। কিন্তু মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রাণি রাজাকে সান্ত্বনা দেন সুস্থ হন আবার যুদ্ধে নেমো। তোমার জয় হবেই। রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

—না। আমার আর যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা নেই।

—অত হতাশ হয়ে পড়ো না। রাণি বলেন।

রাজা চুপচাপ থাকেন। মারিয়াকে বলেন—রাজকুমারী তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না—না। আমি ভালোভাবেই আছি। মারিয়া বলে।

সেদিন এরকমই কথা প্রসঙ্গে মারিয়া বলল—

—মহামান্য রাজা—একটা প্রার্থনা ছিল।

—বলো।

—আমার স্বামী আর তার বন্ধুদের আপনি সন্দেহের বশে কয়েদ করে রেখেছেন। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—ওরা সত্যিই গুপ্তচরের কাজ করেছিল কিনা সেটা নিয়ে সেনাপতি তদন্ত করছে। যদি তোমার স্বামী ও বন্ধুরা নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে—আপনার সিদ্ধান্ত । এই নিয়ে কিছু বলার নেই। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল।

সেদিন যে লোকটি রাজার ক্ষতস্থান ধুইয়ে ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দেয়—সে এল। মারিয়া ওর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে রাজার ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে নিপুণ হাতে পট্টি বেঁধে দিল। যে লোকটি পট্টি বাঁধে সে হেসে বলল—আপনি আমার চেয়ে ভালো পারেন। মারিয়া হেসে বলল—এসব ছোটবেলায় মা আমাকে শিখিয়েছেন। মা আমাকে ছোট্ট খাটো জ্বর সর্দি ব্যথার ওষুধও শিখিয়েছেন। রাজাও খুশি হলেন। মারিয়ার ব্যান্ডেজ বাঁধায় অনেকটা আরাম পেলেন। বললেন—তুমিই আমার পট্টি বেঁধে দেবে প্রত্যেকদিন।

এটা মারিয়ার প্রতিদিনের কাজ হল। মারিয়া মোটেই বিরক্ত হল না। ও সাগ্রহেই কাজটা করতে লাগল। ফ্রান্সিসের মুক্তির কথা মারিয়া আর বলে নি।

রাজা নিজে থেকেই ফ্রান্সিসদের মুক্তি দেবে তার জন্যেই মারিয়া অপেক্ষা করতে লাগল।

মারিয়া সারাদিনে দুবেলা ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরের সামনে আসে। মারিয়ার শরীর ভালো আছে জেনে ফ্রান্সিস খুশি হয়। দুজনে কয়েদঘরের দরজার কাছে

কথাবার্তা বলে। এ সময় পাহারাদাররা কিছুটা সরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া কথা বলে। মারিয়া বলে তোমরা কেমন আছো?

—কয়েদঘরে বন্দীরা যেমন থাকে—তেমনি আছি। অখাদ্য খাবার, হাত ছড়িয়ে শোবার উপায় নেই। অতিরিক্ত গরম ঘাম জলতেষ্টা এসব নিয়ে ভালোই আছি। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলে—আর আমি পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছি নানা সুস্বাদু খাবার খাচ্ছি।

—যাকগে আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। সময় সুযোগমত ঠিক পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা বলেছে—সেনাপতি সব খোঁজখবর নিচ্ছে তোমাদের ব্যাপারে। তোমরা বিশেষ করে আলখাতিবকে সেনাপতি গুপ্তচর প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—তাই সব ভোগান্তি ভুগছি আমরা। ফ্রান্সিস বলল।

—বলছিলাম—রাজাকে কি আবার তোমাদের মুক্তি দেবার কথা বলবো? মারিয়া বলল।

—কোন লাভ নেই। আগে তো একবার বলেছো। কোন লাভ হয়নি। ছেড়ে দাও—যা হবার হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া এবার হ্যারি শাঙ্কোদের ডেকে কথা বলে। তারপর চলে আসে।

সেদিন মধ্যরাত। আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল। ক্যামেরিনালের জাহাজঘাট জনশূন্য। ছ'সাতটা জাহাজ কম করে নোঙর করে আছে। জাহাজগুলোয় কাচঢাকা আলো জ্বলছে। সমুদ্রের জল ঝলাৎ ঝলাৎ শব্দে তীরভূমিতে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্রের জলের ওপর এখানে ওখানে নীল কুয়াশার জটলা।

কুয়াশার জটলার মধ্যে দিয়ে দুটো যুদ্ধজাহাজ আস্তে আস্তে তীরে এসে ভিড়লো। যুদ্ধজাহাজ দুটো রাজা ফার্নান্দোর। দুটো পাটাতন ফেলা হল। একটা পাটাতন পাশে হাত পাঁচেক। অন্যটা সাধারণ মাপের। বোঝা গেল মোটা পাটাতন দিয়ে ঘোড়া নামানো হবে।

প্রথমে একটা ধবধবে সাদা ঘোড়া নামানো হল। রাজা ফার্নান্দো জাহাজ থেকে বেরিয়ে এলো। পাটাতন দিয়ে হেঁটে তীরে উঠলেন। পেছনে সেনাপতি।

এবার সশস্ত্র সৈন্যরা পাটাতন দিয়ে হেঁটে পার হয়ে তীরের ওপরের রাস্তায় এসে সারিবদ্ধ বেঁধে দাঁড়াল।

সাদা ঘোড়াটাকে তীরের পরেই উঁচু রাস্তাটায় এলেন দাঁড় করিয়ে রাখা হল। রাজা ফার্নান্দো সেখানে এলেন শাদা ঘোড়াটায় উঠলেন।

চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু জলে ঢেউয়ের শব্দ আর শন্ শন্ বাতাসের শব্দ।

আরো দুটো ঘোড়া নামানো হল। সে ঘোড়া দুটোয় চড়ল সেনাপতি আর একজন রাজার দেহরক্ষী।

রাজা তরোয়াল উঁচিয়ে আক্রমণের ইঙ্গিত করল। সব সৈন্য আস্তে আস্তে খাপ

থেকে তরোয়াল খুলল যাতে কোনরকম শব্দ না হয়।

রাজা উত্তর মুখে ঘোড়া আস্তে আস্তে চালালেন। সৈন্যরাও পেছনে পেছনে চলল। এত সৈন্যের চলা। একটু শব্দ হল।

রাজা রিকার্ডো সৈন্যদের সৈন্যাবাসে পৌঁছতে দেরি হল না। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

হঠাৎ রাজা ফার্নান্দো তরোয়াল তুলে সৈন্যাবাস দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে তার সৈন্যবাহিনী রাজা রিকার্ডোর সৈন্যদের আবাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের হৈ হৈ চিৎকারে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা ঘুম থেকে উঠে পড়ল। দেখল রাজা ফার্নান্দোর সশস্ত্র সৈন্যরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। পালাবার পথ নেই। দু-একজন পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফার্নান্দোর সৈন্যদের হাতে মারা পড়ল।

এবার শুরু হল একপেশে লড়াই। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা মারা পড়তে লাগল শুরু হল চিৎকার আর্তনাদ গোঙানি মৃত্যু। অস্ত্রহীন রাজা রিকার্ডোর সৈন্যর পালাতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা জেগে উঠেছে। সবাই কয়েদঘরের লোহার দরজার সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। অল্প আলোয় দেখল রাজা ফার্নান্দোর সশস্ত্র সৈন্যর নিরস্ত্র। নিরস্ত্র রাজা রিকার্ডোর সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা নিরস্ত্র। তারা মরতে লাগল।

কয়েদঘরের পাহারাদার সৈন্যদের ওপর রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা লড়াই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাহারাদার তিনজন সশস্ত্র। ওরা লড়াই চালাল। কিন্তু পারল না। দুজন ওখানেই মারা গেল। অন্য পাহারাদারটি গুরুতর জখম হয়ে কয়েদঘরের দরজার সামনে গড়িয়ে পড়ল। সেই পাহারাদারের কোমরেই গোঁজা আছে চাবির বড় রিংটা। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। কয়েদঘরের দরজার দুপাশে মশাল জ্বলছিল তারই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল আহত পাহারাদারটি পাথরের বারান্দায় পড়ে আছে। ফ্রান্সিস লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়াল। আহত পাহারাদারের বুক পর্যন্ত হাত গেল। কিন্তু চাবির বড় রিংটা কোমরে গোঁজা। ফ্রান্সিস মেঝেয় শুয়ে পড়ল তারপর পা বাড়াল পাহারাদারের কোমরে গোঁজা চাবির রিংএর দিকে। আস্তে আস্তে ডানপাটা বাড়াতে বাড়াতে চাবির রিংএর কাছে আনল। বুকে পায়ের বুড়ো আঙুলটা রিংএর মধ্যে গলিয়ে জোরে টান দিল। চাবির রিংটা ঝাঁকুনি খেয়ে সরে এল। কিন্তু পড়ে গেল না। ফ্রান্সিস তখন হাঁপাচ্ছে। ওদের সকলের মুক্তি নির্ভর করছে ঐ চাবির রিংএর ওপর। ফ্রান্সিস আবার পা বাড়াল। আবার রিংএর মধ্যে পা ঢুকিয়ে ঝাঁকুনি দিল। চাবির রিংটা কোমর থেকে খসে পাথুরে বারান্দায় পড়ে গেল। ঝং করে শব্দ হল। কিন্তু সৈন্যরা লড়াইয়ে ব্যস্ত। শব্দটা কারো কানে গেল না।

ফ্রান্সিস পা দিয়ে টেনে টেনে চাবির রিংটা কয়েদঘরের দরজার কাছে আনল তারপর হাত দিয়ে টেনে কাছে আনল। হাত বাড়িয়ে কয়েদঘরের চাবিটা খুঁজতে

লাগল। কিন্তু বারান্দার মশালের আলোয় দেখেও বুঝল না কোনটা কয়েদঘরের চাবি। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমাকে রিংটা দাও। ফ্রান্সিস রিংটা হ্যারির দিকে সরিয়ে দিল। হ্যারি খুব মনোযোগ দিয়ে চাবিগুলো একটা একটা করে সরিয়ে সরিয়ে চাবি খুঁজতে লাগল। মশালের আলোয় দেখল একটা লম্বা চাবি বেশ পরিষ্কার। বাকি চাবিগুলো কেমন ময়লা। কোন কোনটা আবার জংধরা। হ্যারি চাবিটা এগিয়ে আনল। বলল—ফ্রান্সিস—এই চাবি দেখো—কেমন পরিষ্কার। তার মানে এই চাবিটা নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। তাই ময়লা জমে নি। এটাই কয়েদঘরের তালার চাবি। ফ্রান্সিস চাবিটা নিল। কয়েদঘরের দরজাটা ফাঁক ফাঁক লোহার গরাদ দিয়ে তৈরি।

ফ্রান্সিস চাবিটা নিয়ে দরজার তালার কাছে এল। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে চাবিটা তালার মধ্যে ঢোকাল। একটু চাপ দিয়ে জোরে মোচড় দিতেই তালাটা শব্দ করে খুলে গেল। ভাইকিংরা মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

সবাই কয়েদঘরের বাইরে চলে এল। আগে যারা বন্দী ছিল তারা কয়েদঘর থেকে বেরিয়েই এদিক ওদিক ছুটে পালাল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—ভাইসব, তোমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাও। আমি মারিয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, তুমি জানো না রাজকুমারী এখন কোথায়?

—না, জানি না। তবে খুঁজে বের করতে হবে। লড়াইর শেষে ফার্নান্দোর সৈন্যরা নিশ্চয়ই রিকার্ডোর প্রাসাদ লুঠ করবে। তার আগেই আমি মারিয়াকে নিয়ে পালিয়ে জাহাজে যাবো।

—বেশ। তাই করো। আমরা জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—দল বেঁধে যেও না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাও। বোঝাই যাচ্ছে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা হেরে গেছে। এখন রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা বিশ্রাম করবে। এই সুযোগে পালাও। রাজা ফার্নান্দোর হাতে ধরা পড়লে বলবে রাজা রিকার্ডো আমাদের কয়েদঘরে বন্দী করে রেখেছিল। মুক্তি পেয়ে আমরা এখন আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংরা সামনের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর চলল জাহাজঘাটের দিকে।

ফ্রান্সিস চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। ফ্রান্সিস প্রান্তরে নামল। চারপাশে তাকিয়ে দেখল পূবদিকে কিছু সৈন্য চলাফেরা করছে।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদিকে ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুতপায়ে চলল রাজা রিকার্ডোর প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের কাছে এসে ফ্রান্সিস প্রাসাদের সিংহদ্বারের দিকে গেল না। দূর থেকে দেখল সিংহদ্বারের সম্মুখে রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি আর রাজার দেহরক্ষী দুটো ঘোড়ায় চড়ে সিংহদ্বার পারাহা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস পেছনের দরজার দিকে গেল। রাজা রিকার্ডো পালালে পেছনের দরজা দিয়েই পালাবে।

ফ্রান্সিস পেছনের দরজার কাছাকাছি আসতেই দেখল দরজা খুলে গেল রাজবাড়ির গাড়ি বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস সমস্যায় পড়ল। মারিয়া কি এই গাড়িতেই আছে? ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল কী করবে এখন?

গাড়িটার দরজা জানালা বন্ধ। ফ্রান্সিস স্থির করল এই গাড়িটাই ধরতে হবে। ও গাড়িটার পেছনে পেছনে ছুটল। ততক্ষণে রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি আর দেহরক্ষী গাড়িটা দেখতে পেয়েছে। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে এল। ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে দেহরক্ষীর ঘোড়ার রেকাবে রাখা বাঁপাটা ধরে মুচড়ে দিল। দেহরক্ষী ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস এবার পা ধরে প্রাণপণে হ্যাঁচ্‌কা টান দিল। দেহরক্ষী হুড়মুড় করে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। পায়ের ব্যথায় কোঁকাতে লাগল। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। ঘোড়া চালাল রাজা রিকার্ডোর গাড়ির পেছনে।

ফ্রান্সিসের সামনে ঘোড়ায় ছুটে চলেছে সেনাপতি। তার পেছনে ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। সেনাপতির হাতে খোলা তরোয়াল। বুকে বর্ম। মাথায় শিরস্ত্রাণ। ফ্রান্সিস নিরস্ত্র। শুধু নিরস্ত্র নয়। কয়েদঘরে কিছুদিন কাটিয়ে আর ঐ অখাদ্য খাবার খেয়ে শরীরও দুর্বল।

ফ্রান্সিস দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতির চলন্ত ঘোড়ার পাশে এল। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। এবার ফ্রান্সিস সেনাপতিকে ছাড়িয়ে গাড়িটার কাছে এল। তখনও ফ্রান্সিসের মনে দ্বন্দ্ব। মারিয়া কি এই গাড়িতে আছে না প্রাসাদেই রয়ে গেছে।

চলন্ত গাড়ির পাশে এল ফ্রান্সিস। গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। ফ্রান্সিস হাঁপাচ্ছে তখন। গলা চড়িয়ে ডাকল—মারিয়া। গাড়ির ভেতর থেকে মারিয়াও গলা চড়িয়ে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের মুখে হাসি ছুটল। ওর আন্দাজই ঠিক। ফ্রান্সিস মনে অনেক জোর পেল। যাক্—মারিয়া সুস্থ আছে। এতক্ষণে রিকার্ডোর প্রাসাদ নিশ্চয়ই আক্রান্ত হয়েছে। অন্তঃপুরেও লুঠ চলছে। মারিয়া ওখানে থাকলে বেঁচে থাকতো কিনা সন্দেহ।

ফ্রান্সিস পিছিয়ে এল। সেনাপতিকে তাড়াতে হবে। সেনাপতির কাছে এসে ঘোড়া চালাতে লাগল। দেখল সেনাপতি তরোয়াল কোষে ধরে রেখেছে। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চাবুকটা বের করেছে। ফ্রান্সিস কাছাকাছি আসতেই সেনাপতি চাবুক হাঁকাল। ফ্রান্সিসের পিঠে চাবুকের মার লাগল। পিঠটা জ্বালা করে উঠল। সেনাপতি আবার চাবুক চালাল। এবার চাবুকের মারটা লাগল গলার কাছে। গলার কাছে জ্বালা কর উঠল। চাবুকের পরের মারটা ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল না। কারণ ফ্রান্সিস তখন অনেকটা সরে গেছে। সেনাপতি ডান হাতে চাবুক ঘোরাতে লাগল। আবার চাবুক হাঁকল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে চাবুকটা ধরে ফেলল। তারপর সেনাপতি কিছু বোঝার আগেই চাবুকটা চেপে ধরে শরীরের সব শক্তি নিয়ে মারল হ্যাঁচ্‌কা টান। সেনাপতি ঘোড়ার পিঠে টাল খেল। ফ্রান্সিস আবার সজোরে মারল টান।

সেনাপতি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

রাজা রিকার্ডোর গাড়ির পাশে এল।

তখনই ফ্রান্সিস দেখল একদল সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল ফার্নান্দোর সৈন্য ওরা। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যাবাসের ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া জোগাড় করেছে। তারপর ঘোড়া চালিয়ে রাজা রিকার্ডোকে ধরতে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল গাড়ির গতি বাড়াতে না পারলে ধরা পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে কোচম্যানকে ইঙ্গিতে নেমে আসতে বলল। কোচম্যান চলন্ত গাড়ি থেকে এখানে ওখানে পা রেখে নেমে আসতে ফ্রান্সিস তাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। নিজে গাড়ির পাদানিতে পা রেখে তারপর কোচম্যানের মত কয়েকটা জায়গায় পা ফেলে ফেলে কোচম্যানের আসনের কাছে এল। আসনে বসেই কোচম্যানের রেখে যাওয়া চাবুকটা ধরল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসের গাড়ির গতি কমে গেছে। ফ্রান্সিস ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক মেরে বলে উঠল— তুমি ভাই যেভাবে পারো পালাও, কোচম্যান বাঁদিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল। তারপর প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল।

ফ্রান্সিস একবার পেছন দিকে তাকাল। দেখল ফার্নান্দোর সৈন্যরা ছুটে আসছে। ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। তখনই দেখল সৈন্যদের আগে রাজা ফার্নান্দো নিজে ঘোড়া চালাচ্ছে। ফ্রান্সিস স্থির করল ধরা দেবে না।

ফ্রান্সিস কোচম্যানের পাদানির ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক মেরে চলল। গাড়ির গতি বাড়ল। একটু পরেই দেখল— নিজেদের গাড়িটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আবার চাবুক মারতে লাগল। গাড়িটা আরো এগিয়ে গেল। ফার্নান্দো বেশ পেছনে পড়ে গেছে।

তখনই ডানদিকে একটা টিলামত দেখা গেল। টিলাটার মাথা ন্যাড়া। টিলার নিচে ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট জংলা গাছ। তারপরেই উঁচু উঁচু গাছ টিলার তলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফ্রান্সিস দ্রুত গাড়ি ডানদিকে ঘোরাল। ছোট ছোট গাছপালার ওপর দিয়ে গাড়ি চলল। বড় বড় গাছগুলো আসতেই ফ্রান্সিস গাড়ি থামাল। তারপর সন্তর্পণে গাড়ি চালিয়ে কয়েকটা বড় গাছের আড়ালে এসে গাড়ি থামাল।

কোচওয়ানের জায়গা থেকে নেমে এল। গাড়ির বন্ধ জানালার কাছে এসে গলা চড়িয়ে বলল—মানবের রাজা—রাজা ফার্নান্দো কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। আমি গাড়িটা একটা উঁচু টিলার আড়ালে এক জঙ্গলে এনেছি। মনে হয় ওদের দৃষ্টি এড়াতে পারবো। রাজা একটু ভগ্ন গলায় বলল—গাড়ি চালিয়ে ওদের নাগাল থেকে পালানো যায় না।

ফ্রান্সিস বলল—না। আমাদের গাড়ির ঘোড়া দুটো খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওরা তো শুধু ঘোড়া চালিয়ে আসছে। আমাদের ঘোড়া দুটোকে একটা গাড়ি আর

আরোহীদের টেনে আনতে হয়েছে।

—হুঁ। মনে হয় আমরা ওদের হাত থেকে পালাতে পারবো না। রাজা বললেন।

—সেইজন্যেই এইভাবে আড়াল নিয়ে এড়াবার চেষ্টা করলাম। এখন দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে রাজা ফার্নান্দো আর পাঁচজন সৈন্য টিলার কাছে এল। সম্মুখে তাকিয়ে দেখল পাথর ছড়ানো রাস্তা সোজা চলে গেছে। রাজা রিকার্ডোর গাড়িটা বেপাত্তা।

ফার্নান্দো ঘোড়া থামালেন। সৈন্যরাও ঘোড়া থামাল। ফার্নান্দো বললেন—এভাবে একটা গাড়ি আরোহীসমেত শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে না। ওরা এখানে কোথাও গাড়িসুদ্ধু নিজেরাও গা ঢাকা দিয়েছে। টিলার ওপাশটা খোঁজ।

সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নামল। চলল টিলার পেছন দিকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁজল। টিলাটার ঠিক নিচেই ঘন বনটায় ঢুকতে পারল না। এত ঘন জঙ্গল। ওরা ফিরে এল। রাজাকে এসে বলল সব।

এবার রাজা ফার্নান্দো ঘোড়া থেকে নামলেন। তরোয়াল বের করলেন। তরোয়ালটা উঁচিয়ে ধরে প্রথমে ছোট ছোট গাছের ডালপালা কেটে কেটে এগিয়ে গেলেন টিলাটার নিচের জঙ্গলের দিকে। পেছনে পাঁচজন সৈন্য। বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাণ্ড ডালপালা সব মিলিয়ে বেশ ঘন বন।

আর ঢোকা গেল না। রাজা ফার্নান্দো তবু ঐ জায়গারই আশেপাশে খুঁজতে লাগলেন।

তখনই হঠাৎ ঘোড়ার মৃদু ডাক শোনা গেল। রাজা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কান পেতে রইল। আবার ঘোড়ার ডাক। আগের চেয়ে একটু জোরে। বাঁদিক থেকে ডাক শোনা গেল।

রাজা ফার্নান্দো সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তরোয়াল লতাপাতা ডাল কাটার জন্যে খোলাই ছিল। খোলা তরোয়াল নিয়ে ফার্নান্দো ঘোড়ার ডাকের দিক স্থির করে চলল। সৈন্য পাঁচজনও চলল। ফার্নান্দো সাবধান হলেও পায়ের নিচে শুক্‌নো ডালপাতা ভাঙার শব্দ হতে লাগল।

হঠাৎ গাড়ি চলার শব্দ হল। ফার্নান্দো চিৎকার করে বললেন—গাড়ি আটকাও। ফার্নান্দোর সঙ্গে পাঁচজন সৈন্যও ছুটল।

একটু এগোতেই দেখল গাড়িটা জোরে চালাবার চেষ্টা করছে কোচওয়ান। সৈন্যরা ছুটে গিয়ে গাড়ির চাকা ধরে দেখল। গাড়ি থেমে গেল।

রাজা ফার্নান্দো এগিয়ে গেলেন। গাড়ির দরজা খোলার ইঙ্গিত করলেন। একজন সৈন্য ছুটে গিয়ে গাড়ির জানালা খুলতে চেষ্টা করল। পারল না। সঙ্গী সৈন্য দুজন এগিয়ে এল। তার মানে ওরা জানালা ভেঙে ফেলবে।

ফ্রান্সিস কোচওয়ানের আসন থেকে নিচে নেমে এল। বলল—জানালা ভাঙবেন

না। আমি খোলবার ব্যবস্থা করছি। সৈন্য তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস বন্ধ জানালার গায়ে মুখ নিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা ধরা পড়ে গেছি। একটা ঘোড়া ডেকে উঠেছিল বলে। যাকগে—রাজা ফার্নান্দো সামনেই কয়েকজন সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা ধরা পড়ে গেছি। আপনারা জানালা খুলে দিন।

একটু পরেই জানালা খুলে গেল। দেখা গেল রাজা রিকার্ডো রাণি রাজকুমারী আর মারিয়া গাড়িতে বসে আছে।

রাজা ফার্নান্দো গাড়ির জানালার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন—রিকার্ডো—আজকে তোর নিস্তার নেই। নেমে আয়। শুধু দুজনের লড়াই। দেখা যাক কে বাঁচে কে মরে। রিকার্ডো দুর্বলকণ্ঠে বললেন—আমি আহত। আমাকে সুস্থ হতে দে। তারপর যেখানে খুশি আমাকে ডাকলেই একা লড়তে যাবো।

—না—না। আজকেই ফয়েসলা হবে। ফার্নান্দো খোলা তরোয়াল ঘুরিয়ে বললেন—বাইরে আয়।

রাণী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। মারিয়া রাজকুমারীকে কোলে বসান। রাজা রিকার্ডো আস্তে আস্তে উঠলেন। গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

রাজা রিকার্ডোর মাথায় মুকুট নেই। কাঁচাপাকা লম্বা লম্বা চুল কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথার পেছনের লম্বা চুল নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। চোখ দুটো লালচে। ঘুমুতে পারেন নি বলে অথবা কেঁদেছেন—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে।

রাজা ফার্নান্দো চেয়ে চেয়ে দেখলেন। পট্টি বাঁধা জায়গাটা দেখলেন। তারপর বললেন তরোয়াল বের কর। আজ দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। রিকার্ডো আস্তে আস্তে কোমরের খাপ থেকে তরোয়াল বের করলেন।

রাজা ফার্নান্দো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রিকার্ডো কোনরকমে মারটা ঠেকালেন তরোয়াল দিয়ে।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ছুটে এসে দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান। ফার্নান্দো একটু অবাকই হলেন। বললেন—দ্বন্দ্বযুদ্ধ হচ্ছে। তুমি সরে যাও। ফ্রান্সিস ফার্নান্দোকে আস্তে আস্তে বলল—মান্যবর রাজা—এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা এখানে উপস্থিত সবাই জানে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ বলে নিজের মনকে আপনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন। একে সুযোগ বুঝে হত্যা করা বলা যায়। যে মানুষটা তরোয়াল পর্যন্ত তুলতে পারছেন না আপনি তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছেন। এটা অমানবিক।

—তুমি সরে যাও। দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলবে। ফার্নান্দো বললেন।

—হ্যাঁ দ্বন্দ্বযুদ্ধই চলবে। তবে রাজা ফার্নান্দোর জায়গায় লড়বো আমি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফার্নান্দো হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন—তার আগে আমার দেহরক্ষীদের সঙ্গে লড়ো। তারপর আমার সঙ্গে লড়বে।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—আমার দেহরক্ষীরা কিন্তু সাধারণ সৈন্য নয়। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারাই আমার দেহরক্ষী হয়। রাজা ফার্নান্দো বললেন।

—পরোয়া নেই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

তখনই মারিয়া চিৎকার করে ডাকল—ফ্রান্সিস—শান্ত হও।

—উপায় নেই মারিয়া। একজন আহত মানুষকে খুন করা চোখে দেখি কী করে। ভেবো না—আমি জয়ী হবোই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের চারপাশে পাঁচজন দেহরক্ষী খোলা তরোয়াল নিয়ে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস রিকার্ডোকে গিয়ে বলল—

—মান্যবর—আপনার তরোয়ালটা দিন।

—কিন্তু তুমি আমার জন্যে—

—হ্যাঁ—আপনার জন্যেই লড়বো।

রাজা রিকার্ডো তরোবারিটা ফ্রান্সিসকে দিলেন। কিছু বললেন না। মাথা ঝুঁকিয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক নাড়লেন।

ফ্রান্সিস তরোয়ালটা নিয়ে একটুক্ষণ চোখ বুঁজে রইল। তারপর চোখ খুলে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের তখন অন্য চেহারা। রুখে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের সে এক রুদ্রমূর্তি।

শুরু হল তরোয়ালের যুদ্ধ। ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে ঘুরে ঘুরে দেহরক্ষীদের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চালাল। একজন দেহরক্ষী সুযোগ বুঝে ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। সরে আসতে গিয়েও তরোয়ালটা ফ্রান্সিসের বুকের ওপর দিয়ে ঘেঁষ্টে গেল। জামা কেটে গেল। শরীরেও কেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল। জামা খোলা। ফ্রান্সিস মুহূর্তে সেই দেহরক্ষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রক্ত দেখে ফ্রান্সিসের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। প্রচণ্ড জোরে তরোয়াল চালাল। দেহরক্ষীর ঘাড়ের ওপর পড়ল সেই মার। দেহরক্ষী উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

এবার দুজন দেহরক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তৈরি ছিল।

দ্রুত হাতে তরোয়াল চালাল। একজনের হাত কেটে গেল। ও বসে পড়ল হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ে গেল। অন্যজনের পিঠে তরোয়াল গভীরভাবে বসে গেল। সে উবু হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রাজা ফার্নান্দো গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন থামো।

ফ্রান্সিস তরোয়াল নামাল। বাকি দুজন দেহরক্ষী ভীতমুখে সরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

ফার্নান্দো তরোয়াল কোষবদ্ধ করলেন। গলা চড়িয়ে বললেন—আমার সিদ্ধান্ত আমি জানাচ্ছি।

রিকার্ডোকে সেভিল নিয়ে যাবো। একটা কয়েদঘরে সারা জীবনের জন্য বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

—আর রাণি ও রাজকুমার? ফ্রান্সিস বলল।

—তারা এখানকার প্রাসাদে থাকবে। তাদের সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই। ফার্নান্দো বললেন।

রাণিমা গলা চড়িয়ে বললেন—আমি রাজপ্রাসাদে থাকবো না। ছেলেকে নিয়ে আমি স্বামীর সঙ্গে থাকবো। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন।

রাজা ফার্নান্দো দুহাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গি করলেন। বললেন, ঠিক আছে আপনি যা চান তাই হবে। আপনারা এখন প্রাসাদে ফিরে যান। কালকে সেভিলে ফিরে যাবার সময় রিকার্ডোকে নিয়ে যাবো।

রাণিমা বললেন, আমরাও যাবো।

—বেশ যাবেন। তারপর দুই আহত দেহরক্ষীকে বললেন তোমরা এখানকার কৃষকদের বাড়িতে যাও। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি জোগাড় করো। আহতদের নিয়ে ক্যামেরিনালে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

রাজা ফার্নান্দো ধরধবে সাদা ঘোড়াটার রেকাবে পা রেখে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়লেন। তারপর ঘোড়া ছোটালেন ক্যামেরিনালের দিকে।

রাজা রিকার্ডো আস্তে আস্তে রাজবাড়ির গাড়িতে উঠলেন। রাণি কোন কথা বললেন না, বার বার চোখ মুছলেন, মারিয়া রাজকুমারকে জড়িয়ে ধরে রইল।

ফ্রান্সিস কোচওয়ানের জায়গায় উঠে বসল। তারপর ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক মারল। ঘোড়া দুটো ছুটল। গাড়ি কিছুটা দ্রুতই চলল। ওর গাড়ি চালানো দেখে রাজা রিকার্ডো বললেন ফ্রান্সিস বোধহয় একসময় কোচওয়ানের কাজ করেছে। ফ্রান্সিস এবার ঘোড়াদুটোর এপাশে ওপাশে চাবুক হাঁকড়ালো। গাড়িটা আরো দ্রুতগতিতে ছুটল।

একসময় ফ্রান্সিস দেখল একজন অশ্বারোহী ওদের গাড়ির দিকে ছুটে আসছে। কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিস চিনল—এই গাড়ির কোচওয়ান। ফ্রান্সিস হেসে গলা চড়িয়ে বলল, —তাহলে বেঁচে আছো। কোচওয়ান হেসে বলল—হ্যাঁ। গোড়া নিয়ে একটা তুলাক্ষেতে ঢুকে পড়েছিলাম। যাব তো—রাজারাণি কেমন আছেন?

—ভালো। তবে আর বোধহয় ভালো থাকতে পারবেন না। রাজা ফার্নান্দো রাজা রিকার্ডোকে সেভিলে নিয়ে গিয়ে চিরদিনের জন্য কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে বলেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলেন কি? কোচওয়ান বলল।

—হ্যাঁ-এটাই রাজা ফার্নান্দোর পরিকল্পনা। যাকগে সবই শুনবে জানবে। এখন ভাই তুমি কিছুক্ষণ গাড়ি চালাও। গাড়িতে গিয়ে উঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবো। বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ফ্রান্সিস গাড়ির গতি কমাল। কোচওয়ান ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াটার গলার সাজে একটা দড়ির মুখ বাঁধল। তারপর দড়ির অন্য মুখটা গাড়ির পেছনে বাঁধল। ঘোড়াটা গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কোচওয়ান গাড়িটা উঠল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে নেমে পাদানিতে পা রেখেছে।

গাড়ির দরজায় টোকা দিয়ে ঢাকল মারিয়া। গাড়ির ভিতর থেকে মারিয়া বলল—বলো। দরজা খোল। আমি গাড়ির ভেতরে বসবো। খুব ক্লান্ত আমি। ফ্রান্সিস বলল।

গাড়ির দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস ভেতরে ঢুকে মারিয়ার পাশে বসল। দেখল রাজা রিকার্ডো গম্ভীর মুখে বসে আছেন। চোখ দুটো লাল। বোঝা গেল—উনি কেঁদেছেন। রাণি তো কেঁদে কেঁদেই চলেছেন। কিশোর রাজকুমার কিছুই বুঝতে পারছে না—এখন কী করবে। ছোট রাজকুমার মারিয়ার গা ঘেঁষে বসে আছে। মারিয়া মাঝে মাঝে ওর কপালে গালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—মাননীয় রাজা—এখন আর গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ রেখে কী হবে? জানালা খুলে দেব?

—দাও। রাজা রিকার্ডোর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মারিয়া জানালাগুলো খুলে দিল। একটা শীতার্ত হাওয়া ছুটে এল। গাড়ির মধ্যে আর গুমট ভাবটা রইল না।

—মহামান্য রাজা—এখন আপনি কী করবেন? ফ্রান্সিস বলল? রাজা রিকার্ডো একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন তাঁকে ও রাণীকে দেখা লোকজন ছুটে আসছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। বললেন—আমার ছোট ভাই ফার্নান্দো তো আমার ভাগ্য নির্ধারণ করে গেছে। আমাকে —আর মাননীয় রাণি রাজকুমার? রাণি বলে উঠলেন—আমরাও রাজার সঙ্গে ঐ বন্দীশালায় থাকবো। যতদিন বাঁচবো ততদিন।

রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত পাথর বাঁধানো চত্বরে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

রাজা রাণি রাজকুমার নামল। রাজাপ্রাসাদের কয়েকজন পরিচায়ক এগিয়ে এল। রাজা রিকার্ডো কোনদিকে না তাকিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। নিজের শয়ন কক্ষে গিয়ে বিছানায় বসলেন। বাঁ হাড়ের কাটা জায়গাটার ব্যথা আরও বেড়েছে। কিন্তু তিনি রাজ্যবদ্যিকে ডেকে পাঠালেন না। ব্যথা বেদনা সহ্য করতে লাগলেন।

রাণি রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের শয়নকক্ষের দিকে যাচ্ছেন তখনই সব পরিচারিকারা দল বেঁধে এল। ওরা বলল—রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা তাদের এখানকার ঘরগুলোতে বন্দী করে রেখেছিলেন। দিন তিনেক তাদের শুধু জল খেতে দেওয়া হয়েছিল। তিন দিন ওরা না স্নান না খাওয়া। ওদের ঘর থেকে বেরোবার হুকুম ছিল না।

তিন দিন পর ওদের ওপর শাসন একটু শিথিল হল।

পরিচারিকাদের স্নান করতে দেওয়া হয় খেতে দেওয়া হয়। তিন দিনের বন্দী দশা থেকে ওরা মুক্তি পায়। রাজা রাণি আর রাজকুমারকে ফিরে পেয়ে রাজ-প্রাসাদের পরিচারক পরিচারিকারা খুব খুশি। আনন্দে তারা প্রায় নাচানাচি শুরু করল। কিন্তু যখন শুনল রাজাকে রাজা ফার্নান্দো সেভিলে নিয়ে গিয়ে চিরজীবনের জন্যে বন্দী করে রাখবে তখন তাদের কষ্টে বুক ভেঙ্গে গেল। সেই বন্দীশালায় রাণি ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে থাকবেন এটাও তারা শুনল। ওরা ভেবেছিল রাজা রাণি

রাজকুমার ফিরে এলেন। ওরা সেই উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করবে। এখন এসব জেনে ওরা মনমরা হয়ে গেল।

ওদিকে রাজা ফার্নান্দোর হুকুমে সেনাপতিসহ সব সৈন্যরা প্রান্তরে সমবেত হল।

রাজা ফার্নান্দো এলেন। পরণে যুদ্ধের পোশাক নয়। ঢোলা হাতা গভীর রঙের আলখাল্লা মত। গলায় ঝুলছে মুক্তোর মালা। আর কোন অলঙ্কার নেই।

সৈন্যরা তাঁকে দেখে তাঁর নামে জয়ধ্বনি করল। রাজা ফার্নান্দো ডালা চড়িয়ে বলতে লাগলেন—আমার দেশপ্রেমিক সৈনিকরা—যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। এখন তোমাদের যা করণীয় তা বলছি। আমি কাল সকালে রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে যাব। একটা যুদ্ধজাহাজ আমার সঙ্গে যাবে। তাতে অর্ধেক সৈন্যদল যাবে। বাকিরা এখানে থাকবে। আমি চলে গেলে আমাদের সেনাপতির হাতে আমার সব ক্ষমতা দিয়ে যাবো। সেনাপতিই আমার প্রতিনিধিরূপে এখানে রাজত্ব করবে। তোমরা তার হুকুম মেনে চলবে। রিকার্ডোর আহত সৈন্যদের এখানকার সৈন্যাবাসে রাখা হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। বাকিরা তিনটি কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। এখন না পরে ভেবে দেখছি তাদের নিয়ে কী করা যায়। রাজা ফার্নান্দো থামলেন। তারপরে আবার বলতে লাগলেন—গুপ্তচরেরা খবর এনেছে মালাগার শাসনকর্তা ডিসিলভা এই ক্যামেরিনাল আক্রমণ করার জন্যে সৈন্য বাহিনীকে তৈরি করছেন। কাজেই আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। একটু থেমে বলতে লাগলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে শৌখিন জাহাজটা ফিরে আসবে। রিকার্ডোকে বন্দী করে সেভিল নিয়ে যাবে। সেখানে তাঁকে কয়েদঘরে সারা জীবনের জন্যে বন্দী করে রাখা হবে। আজ যে আদেশগুলি দিয়ে গেলাম তাই তোমাদের পালন করতে হবে। রাজা ফার্নান্দো থামলেন। সৈন্যরা মুক্তকণ্ঠে রাজা ফার্নন্দোর জয়ধ্বনি দিল।

পরদিন সকালে জাহাজঘাটে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা জড় হল। সেনাপতি ঘোড়া চড়ে সব তদারকি করছে। সেনাপতি সৈন্যদের দুটো ভাগ করল। একদল ফার্নান্দোর সঙ্গে সেভিল ফিরে যাবে। অন্যদল এখানে থাকবে।

একটু বেলা হতে রাজা ফার্নান্দো ঘোড়ায় চড়ে জাহাজঘাটে এলেন। সৈন্যরা তার জয়ধ্বনি করল। রাজা ফার্নান্দো হাত নেড়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করলেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে শৌখিন জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠলেন। যে সৈন্যরা সেভিল দিয়ে যাবে তারাও পাতা পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে যুদ্ধজাহাজটায় উঠল।

কিছুপরে দুটো জাহাজই যাত্রা শুরু করল। সেদিন জোরে বাতাস বইছিল। জাহাজদুটোর পালগুলো সেই হাওয়ায় দ্রুত চলল সমুদ্রের জলের মাথায় বিন্দুর মত হয়ে গেল। তারপরই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ফার্নান্দোর সৈন্যরা তখনও ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল। সেনাপতির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সৈন্যাবাসে ফিরে চলো। সৈন্যরা সারি বেঁধে দাঁড়াল। তারপর চলল সৈন্যাবাসের দিকে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখল। ফার্নান্দোর সৈন্যরা যখন সার বেঁধে ফিরে এল ওরাও তখন ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। ওখানেই একটা ঘরে ওরা আশ্রয় নিয়েছে।

পরদিন সকালেই দুজন সৈন্য নিয়ে সেনাপতি এসে হাজির। দরজায় ধাক্কা দিল সঙ্গী সৈন্যদের একজন চেঁচিয়ে বলল—এই বিদেশী ভূতেরা—দরজা খোল্।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দরজায় ধাক্কা দেওয়া চলল। শাঙ্কো উঠল। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলল। সেনাপতি আর সৈন্যরা হুড়মুড় করে ঢুকল। সেনাপতি বলল—চলো—তোমরা বন্দী। তোমাদের কয়েদঘরে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আর কতবার কয়েদঘরে ঢুকবো। আমরা যাবো না।

—তার মানে? সেনাপতি বলল।

—আমরা এখানেই থাকবো। শাঙ্কো বলল।

—এখন এখানে আমার কথাই আদেশ তা জানো? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। ফ্রান্সিস বলল—রাজা ফার্নান্দো আপনাকে এখানকার শাসনকর্তা করে গেছে। কিন্তু সেটা আপনাদের সৈন্যদের ওপরে এখানকার অধিবাসীদের ওপরে। আমরা বিদেশী। আমাদের ওপর আপনার হুকুম চলবে না।

—কী বললে? সেনাপতি চেঁচিয়ে বলল। তারপর সৈন্যদুজনের দিকে তাকিয়ে বলল—এদের কয়েদখানায় নিয়ে যাও।

সৈন্য দুজন এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস একজন সৈন্যের বর্মের চামড়ার ফিতে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। বর্ম মেঝেয় পড়ে গেল। সৈন্যটি অসহায়ভাবে সেনাপতির দিকে তাকাল। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—ঝামেলা বাড়িও না। চলো কয়েদখানায়। যা বলছে শোনো।

—বেশ—চলো। দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সেনাপতি চলল কয়েদখানার দিকে। প্রহরীরা দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকাল। সেনাপতি তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল।

ওদিকে রাজা রিকার্ডোর দিন কাটতে লাগল গভীর দুঃখে-বেদনায়। তাঁকে রাজপ্রাসাদে তাঁর ঘরেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। হাত বাঁধা নেই। তবু রিকার্ডোর মনে শান্তি নেই। কাঁধের ঘা খুবই কষ্ট দিয়েছে তাঁকে। এখন সুস্থ। কাটা ঘা সেরে গেছে।

রাজা রিকার্ডো বিছানায় চুপ করে বসে ভাবেন। ভাবেন আর ভাবেন। সেভিলে নিয়ে গেলে চিরজীবনের বন্দীদশা। এখানেই বা কম কি। তাঁর কাছে কারো আসার হুকুম নেই। এই হুকুম সেনাপতির। রিকার্ডো মুক্তির উপায় ভাবতে লাগলেন। উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় তলেদোবাসীরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। রাজা ফার্নান্দো হঠাৎই আক্রমণ করেছিল। তাই তিনি তলেদোদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি।

তাদের সাহায্য সহযোগিতা পেলে হয়তো আবার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু কিভাবে যোগাযোগ করবেন? এখন তো তিনি বন্দী। তাঁর কাছে কারো আসার হুকুম নেই। রাণি পর্যন্ত আসতে পারেন সারাজীবনে একবার। সেনাপতির কড়া হুকুম।

হঠাৎই মনে পড়ল ফ্রান্সিসের কথা। ঋজু দেহ। বলিষ্ঠ যুবক। ওর সাহায্য পেলে তলেদোদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। কিন্তু যুবকটি এখন কোথায়? রাজা রিকার্ডো এসব ভাবছেন তখনই রাণি ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় এসে বসলেন। রিকার্ডো বললেন— জানো একটা উপায়ের কথা ভাবছি। সফল হলে ফার্নান্দোর সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে আমি মুক্ত হতে পারবো।

—উপায়টা কী? রাণি বললেন।

—উত্তরদিকে তলেদো উপজাতিরা থাকে। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ওরা। ওদের নিয়ে যুদ্ধে নামতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। রাজা বললেন।

—কিন্তু তুমি তো বন্দী। ওদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবে? রাণি বললেন।

—একটি যুবক। ভাইকিং ওরা। আমাদের উদ্ধার করল। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওর নাম ফ্রান্সিস। ওদেশের রাজকুমারীই তো ফ্রান্সিসের স্ত্রী— মারিয়া। রাণি বললেন।

—তাই নাকি। তাহলে তো ভালোই হল। এই মারিয়াকে বলো ও যে ভাবেই হোক ফ্রান্সিসের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে। রাজা বললেন।

—আচ্ছা বলবো। রাণি বললেন।

নিজের শয্যাকক্ষে এসে রাণি একজন পরিচারিকাকে পাঠালেন মারিয়াকে ডেকে আনতে। কিছু পরে মারিয়া এল। রাণি রাজার সব কথা বললে। তারপর বলল— ফ্রান্সিস এখন কোথায় তুমি জানো?

—না। তবে ফ্রান্সিসকে আর কোথাও পাওয়া না গেলে বুঝতে হবে কয়েদঘরে আছে। মারিয়া বলল।

—তাহলে সেখানেই একবার খোঁজ কর। রাণি বললেন।

—দেখি। মারিয়া বলল।

—ফ্রান্সিসকে বলো আমাদের দেশে উত্তরদিকে তলেদো বলে একটা পাহাড়ি জায়গা আছে। তলেদোর অধিবাসীরা বীর যোদ্ধা। ওরা রাজা রিকার্ডোকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা গভীর রাতে আক্রমণ করেছিল। তখন আমাদের সৈন্যরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজা রিকার্ডো যদি তলেদোদের সংবাদ পাঠাবার সময় পেতেন তাহলে যুদ্ধের ফল অন্যরকম হত। আমরা জয়ী হতাম। থাকগে—মারিয়া, তুমি ফ্রান্সিসের খোঁজ খবর করো।

—দেখি চেষ্টা করে কোন খবর পাই কি না। মারিয়া বলল।

সকালের খাবার খেয়ে মারিয়া একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদের

বাইরে এল। চলল সৈন্যাবাসের দিকে। সৈন্যাবাসের সামনে আসতে একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—

—আপনারা এখানে কেন?

—কাজ আছে। মারিয়া বলল।

—কার সঙ্গে কাজ? প্রহরী বলল।

—সেনাপতির সঙ্গে। মারিয়া বলল।

—দাঁড়ান। সেনাপতিকে কী বলবো? প্রহরী বলল।

—বলবেন যে ভাইকিং দেশের রাজকুমারী দেখা করতে এসেছেন। মারিয়া বলল। প্রহরীটি একটা ছোট ঘরের দিকে চলল। ঘরটায় ঢুকল। একটু পরে বেরিয়ে এল। মারিয়াদের কাছে এসে বলল—আপনি যান।

মারিয়া ঘরটায় ঢুকল। দেখল রোগা সেনাপতি একটা কালো কাঠের বাঁকা পায়ের চেয়ারে বসে আছে। সামনে একটা পাথর বাঁধানো ছোট টেবিল। তাতে কিছু কাগজপত্র। ওপাশে একটা খালি চেয়ার। সেনাপতি ইঙ্গিতে বসতে বলল। মারিয়া চেয়ারটায় বসল। সেনাপতি বলল—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার এমন কিছু নয়। আমার স্বামী ফ্রান্সিস—সে এখন কোথায়? মারিয়া বলল।

—গুপ্তচরের যেখানে জায়গা হয়—কয়েদখানায়। সেনাপতি বলল।

—ফ্রান্সিস বা আমরা কেউ গুপ্তচর নই। যাকগে—ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। মারিয়া বলল।

—কেন? সেনাপতি বলল।

—আমাদের সোনার চাকতিগুলো আমাদের জাহাজের কোথায় আছে সেটা জানতে চাইব। ফ্রান্সিস ছাড়া আর কেউ এটা জানে না। মারিয়া বলল।

—হুঁ। সেনাপতি মাথা ওঠাল নামালো। তারপর বলল—এতে আমার আপত্তি নেই। প্রহরীকে সঙ্গে দিচ্ছি। ওর সামনে আপনারা কথা বলবেন। বুঝতেই পারছেন এখন আমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কথাটা শেষ করে প্রহরীকে ডাকলেন। সব নির্দেশ বুঝিয়ে দিল।

প্রহরী আগে আগে চলল। পেছনে মারিয়া আর পরিচারিকা। মারিয়া তখন ভেবে চলেছে—কীভাবে প্রহরীটাকে এড়ানো যায়। ও গলা নামিয়ে সমস্যার কথাটা পরিচারিকাকে বলল। বলল—ঐ প্রহরীকে যেভাবে পারো একটু দূরে সরাবে যাতে আমরা ভালোভাবে সব কথা বলতে পারি। পরিচারিকাটি খুবই চালাক। হেসে বলল—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমিই ওকে জব্দ করবো।

তিন চারটে কয়েদঘর ছাড়িয়ে প্রহরী একটা কয়েদঘরের সামনে এসে হাজির হল।

পাহারাদারের একজনকে বলল—ঐ যে বিদেশী ভূতটা—ওটা কি এখানে আছে?

—হ্যাঁ। পাহারাদার বলল।

—ডাকো তো ওকে। সৈন্যটি বলল।

লোহার গরাদের ফাঁকে মুখ রেখে পাহারাদার ডাকল—এই বিদেশী ভূত তোকে ডাকছে। ততক্ষণে দরজার কাছে ভিড় জমে গেছে। অবাক হয়ে সবাই মারিয়াকে দেখছে। মারিয়ার খুব অস্বস্তি হতে লাগল।

ফ্রান্সিস একটু পরেই লোহার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রহরীটি এগিয়ে আসতে যাবে তখনই পরিচারিকাটি প্রহরীটির প্রায় পথ আটকে দাঁড়াল। বলল—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায় বলুন তো?

—কেন বলুন তো? প্রহরী বলল।

—মানে—আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আপনার গ্রামে দেখেছি। পরিচারিকাটি বলল।

—ও। আমাদের বাড়ি মার্সিয়ার হিন্তাল গ্রামে—

পরিচারিকাটি হেসে উঠে হাততালি দিল। প্রহরীটিও হেসে উঠল।

মারিয়া এক নজর ব্যাপারটা দেখে নিল। তারপর নিম্নস্বরে বলল—উত্তরদিকে তলেদো নামে এক উপজাতি বাস করে। তারা যুদ্ধে নিপুণ। তেমনি সাহসী। তারা রাজা রিকার্ডোকে ভালোবাসে ভক্তিও করে। রাজা রিকার্ডো এদের এনে যুদ্ধে লাগাতে পারেন নি। যুদ্ধে হেরে যান তিনি।

—ও। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

—এখন রাজা রিকার্ডো বললেন—তোমার কাছে এসে একথা বলতো রাজা চাইছেন যদি তুমি কোনভাবে তলেদো উপজাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো আর ওদের এখানে আনতে পারো তাহলে এখানে আবার লড়াই হবে। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা হেরে যাবে।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে রইল। ভাবল। বলল—এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তার আগে তো এই কয়েদখানা থেকে মুক্তি চাই।

—হ্যাঁ—তোমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। মারিয়া বলল।

—আগে সেই চেষ্টাটা করি। তুমি রাজাকে বলো গে আমি এখান থেকে পালাবার উপায়টা ভাবছি। যদি শেষ পর্যন্ত পালাতে পারি আমি তলেদোদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। আবার লড়াই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই প্রাসাদের প্রহরী মারিয়ার কাছে এল। বলল—আপনার কথা হয়েছে?

—হ্যাঁ—মারিয়া বলল।

—তাহলে এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। চলো। মারিয়া বলল।

মারিয়া আর কোন কথা ফ্রান্সিসকে বলল না। পরিচারিকাটি এল। মারিয়া ওর সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে এল। রাণিমাকে সব কথা বলল। রাণিমা যেন একটু আশার আলো দেখলেন।

সন্ধ্যেবেলা রাণি রাজার শয়নকক্ষে এলেন। ফ্রান্সিসের সব কথা বললেন। রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—যুবকটি বলশালী। সাহসী। ও যদি ওর বন্ধুদের নিয়ে আমার হয়ে লড়াইয়ে নামে তবে ফার্নান্দোর সৈন্যরা হার স্বীকার করতে বাধ্য। রাজা বললেন।

—এখন তুমি একটা কাজ করো। ফার্নান্দোর সেনাপতিকে অনুরোধ করো উনি যেন ফ্রান্সিসকে মুক্তি দেন। রাণি বললেন।

—অসম্ভব। আমি রাজা। রাজা হয়ে আমি একজন সেনাপতিকে অনুরোধ করতে পারি না। রাজা বললেন।

—তাহলে ফ্রান্সিসকে কয়েদঘর থেকে পালাতে হয়। কিন্তু সেটা খুবই কঠিন। রাণি বললেন।

—দিন কয়েক থাক। দেখা যাক ফ্রান্সিস পালাতে পারে কিনা। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ—এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্যকিছু করণীয় নেই। রাণি বললেন।

ওদিকে ফ্রান্সিস মারিয়ার সঙ্গে কথা বলে নিজের জায়গায় এলো। দেয়ালে ঠেসান দিয় বসল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের পাশে বসে বলল—রাজকুমারী এসেছিলেন কেন? কী কথা হল? ফ্রান্সিস সব কথা বলল। শাঙ্কো বলল—এখন তো আমরা বন্দী। এখন আমরা কী করতে পারি।

—হ্যাঁ—সে কথাই তো বললাম। তবে যা বুঝতে পারছি এখান থেকে পালাবার একটা উপায় বার করতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা ফ্রান্সিস—আমরা যদি সেনাপতিকে বলি—আপনি তো যুদ্ধে জিতে গেছেন। রাজার মতই এখন আপনি ক্ষমতাধর। আমাদের দুজনকে মুক্তি দিন। আমরা আমাদের জাহাজে চলে যাবো। রাজকুমারীকে নিয়ে আমরা দেশের দিকে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো।

—কী বলছো শাঙ্কো? ঐ তালপাতার সেপাইয়ের কাছে মাথা নোয়াবো? ফ্রান্সিস বলল।

—কার্যসিদ্ধির জন্য নানারকম চাল দিতে হয়। এও একটা চাল। এ চাল লাগলে ভালো না লাগলেও ক্ষতি নেই। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভাবল। তারপর বলল—

—আগে পালাবার উপায়টা ভাবতে হবে। এটা যখন বুঝবো যে পালাবার কোন উপায় নেই তখন সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে মুক্তি চাইতে যাবো। তার আগে নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—তাই করো। শাঙ্কো বলল।

ওদিকে মারিয়া রাণি মারফৎ ফ্রান্সিসের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে রাজাকে জানাল। সব শুনে রাজা রিকার্ডো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—

—ফ্রান্সিসকে না পেলে কোন কাজই হবে না।

—ঠিক আছে। অরাগে দেখ ফ্রান্সিস কয়েদঘর থেকে পালাতে পারে কি না। না পারলে এখন অন্যরকম কিছু ভাবা যাবে। রাণি বললেন।

ওদিকে ফ্রান্সিস কয়েদঘর থেকে পালাবার উপায় ভাবতে লাগল। কিন্তু কোনটাই মনমত হচ্ছে না। ও চাইছিল এমনভাবে পালাবে যাতে নরহত্যা না হয়। কিন্তু দু' একজন পাহারাদারকে না হত্যা করলে পালানো যাবে না। কিন্তু ফ্রান্সিস অন্যভাবে ভাবতে লাগল। পাহারাদার কাউকে না মেরে পালাতে হবে।

শাঙ্কোও ভাবে। কিন্তু কুলকিনারা কিছু পায় না।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো বাদে আর সবাই রিকার্ডোর সৈন্য। পালাবার কথা ওরাও ফ্রান্সিসদের বলে। কিন্তু কেউই কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

সেদিন রাজা রিকার্ডোর কয়েকজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—পেছনের দেয়ালে একটা পাথর নড়ে গেছে। দেখতো সেটাকে খুলে ফেলা যায় কিনা। ফ্রান্সিস আধশোয়া ছিল। লাফিয়ে উঠল। বলল—শাঙ্কো চলো তো।

কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পেছনের দেয়ালের কাছে এল। সৈন্যরা পাথরের পাটাটা দেখাল। শাঙ্কো পাটাটার গায়ে হাত রাখল। ধাক্কা দিল। সত্যিই একটু নড়ে উঠেছে। এবার জোরে ধাক্কা দিল। পাটাটা আরো নাড়ল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে শাঙ্কো বলল—এটা খুলে ফেলা যাবে। একটু সময় লাগবে।

—তাই করো। যত সময় লাগুক। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো ঢোলা জামার নিচে থেকে ওর ছোরাটি বের করল। তারপর পাথরের পাটাটার খাঁজে খাঁজে ছোরার মাথা ঢুকিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের পাটাটা অনেকটা আলগা হয়ে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা ফ্রান্সিসকে দিল। হাঁপাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস পাথরের খাঁজে বন্দীরা মুক্তির আলো দেখতে পেল। তিন চারজন একসঙ্গে পাথরের পাটাটায় ধাক্কা দিল। পাথরের পাটাটা একটু শব্দ করেই খসে পড়ল। এবার দেয়াল ভাঙার ব্যাপারটা সহজ হল। একজনের পরে একজন বাকি পাটায় ধাক্কা দিতে লাগল। আলগা হয়ে পাথরের পাটা খসে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকাটা বড় হল। রিকার্ডোর সৈন্যরা ফাঁক দিয়ে গেল এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে গেল। কয়েদঘর শূন্য হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো কয়েদঘরের বাইরে এল। দুজনে এক ছুটে দূরে চলে এল। দুজনে একছুটে দূরে চলে এল। শুনল—ফার্নান্দোর সৈন্যরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে। এতক্ষণে ওরা জানতে পেরেছে যে কয়েদঘর থেকে সব বন্দী পালিয়ে গেছে।

শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—কী করবে এখন?

—উত্তরদিকে চলো। তলেদো উপজাতিদের গ্রামে যাবো। রাজা রিকার্ডোকে ওর নাকি খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে। ওরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ওদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের বন্ধুদেরও নিয়ে আসতে হবে। তারপর ফার্নান্দোর সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই। ফ্রান্সিস বলল।

—ফার্নান্দোর সৈন্যরাও তো সংখ্যায় কম নয়।

—অর্ধেক চলে গেছে। বাকিদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে ওরা হার স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ফ্রান্সিস বলল।

উত্তরদিকে প্রান্তরের পরেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জঙ্গলে ঢুকল। বনতল খুব একটা অন্ধকার নয়। ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে। গাছপালা খুব ঘন নয়।

দুজনে চলল বনের মধ্যে দিয়ে।

বনজঙ্গল শেষ। একটু দূরে ওরা একটা পায়ে চলা পথ দেখতে পেল। সেই পথটা ধরে দুজনে চলল।

ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ সাদাটে হয়ে এসেছে। তার মানে ভোর হতে দেরি নেই।

সূর্য উঠল। ভোরের রোদ পড়ল পায়ে চলা পথটার ওপর। ওরা দুজনে হেঁটে কিছুটা এগোতেই সামনে দেখল এখানে ওখানে কিছু বাড়িঘরদোর। মাটি মেশানো দেয়াল ছাউনি।

ফ্রান্সিসরা প্রথমেই যে বাড়িটা ছিল সেখানে এল। বাড়ির বাইরে একটি স্বাস্থ্যবান যুবক বাড়ির লাগোয়া ক্ষেতে গাছগুলোয় জলটল দিচ্ছিল। ফ্রান্সিস তাকে ডাকল। যুবকটি বিদেশী লোক দেখে একটু অবাকই হল। হাতের বালতিটা রেখে ফ্রান্সিসদের কাছে এল।

—তোমরা তো তলেদো জাতি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। যুবকটি বলল।

—তোমাদের গ্রামের মোড়লের সঙ্গে দেখা করবো। তুমি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—কি ব্যাপার বলুন তো? যুবকটি বলল।

—সেটা তোমাদের মোড়লকে বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। যুবকটি বলল।

যুবকটি আগে আগে চলল। ফ্রান্সিসরা পেছনে। রাস্তার ধারের বাড়িঘর থেকে লোকজন ওদের দেখতে লাগল। ওরা বোধহয় ভাবছিল এই বিদেশীগুলো কোত্থেকে এলো? এখানে কী করতে এসেছে?

একটা বড় বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। যুবকটি বলল—এটাই মোড়লের বাড়ি। বাড়ির বাইরে লাঠি হাতে একজন পাহারাদার বসেছিল। যুবকটি এগিয়ে গিয়ে পাহারাদারকে কী বলল। পাহারাদার বাড়ির ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এল। বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। মাটিতে একটা নানা রঙের সুতোর কাজ করা মোটা কাপড় বিছানো। যুবকটি বলল—বসো। ফ্রান্সিস শাঙ্কো ঐ কাপড়ের ওপর বসল।

একটু পরেই মোড়ল ঘরে ঢুকল। মোড়ল বয়স্ক লোক। শরীরের বাঁধুনি দেখেই

বোঝা যাচ্ছে যৌবনে সুদেহী পুরুষ ছিল। মোড়ল মোটা কাপড়টায় বসল। বলল—
—আপনারা তো বিদেশী?
—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।
—ও। আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন? মোড়ল জানতে চাইল।
—কয়েকদিন আগে সেভিলের রাজা ফার্নান্দো ক্যামেরিনাল আক্রমণ করে। ক্যামেরিনালের রাজা রিকোর্ডো লড়াইয়ে হেরে গেছেন। এখন তাঁর প্রাসাদে তিনি বন্দী। ফ্রান্সিস বলল।
—সে কি! এই লড়াইয়ের কেন খবরই তো আমরা জানতাম না। মোড়ল বলল।
—এখন রাজা রিকার্ডো চাইছেন তাঁর দেশ থেকে শত্রুদের তাড়াতে। সেইজন্যে উনি আপনাদের সাহায্য চেয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।
—আমরা নিশ্চয়ই লড়াইয়ে নামবো। রাজা রিকার্ডোকে আমরা শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি। মোড়ল বলল।
—তাহলে আর দেরি না করে আজ সন্ধ্যাবেলা আপনার সাহসী যোদ্ধাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করি। ফ্রান্সিস বলল।
—ঠিক আছে। মোড়ল বলল। তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে কয়েকজন যোদ্ধার নাম করে তার সঙ্গে দেখা করতে বলল।
ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে এল। যুবকটি ফ্রান্সিসদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। একটা ঘরে ফ্রান্সিসদের থাকবার ব্যবস্থা করল। ঘরটার মেঝেয় নানা কাজ করা মোটা চাদর বিছানো। ফ্রান্সিসরা বসল। একটু পরে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে বলল—শাঙ্কো—এবার আমাদের বন্ধুদের কী করে খবর পাঠাবে?
—তুমি ভেবো না। আমি ঠিক ওদের খবর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাতে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবো। শাঙ্কো বলল।
—দেখ চেষ্টা করে। ফ্রান্সিস বলল।
কিছুক্ষণ পরে একটা বাচ্চা মেয়ে একটা চিনেমাটির বাটি নিয়ে ঢুকল। মেঝেয় রাখল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বাটি দুটো নিয়ে খাবার খেতে লাগল। যবের ছাতুতে তৈরি সুস্বাদু খাবার। একে গত কয়েকদিন কয়েদঘরের অখাদ্য খাবার আর আজকে এতটা হেঁটে আসা দুজনের খিদেয় পেট জ্বলছিল। মুহূর্তে খেয়ে নিল।
পরদিন। দুপুরের খাওয়া খেয়ে শাঙ্কো চলে গেল। জাহাজ থেকে বন্ধুদের আনতে হবে।
সন্ধ্যের মধ্যেই ফ্রান্সিসরা রাতের খাবার খেয়ে নিল। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ভলেদো সেনা এসে মোড়লের বাড়ির সামনে জড়ো হল। বর্ম শিরস্ত্রাণ পরা। কটিদেশে তরোয়াল ঝুলছে। বোঝা গেল লড়াইতে ওরা পটু। প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ।
মোড়ল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সব কথাবার্তা থেমে গেল। মোড়ল দুহাত

তুলে বলতে লাগল—রাজা রিকার্ডো ছোট ভাই ফার্নান্দোর কাছে লড়াইয়ে হেরে গেছেন। এখন তিনি বন্দী ফার্নান্দোর সেনাপতির হাতে। রাজা রিকার্ডো, রাণি ও রাজপুত্রকে মুক্ত করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে সেনাপতি তাঁদের মুক্তি দেবে না। লড়াই করে সেনাপতিসহ অন্য সৈন্যদের লড়াইয়ে হারিয়ে রাজা রাণি আর রাজপুত্রকে মুক্ত করতে হবে। লড়াইয়ে জয়ী হয়ে তোমরা ফিরে এসো। তোমাদের শৌর্য বীর্যের প্রতি আমি বিশ্বাস রাখি। ভাইকিংরা বিদেশী। তবু রাজারাণির মুক্তির জন্যে তারা তোমাদের দলে থেকে লড়াই করবে। মোড়ল থামল। তরোয়াল কোষমুক্ত করে উঁচু করে তুলে ধরে তলেদোরা চিৎকার করে উঠল। তারপর তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। এবার যুদ্ধযাত্রা।

ফ্রান্সিস সকলের সামনে দাঁড়াল। বলল—আমিই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি সেনাপতির কয়েদঘরে বন্দী ছিলাম। কাজেই সেনাপতির সৈন্যদের কোথায় কোথায় মোতয়েন করা হয়েছে আমি জানি। সেনাপতির সেনা শিবির কোথায় কোথায় তা আমি জানি। সৈন্যাবাসের আগে আছে একটা বিস্তৃত প্রান্তর। তারপরেই বনজঙ্গল। আমরা এখন যাত্রা শুরু করলে মধ্যরাত নাগাদ ঐ বনজঙ্গলের আড়ালে পৌঁছতে পারবো। সেনাপতির নিদ্রিত সৈন্যদের আমরা আক্রমণ করবো। এবার চলো।

তলেদো সেনাদের নিয়ে ফ্রান্সিস যাত্রা শুরু করল।

ফ্রান্সিসের হিসেবটাই ঠিক ছিল। ওরা যখন বনের শেষপ্রান্তে এসে গাছগাছালির আড়ালে দাঁড়াল তখন বেশ রাত।

ওদিকে শাঙ্কো ক্যামেরিনাল নগর থেকে দূরে দূরে ঘুরে জাহাজঘাটার কাছে এল। দেখল সেনাপতির যুদ্ধ জাহাজ জলে ভাসছে। চাঁদের আবছা আলোয় দেখল বেশ দূরে ওদের জাহাজটা নোঙর করা।

শাঙ্কো কোন শব্দ না তুলে আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল। তারপর নিঃশব্দে সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের হালটা ধরল। তখন শাঙ্কো বেশ হাঁপাচ্ছে। জাহাজের দড়িদড়া ধরে হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজে উঠল।

ডেক-এ আট দশজন ভাইকিং ঘুমিয়ে। শাঙ্কো গিয়ে ওদের কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে বলল—খুব ঘুমিয়েছো এবার ওঠ। ভাইকিংরা ধড়ফড় করে উঠে বসল। শাঙ্কো বলল—অস্ত্রঘরে যাও। অস্ত্র নিয়ে তৈরি হও। আজ লড়াই।

বন্ধুরা উঠে ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে। হ্যারির কেবিনঘরে ঢুকে শাঙ্কো হ্যারিকে সব বলল। হ্যারি বলল—কিন্তু ফ্রান্সিস কেন লড়াই করতে চাইছে বুঝলাম না। শাঙ্কো বলল—সেনাপতি যেভাবে রাজপ্রাসাদ পাহারার ব্যবস্থা করেছে তাতে কারো পালাবার উপায় নেই। রাজা রাণি রাজপুত্র আর বিশেষ করে মারিয়ার মুক্তির জন্যে আমাদের লড়াইতে নামতেই হবে।

—ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যাবো কীভাবে? সদর রাস্তা ধরে যাওয়া চলবে না। সশস্ত্র আমাদের যেতে দেখলে সেনাপতি জানতে পারবেই। তাহলে ওখানেই লড়াই

শুরু হয়ে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—না-না। সে সব আমি আর ফ্রান্সিস ভেবেছি।

সেনাপতির সৈন্যাবাসের সামনেই বিরাট প্রান্তর। তারপর একটা বন। আমরা সেই বনের আড়ালে আড়ালে বনের প্রান্তে চলে আসবো। ওখান থেকে গভীর রাতে আমরা রাজা ফার্নান্দোর সেন্যদের ছাউনিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো। ঘুমন্ত সৈন্যরা ঘুম ভেঙে উঠে তরোয়াল হাতে নেবার সময়ও পাবে না। হ্যারি বলল।

—ঠিক পরিকল্পনা। কিন্তু ঐ বনের প্রান্তে আমরা যাবো কি করে? জাহাজ চালিয়ে তীরে নিয়ে গিয়ে—শাঙ্কো বলল।

—অসম্ভব। আমরা জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে নামবো। তারপর নিঃশব্দে সাঁতরে বেশ কিছুটা গিয়ে তীরে উঠব। তারপর রাজপ্রাসাদকে ডাইনে রেখে আমরা হাঁটবো উত্তর মুখে। বেশ কিছুটা গেলেই বন পাবো। বনের আড়ালে আড়ালে ফ্রান্সিসদের কাছে চলে যাবো।

—ফ্রান্সিসদের মানে? ফ্রান্সিস তো একা। হ্যারি বলল।

—না—উত্তরদিকে তলেদো নামে একদল উপজাতি থাকে। তারা রাজা রিকার্ডোকে খুব শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। আমরা ওদের সঙ্গে নিয়ে লড়াইয়ে নামবো।

—তাহলে তো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরোতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ—এটা তুমি বন্ধুদের বলে দাও। হ্যারি বলল।

বন্ধুরা হ্যারির কাছে সব শুনলো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সবাই তৈরি হল।

জাহাজে রইল শুধু ওদের বৈদ্য ভেন। আর সবাই তরোয়াল কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে জাহাজের হালে পা রেখে রেখে সমুদ্রের জলে নামল।

শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা সবাই আমার পেছনে পেছনে এসো।

শাঙ্কো নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে লাগল। পেছনে আর সবাই। শাঙ্কো লক্ষ্য ঠিক করে নিল। জাহাজঘাট থেকে বেশ দূরে তীরভূমির একটা জায়গা বেছে নিল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর সমুদ্রের বুকে কুয়াশা। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় কখনো কখনো কুয়াশা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তখনই তীরভূমি দেখা যাচ্ছে।

শাঙ্কোরা তীরভূমিতে উঠল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। ওখান থেকে অবছা রাজা ফার্নান্দোর জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

শাঙ্কোর পেছনে পেছনে বন্ধুরা আড়াআড়ি সদর রাস্তা পার হল। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে রাজপ্রাসাদের ঘেরা দেয়াল দেখল। রাজপ্রাসাদ পার হয়ে একটা ছোট মাঠমত। তারপরেই শুরু হয়েছে বনাঞ্চল।

শাঙ্কোরা বনে ঢুকল। শাঙ্কো তখন ভাবছে ফ্রান্সিসরা এসে পৌঁছেছে কিনা। বনের ফাঁক দিয়ে শাঙ্কো দেখল ডানদিকে প্রান্তর শুরু হয়েছে। শাঙ্কোরা হাঁটতে লাগল।

এবার বনের আড়াল থেকে শাঙ্কো দেখল প্রান্তরের ওপাশে সৈন্যাবাস। এখান থেকে আক্রমণ করা সহজ।

কিন্তু ফ্রান্সিসরা কোথায়? শাঙ্কো বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—তোমরা আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে এসো।

—একথা কেন বলছো? বিস্কো বলল।

—আমরা নিঃশব্দে ফ্রান্সিসদের দিকে গেলে ওরা আমাদের শত্রু মনে করতে পারে। তরোয়াল নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। শাঙ্কো বলল।

কিছুটা গিয়ে শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—ফ্রান্সিস ফ্রান্সিস। উত্তর নেই। শাঙ্কো যেতে যেতে আবার ডাকল—ফ্রান্সিস। বনজঙ্গলের মধ্য থেকে ফ্রান্সিসের গলা শোনা গেল—শাঙ্কো? ফ্রান্সিসরা জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তলেদোরাও এল। দুদল একত্র হল।

এবার আক্রমণ। সবাই তরোয়াল কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—যোদ্ধারা। অযথা নরহত্যা করবে না। জীবন বিপন্ন হলে তবেই নরহত্যা করবে। চলো।

সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর প্রান্তরের অস্পষ্ট চাঁদের আলোর মধ্য দিয়ে সৈন্যাবাসের দিকে ছুটতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যাবাসের কাছে এল। তারপর লাথি দিয়ে দরজাগুলো ভাঙতে লাগল। ঘরের ভেতরে ঢুকতে লাগল। দরজা ভাঙার শব্দে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। কিছুই করার নেই। অস্ত্রঘরে যাবারও উপায় নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা বন্দী হল। ফ্রান্সিসরা ওদের প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। কিন্তু সেনাপতি কোথায়? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। তৎক্ষনাৎ দেখল সেনাপতি প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ছুটছে।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির পিছু ধাওয়া করল। আরও দুজন তলেদো সেনা ফ্রান্সিসের পিছু পিছু ছুটল।

বনজঙ্গলে পৌঁছোবার আগেই সেনাপতি ফ্রান্সিসের হাতে ধরা পড়ল। তলেদো সৈন্যরাও এসে পৌঁছেছে। সেনাপতির হাতে তরোয়াল নেই। ফ্রান্সিস একজন তলেদো সেনার হাত থেকে তরোয়াল নিয়ে সেনাপতির দিকে ছুঁড়ে দিল। তরোয়াল মাটিতে পড়ল। বলল—অস্ত্র দিলাম। লড়াই করো। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। মাটি থেকে তরোয়াল তুলে সেনাপতি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একটু সরে গিয়ে তরোয়ালের প্রথম মারটা সামলাল। তারপর আক্রমণ করল। দুজনের তরোয়ালের লড়াই চলল। ফ্রান্সিসের দ্রুত আক্রমণের মুখে সেনাপতির নিজেকে অসহায় মনে হল। তরোয়ালে কাটা হাত কাঁধ মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। লড়াই চলল।

হঠাৎ একজন তলেদো সৈন্য সেনাপতির দিকে ছুটে গেল। ফ্রান্সিস বাধা দেবার আগেই সৈন্যটি সেনাপতির বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। সেনাপতি তরোয়াল

ফেলে দুহাত তুলে পেছনে গড়িয়ে পড়ল। কয়েকবার হাঁ করে শ্বাস নিয়ে মারা গেল।

ফ্রান্সিস বেশ রেগে গেল। তলেদো সৈন্যটির কাছে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমার আগেই আমি সেনাপতিকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু করি নি। চেষ্টা করেছি সেনাপতিকে হার স্বীকার করাতে। যুদ্ধযাত্রার আগেই আমি বলেছিলাম বিনা কারণে আমরা নরহত্যা করব না। তুমি তাই করলে?

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেনাবাসের দিকে ফিরে এল। সেনাপতির সৈন্যদের তখন হাতে দড়ি বেঁধে কয়েদঘরে ঢোকানো হচ্ছে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবে এখন?—রাজা রিকার্ডোর কাছে যাবো। তাঁর জয়ের সংবাদ জানাবো। তারপর মারিয়াকে নিয়ে চলে আসবো। জাহাজে ফিরে এসে জাহাজ চালাবো দেশের দিকে।

সব বন্ধুদের ডেকে এনে একত্র করা হল। সবাই চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

রাজপ্রাসাদের সামনে যখন ওরা এল তখন ভোর হয়ে গেছে। রাজা রিকার্ডোর জয়ের সংবাদ তখন সারা ক্যামেরিনালে ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে প্রজারা আসতে লাগল রাজপ্রাসাদের দিকে।

ফ্রান্সিসরা রাজপ্রাসাদের সামনে এল। দেখল সদর দেউড়ি বন্ধ। প্রাসাদের সীমাঘেরা পাথরের দেয়ালের পরেই প্রজারা দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—সমস্যায় পড়া গেল।

—হ্যাঁ। ভেতরেই তো যাওয়া যাবে না এখন। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর যুদ্ধে জয়ী রাজা এখন প্রজাদের দর্শন দেবেন। এতেও কম সময় যাবে না। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিসরা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করল। রাজা রিকার্ডো ডান হাত তুলে প্রজাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। প্রজারা রাজার জয়ধ্বনি করল।

আস্তে আস্তে প্রজারা চলে যেতে লাগল। প্রাসাদের চারপাশের ভিড় কমে গেল।

ফ্রান্সিস সদর দেউড়িতে এল। প্রহরীকে ফ্রান্সিস বলল—ভাই—আমাদের একবার ভেতরে যেতেই হবে।

—কেন বলুন তো? প্রহরী বলল।

—দেখতেই পাচ্ছো আমরা বিদেশী। আমাদের দেশের রাজকুমারী প্রাসাদে আছেন। আমরা তাঁকে নিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তার জন্যে রাজার হুকুম লাগবে। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে—আমরা রাজার কাছে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—মাত্র দুজন আসুন। কথাটা বলে প্রহরী দরজা খুলে দিল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঢুকল। পাথর বাঁধা ছোট পথটা ধরে ওরা প্রাসাদের প্রথম ঘরটার সামনে এল। দরজায় দুজন প্রহরী। হাতে পেতলের বর্শা। ঝক্‌ঝক্ করছে। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল। এত যে যুদ্ধ হল তখন কোথায় ছিল এরা। ফ্রান্সিস

প্রহরীকে বলল—রাজা রিকার্ডোকে গিয়ে বলো দুজন ভাইকিং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। প্রহরী চলে গেল। একটু পরেই এল। বলল—আপনারা এ ঘরে বসুন। রাজা আসছেন।

ফ্রান্সিস হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। দেখল ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথর বাঁধানো বড় টেবিল। টেবিলটার চারপাশে চেয়ার পাতা। চেয়ারের গদী পাখির পালকের।

ফ্রান্সিসরা বসল। রাজা রিকার্ডো ঢুকলেন। হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস হ্যারি উঠে দাঁড়াল। রাজা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাতটা ধরলেন। হাতটা ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন—আমি সব শুনেছি। আপনারা আমার দেশ শত্রু মুক্ত করলেন এজন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

—ও কথা বলবেন না। তলেদোরাও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ওদের সহায়তা পেয়েই আমরা যুদ্ধে জয়ী হলাম।

—তবু আপনারা তো এদেশবাসী নন। এখানে কে রাজা হল কে হল না এসবের সঙ্গে আপনাদের তো কোন সম্পর্ক নেই। তবু আমার হয়ে লড়াই তো করেছেন।

—মাননীয় রাজা একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন।

—আমাদের দেশের রাজকুমারী আপনাদের অন্দরমহলে রয়েছেন। আমরা তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—বেশ তো। রাজা আস্তে হাততালি দিলেন। প্রহরী দুজন প্রায় ছুটে এল।

—অন্তঃপুরে রাণি থাকে খবর পাঠাও। একজন বিদেশীনী রাজকুমারী অন্তঃপুরে রয়েছেন। তাঁকে এই ঘরে যেন পাঠানো হয়।

কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখে হাসল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল—মারিয়ার চোখমুখ কেমন শুকনো। চোখের নিচে কালি। মারিয়া এই কদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছে। মারিয়ার মুখটাও কেমন বিষণ্ণ।

রাজা রিকার্ডো আর একবার ফ্রান্সিসদের ধন্যবাদ জানালো।

ফ্রান্সিসরা প্রাসাদের বাইরে এল। সদর দেউড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। তখন ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—তোমার শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে। আর না এবার দেশে ফিরে যাবো। মারিয়া হেসে বলল—আবার খোঁজাখুঁজি করার কিছু পেলে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে যাবে।

—ঐ তো এক জ্বালা। কী যে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার জন্যে ভেবো না। আমি ভালো আছি। মারিয়া বলল।

—তোমাকে সঙ্গে আনা ভালো হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক উল্টো। আমার যে কী আনন্দ হয়—কত বিচিত্র দেশ কত বিচিত্র মানুষ। রাজবাড়ির ঘরে পড়ে থাকলে এ জীবনেও দেখা হত না। আমি এসে খুশি

হয়েছি। শরীরের ভালো মন্দ লেগেই থাকে। একটু বিশ্রাম পেলেই আমার শরীর ভালো হয়ে যাবে। মারিয়া বলল।

—না। ভেনকে বলতে হবে ও যেন এখানকার কোন কবিরাজের কাছ থেকে ভালো ভালো ওষুধ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বিশেষ করে তোমাকে চিকিৎসার জন্যে।

—আমার কোন অসুখ নেই। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে—সেটা ভেন বুঝবে। ফ্রান্সিস বলল।

প্রাসাদের বাইরে আনতে বন্ধুরা ছুটে এল। আনন্দে ওরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

এবার সবাই জাহাজঘাটের দিকে চলল।

জাহাজে উঠে ফ্রান্সিস প্রথমেই ভেন-এর কেবিনঘরে গেল। ভেন আধশোয়া হয়ে ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—ভেন—তোমার ওষুধ টষুধ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে এসেছে।

—হ্যাঁ কিছু ওষুধ জোগাড় করতে হবে। ভেন বলল।

—তাহলে এক কাজ করো। দুপুরে খেয়ে দেয়ে তীরে নামো। দুএকজন কবিরাজকে খুঁজে বের কর। দরকারি ওষুধ তাদের কাছ থেকে নাও। শাঙ্কোর কাছ থেকে দশটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—স্বর্ণমুদ্রা লাগবে না। ভেন বলল।

—না লাগলে নিজের কাছেই রেখে দেবে। আবার আর এক বন্দরে পৌঁছলে সেখানেও ওষুধ জোগাড় করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ভেন বলল।

—শোন ভেন তোমার ওষুধ সংগ্রহের জন্যে আমরা এখানে দুদিন থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। ভেন বলল।

দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে ভেন তীরভূমিতে নামল। তারপর সদর রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল উত্তরমুখো। খোঁজ করতে করতে তিনজন কবিরাজের ঠিকানা পেল। ভেন বেরুলো তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

ফ্রান্সিসরা দুদিন ক্যামেরিনাল বন্দর শহরে রইল। ভেনও খুব ছুটোছুটি করে ওষুধ জোগাড় করল।

এবার যাত্রা। জাহাজের নোঙর তোলা হল। গোটানো পাল খুলে দেওয়া হল। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড়ঘরে গেল কয়েকজন। দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ দ্রুত চলল সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

সেদিন দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে হ্যারি আর শাঙ্কো এল। গল্পগুজব চলল। মারিয়াও যোগ দিল।

আলখাত্তিব ঢুকল। ফ্রান্সিস খাত্তিবকে ওর বিছানায় বসতে বলল। আলখাত্তিব বিছানায় বসল। তারপর বলল—আপনারা তো জাহাজ চালিয়ে চলে যাবেন।

আমি কী করবো? ফ্রান্সিস বলল—তুমি এখানেই থাকবে।

—কিন্তু দৈবাৎ যদি রাজা ফার্নান্দোর গুপ্তচরের নজরে পড়ে যাই তাহলে ফাঁসির হাত থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আলখাতিব বলল।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল— আচ্ছা খাতিব—কিছুদিন আগে তুমি এক রোমান সম্রাটের কথা বলেছিলে। জিরাল্ডা টাওয়ারের কোথাও সম্রাট মাতিস তাঁর রাজভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছিলেন। ব্যাপারটা কী বলো তো। তোমার প্রপিতামহ নাকি জানতো কোথায় মাতিস ধনসম্পদ রেখেছিল। খাতিব একটু চুপ করে থেমে বলল—সে অনেক কথা। সে সব আপনার শুনে কী হবে। —সেটা আমরা বুঝব। তুমি বলো। হ্যারি বলল।

আলখাতিব একটু থেমে বলতে লাগল—সেভিল বন্দর শহরে প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন রোমান সম্রাট মাতিস রাজত্ব করতেন। তিনি সেভিলে জিরাল্ডা টাওয়ার নির্মাণ করে ছিলেন। সেই টাওয়ার নির্মাণ করাবার সময় আমার এক পূর্বপুরুষ সোনিক্কা রাজমিস্ত্রির কাজ করেছিলেন। খাতিব থামল।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ সময়ে খলিফা আনমন সুরে সেভিল আক্রমণ করতে এসেছিল। গুপ্তচর মারফৎ এই খবর পেয়ে সম্রাট মাতিস স্থির করলেন রাজকোষ জিরাল্ডা টাওয়ারের মধ্যে কোথা গোপনে রেখে দেবেন।

সেইদিনই রাতে আমার পূর্বপুরুষ সোনিক্কা আর একজন রাজমিস্ত্রিকে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। সেই রাতে দুজনকে নানা সুস্বাদু খাবার খাওয়ালেন। পেটপুরে খেল দুজনে। তারপর পাখির পালকে তৈরি বিছানায় দুজনে শুল। কী সুন্দর ঘর। পাথরের দেয়ালে পাখি লতা পাতা ফুলের কাজ করা। ঘরের এক কোণায় কী জ্বলছে। ধূয়ো ছড়াচ্ছে। কী সুন্দর গন্ধ।

দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল সম্রাটের ডাকে। দুজনে বিছানায় উঠে বসল। বিছানা থেকে নেমে এল। সম্রাট সোনিক্কার হাতে দিলে একটা চামড়ার বড় থলি। সোনিক্কা ওটা কাঁধে করে নিয়ে নিল। সম্রাট বললেন আমার সঙ্গে এসো।

সম্রাটের সঙ্গে দুজনে প্রাসাদের বাইরে এল।

সম্রাট হাঁটতে লাগলেন জিরাল্ডা টাওয়ারের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে বললেন—সব দ্বারী প্রতিহারীকে ছুটি দিয়েছি। আমি যা তোমাদের দিয়ে করাব না সেটা আমি গোপনে করতে চাইছি।

সোনিক্কা দেখল প্রাসাদের দরজায় বড় দেউড়ির কাছে কোথাও কোন প্রহরী নেই।

রাত্রি জ্যোৎস্নালোকিত। সবই অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তিনজনে জিরাল্ডো টাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়াল। সম্রাট সোনিক্কাকে নিয়ে টাওয়ারের প্রথম সিঁড়ির কাছে এলেন। সিঁড়ির ওপরে কয়েকটা পাথরের পাটা

রাখা। সম্রাট বললেন অন্য মিস্ত্রিটাকে—তুমি বেশ শক্তসমর্থ। এই পাথরের পাটা নিয়ে টাওয়ারের মাথায় উঠতে হবে। তুমি যথেষ্ট বলশালী। তুমি পারবে। পাটাতনগুলো নাও। ঐ রাজমিস্ত্রি পাটাতনগুলো নিল। মাথার ওপর পাটাতনগুলো চাপিয়ে মিস্ত্রি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

—তুমি এতসব জানলে কী করে? হ্যারি বলল।

—আমরা বংশপরম্পরায় এই ঘটনাটি শুনে আসছি। আমাদের পূর্বপুরুষ সোনিক্কা নিশ্চয়ই এই ঘটনা বংশের কাউকে বলেছিলেন। সেটাই আমাদের বংশের মানুষদের মধ্যে গল্পকথার মত চলে আসছে। খাতিব বলল।

—তারপর বলো। হ্যারি বলল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে উঠতে লাগলেন। টাওয়ারের জায়গায় জায়গায় তো জানালার মত চৌকো ফোকর। এখানে চাঁদের আলো পড়েছে।

সম্রাট সামনে। পেছনে অন্য মিস্ত্রিটি। শেষে সোনিক্কা। তিনি আগে অন্ধকারে চামড়ার বড় থলিটার মুখ খুলে ফেলেছিলেন। এবার থলিতে হাত ঢোকালেন। একমুঠো কী যেন তুলে আনলেন। চাঁদের আলোয় দেখলেন—হীরে মণিমাণিক্য। রেখে দিলেন সেসব। মহূর্তে বুঝলেন এসব রাজকোষ থেকে আনা। এই জিরাল্ডা মিনারের কোথাও লুকিয়ে রাখার জন্যে সম্রাট এনেছেন। দুজন মিস্ত্রির সাহায্যে তিনি এটা করবেন। তারপর বুদ্ধিমানেরা যা করে তাই করবেন। সোনিক্কা আর অন্য মিস্ত্রিটাকে হত্যা করবেন।

—সোনিক্কা পালালেন—তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সোনিক্কা থলিটা সিঁড়িতে রেখে ফিরে দাঁড়ালেন। সম্রাটের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোনিক্কাকে বললেন—পালাবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু সোনিক্কা ততক্ষণে কয়েকটা সিঁড়ি শেষে এসেছেন। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল কোষমুক্ত করলেন। অন্ধকারেই তরোয়াল চালালেন। সেই তরোয়ালে ঘা সোনিক্কার পিঠে পড়ল। আহত সোনিক্কা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। সম্রাটও কয়েকটা সিঁড়ি দ্রুতপায়ে নেমে এলেন। সোনিক্কা ততক্ষণে মিনারের বাইরে চলে এসেছেন। পাগলের মত ছুটতে লাগলেন। সম্রাট বুঝলেন সোনিক্কাকে ধরা যাবে না। তিনি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দেখলেন সোনিক্কা সদর দেউড়ির মাথায় উঠে পড়েছেন। সান্ত্রী প্রহরী কেউ নেই যে সোনিক্কার পিছু ধাওয়া করবে।

সম্রাট টাওয়ারে ফিরে এলেন।

হ্যারি বলল—তাহলে বোঝা যাচ্ছে সম্রাট তাঁর রাজকোষ কোথায় গোপনে বানালেন সেটা তোমার পূর্বপুরুষ সোনিক্কা দেখতে পান নি।

—না। খাতিব বলল—তবে অন্য রাজমিস্ত্রিটি রাজকোষ কোথায় গোপনে রাখা হল সেটা জানতো কারণ ও নিজেই কাজটা করেছিল। কিন্তু সেই রাজমিস্ত্রিটিকে পরে কেউ কোনদিন দ্যাখেনি। তার মানে সম্রাট তাকে হত্যা করেছিলেন।

—কিন্তু রাজা তোমাকে বন্দী করে রেখেছিল কেন ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা ফার্নান্দোর মন্ত্রীর বংশের সঙ্গে আমাদের বংশের শত্রুতা অনেকদিন যাবৎ চলে আসছে। সেই সেনাপতিই রাজাকে বলেছিল যে আমাদের পরিবারের লোকেরা জানে—রোমান সম্রাট কোথায় তাঁর রাজকোষ গোপনে রেখেছিলেন। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্য আমাকে বন্দী করে রাজার সভা ঘরে নিয়ে এল। সেনাপতিটি যখন সেনাপতি হল তখনই আমি জানতাম আমাদের পরিবারের ওপর অত্যাচার শুরু হবে। তাই বাবা আর ঠাকুর্দাকে হুয়েনভায় নিয়ে গিয়েছিলাম। এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। সৈন্যরা বাবা আর ঠাকুর্দাকে পায় নি।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা ফার্নন্দো আমার কাছে জানতে চাইলেন আমার কোন পূর্বপুরুষ সম্রাট মাতিসের রাজকোষ কোথায় লুকিয়ে রাখা হল তা জেনেছিল কিনা। আমি বললাম—রাজকোষ জিরাল্ডা টাওয়ারের কোথাও গোপনে রাখা হয়েছে এটা আমার পূর্বপুরষ সোনিক্কা জানতে পারেন নি। সোনিক্কা জিরাল্ডা টাওয়ারে ওঠার আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা ফার্নান্দো সেটা বিশ্বাস করলেন না। কয়েদঘরে রেখে আমার ওপর ভীষণ অত্যাচার চলল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমি মিথ্যে করে বললাম যে আমার পূর্বপুরুষ সোনিক্কা মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন যে সম্রাট মাতিসের গুপ্তধন জিরাল্ডা টাওয়ারের সিঁড়ির ধাপে পুঁতে রাখা হয়েছে। কথাটা বলে আমি অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচলাম। কিন্তু আমার বিপদ কাটল না। রাজা ফার্নান্দো তাঁর শ'পাঁচেক সৈন্যকে লাগালেন জিরাল্ডা টাওয়ারের সব সিঁড়ি ভেঙে ফেলার জন্যে। আমাকে মুক্তি দেওয়া হল।

—কিন্তু রোমান সম্রাটের কোষাগার পাওয়া গেল না—এই তো? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—হ্যাঁ। আমি হুয়েনভা বন্দর শহরে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ক্রুদ্ধ রাজা ফার্নান্দো আমাকে ধরবার জন্যে গুপ্তচর লাগাল। আমি ধরা পড়লাম। আবার কয়েদখানায় ঢোকানো হল আমাকে। আলখাতিব থামল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

ভেন ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—ভেন দরকারি ওষুধটষুধ পেয়েছো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কাল সকালেই জাহাজ ছাড়তে হবে। হ্যারিকে বলল—

—হ্যারি সবাইকে ডেক-এ আসতে বলো। আমার কিছু কথা বলার আছে। হ্যারি ঘর থেকে বেরিয়ে সবাইকে খবর দিতে চলল।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারি ফিরে এল। বলল—ফ্রান্সিস সবাই এসেছে। তুমি চলো। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ডেক-এ বন্ধুরা সব জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিস কী বলে শুনতে এসেছে। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকিয়ে নিল। গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—আমরা

এখন হুয়েনভা বন্দর শহরে যাবো। ওখান থেকে যাবো সেভিলে। প্রায় দেড়শ বছর আগে এক রোমান সম্রাট মাতিস জিরাল্ডা টাওয়ারের কোথাও তাঁর রাজকোষ গোপনে রেখে গেছেন সেটা আমি উদ্ধার করবো। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস আমরা অনেকদিন দেশছাড়া। এখানে পড়ে না থেকে চলো এবার দেশে ফিরে যাই। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল—শাঙ্কো তোমরা ভালো করেই জানো আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত মুক্ত করা যায় না। আর কোন বন্ধু কিছু বলল না। ফ্রান্সিস বলল—সেভিলে যাবো আমি হ্যারি আর বিস্কো। গুপ্ত রাজকোষ খুঁজবো। তোমরা এখানে হুয়েনভা বন্দরে থাকবে।

সভা ভঙ্গ হল। ভাইকিং বন্ধুরা কেউ কেউ নিজেদের কেবিনঘরে ফিরে গেল। কেউ কেউ ডেকএ শুয়ে বসে রইল।

কেবিনঘরে ফিরে মারিয়া বলল—তুমি কি দেশে ফিরতে চাও?

—না চাই না। এভাবে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে জীবনটা কাটাতে চাই।

—আমি তা চাই না। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস মনে ব্যথা পেল। বলল—মারিয়া, তুমি যদি দেশে ফিরে যেতে চাও আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

মারিয়া ফুঁপিয়ে উঠল। বলল—আমার ভুল হয়েছে আমাকে মাফ কর। আমি ফিরে যাবো না। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো। ফ্রান্সিস হাসল। বলল—ঘরের বাইরের জীবন আমাদের অনেক কিছু শেখায়। হিংসা দ্বেষ থেকে মুক্তি দেয় আমাদের । যাকগে—তুমি যদি সেভিলে যেতে চাও যেতে পারো।

—হ্যাঁ আমি যাবো। মারিয়া বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে ফ্রেজার জাহাজ ছাড়ার জন্যে তৈরি হল। গুটানো পাল সব খুলে দেওয়া হল। হাওয়া উদ্দাম। পালগুলো ফুলে উঠল। জোরগতিতে জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে চলল।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসদের জাহাজ হুয়েনভা বন্দর শহরের কাছে এল। ফ্রান্সিস হ্যারি জাহাজের রেলিং ধরে জাহাজঘাটের দিকে তাকিয়েছিল। জাহাজঘাটায় রাজা ফার্নান্দোর দুটো যুদ্ধজাহাজ নোঙর করে আছে।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস জাহাজঘাটে জাহাজ নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমরা রাজা ফার্নান্দোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এখন আমরা বাঘের মুখে।

—কিছ্ছু ভেবো না হ্যারি। আমার কাছে মহাস্ত্র আছে। সব রাজারাই সেই অস্ত্রে ঘায়েল হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—মহাস্ত্রটা কী? হ্যারি বলল।

—রোমান সম্রাট মাতিসের গুপ্তধন ভাণ্ডার। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তোমাকে সে ক্ষেত্রে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতেই হবে।

—ঠিক। কিন্তু যদি কোন ব্যাপারটা জটিল গুপ্তভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে না তবে রাতের অন্ধকারে পালাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে চলো জাহাজ জাহাজঘাটেই লাগাই। দেখা যাক কী হয়। হ্যারি বলল।

দূর থেকে ফ্রান্সিস আর হ্যারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল। রাজা ফার্নান্দোর দুই যুদ্ধ জাহাজেই সৈন্যদের ছুটোছুটি দেখল—

—ফ্রান্সিস আমরা ধরা পড়ে গেছি। হ্যারি বলল।

—সেটা জেনেই এখানে এসেছি। দেখা যাক রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা কী করে। ফ্রান্সিস বলল।

তীরভূমির খুব কাছে এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজ থামল। নোঙর ফেলা হল। কাঠের পাটাতন ফেলা হল না।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখা গেল তীরভূমি দিয়ে কয়েকজন রাজা ফার্নান্দোর সৈন্য ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসছে।

সামনের লোকটিকে দেখে বোঝা গেল নতুন সেনাপতি। ওরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের সামনে এসে দাঁড়াল। একজন সৈন্য চেঁচিয়ে বলল—এ দেশের সেনাপতি এসেছেন। পাটাতন ফ্যালো। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো যা বলছে তা কর। বিস্কো পাটাতন ফেলল। সেনাপতি দলবল নিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে পড়ল। নতুন সেনাপতির চেহারা আগের সেনাপতির বিপরীত। ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ। গোবদা গোবদা শরীর। কুত্‌কুতে চোখ। জাহাজে উঠে বলল তোমাদের দলনেতা কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল আমি।

—তোমাদের সবাইকে বন্দী করা হল। কয়েদঘরে থাকতে হবে তোমাদের। নতুন সেনাপতি বলল।

—বেশ। আপত্তি নেই। কয়েদঘরে থাকবো আমরা। কিন্তু কাল সকালে রাজা ফার্নান্দোর কাছে আমাদের যেতে দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? সেনাপতি বলল।

—সেটা আমি রাজা ফার্নান্দোকেই বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—না। আগে আমাকে বলবে। সব শুনে আমি অনুমতি দিলে তবেই রাজার সঙ্গে. দেখা করার ব্যবস্থা করবো। নতুন সেনাপতি বলল।

—বেশ শুনুন—প্রায় দেড়শো বছর আগে এক রোমান সম্রাট শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে তাঁর রোজকোষের সব মূল্যবান অলঙ্কার পাথর সোনার চামচ জিরাল্ডার টাওয়ারের কোথাও গোপনে রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ এই ঘটনার কথা আমি শুনেছি। পরে এখানকার রাজারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই মূল্যবান ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পারে নি। নতুন সেনাপতি বলল।

—আমিও চেষ্টা করবোই ঐ ধনসম্পদ উদ্ধার করতে। ফ্রান্সিস বলল।

নতুন সেনাপতি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। বলল—হাতিঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল। ফ্রান্সিসও সঙ্গে সঙ্গে জোরে হো হো করে হেসে উঠল। সেনাপতি হাসি থামিয়ে কড়াচোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর বলল—ঠিক

আছে। রাজা ফার্নান্দোর সঙ্গে তোমার কথা বলিয়ে দেবো। কালকে সকালে রাজসভায়।

—খুব ভালো কথা। শাঙ্কো বলল।

—নাও—এবার কয়েদঘরের দিকে চলো। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে চলল। সঙ্গে মারিয়া। ওদের ঘিরে নিয়ে চলল সৈন্যরা সেনাপতির পাশেই হাঁটছিল শাঙ্কো। শাঙ্কো বলল—আবার সেনাপতি যে ছিল সে তো তালপাতার সেপাই। হ্যাঁ—সেনাপতি হলে তার চেহারা আমার মতই হওয়া চাই। সেনাপতি ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। তারপর শাঙ্কোর মন্তব্যটা সবাই শুনল কিনা সেটা চারদিকে তাকিয়ে যাচাই করে নিল। বোঝা গেল কাদের কয়েকটির সৈন্য শাঙ্কোর মন্তব্য শুনেছে। সেনাপতি একবার গোঁফে তা দিল।

সন্ধ্যে নাগাদ ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের সামনে পৌঁছল। কয়েদঘরের দরজার দুপাশে মশাল জ্বলছে। দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে।

ঢং ঢং শব্দ তুলে দরজা খোলা হল। শাঙ্কো সেনাপতির কাছে গেল। বলল—দেখুন মহামান্য সেনাপতি আমাদের দেশের রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এই কয়েদঘরে থাকতে তাঁর খুবই কষ্ট হবে।

—কী করা যাবে—আলাদা রাখার হুকুম না হলে তো—সেনাপতি যায় না।

—কী যে বলেন—আপনার হুকুম কি কিছু কম? মহামান্য—আপনি শুধু পাহারাদারকে বলুন রাজকুমারীকে রাজা ফার্নান্দোর অন্দরমহলে রেখে আসতে—ওরা শুনতে বাধ্য। আপনাকে ওরা যমের মত ভয় করে। সেনাপতি দাঁত বের করে হাসল। বলল—হ্যাঁ তা করে।

—তবে আর ভাবছেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—না ভাবছি রাজা যদি জানেন—

—শুধু তো একটা রাত। কালকেই তো তোমার হুকুম জানা যাবে। শাঙ্কো বলল।

—তা বটে—এক রাতের জন্যে—সেনাপতি কথাটা শেষ করল।

—তাই তো বলছি—আপনার ক্ষমতা কি কিছু কম? শাঙ্কো বলল। সেনাপতি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। বলল—দেখছি।

শাঙ্কো মারিয়ার ইশারায় কয়েদঘরে ঢুকতে মানা করল। মারিয়া কয়েদঘরে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

সেনাপতি রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য।

কিছুপরে দুজন সৈন্য এল। মারিয়াকে বলল আপনিই তো রাজকুমারী।

—হ্যাঁ। মারিয়া মাথা ওঠানামা করল।

—আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনি প্রাসাদের অন্দর মহলে থাকবেন। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না আমি এখানেই থাকবো।

ফ্রান্সিসরা দরজা ধরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস মারিয়ার কথা শুনল।

বলে উঠল—মারিয়া পাগলামি করো না। এই পরিবেশে এক রাত থাকলেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। শাঙ্কো বলল—আমাদের জন্যে ভাববেন না। এসবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আপনি অন্তঃপুরে যান।

মারিয়া আর কিছু বলল না। সৈন্য দুজনের সঙ্গে একটা ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর দিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চলে গেল।

কয়েদঘরে ফ্রান্সিস দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। হ্যারি শাঙ্কো আলখাল্লিব দুপাশে বসে আছে। আলখাল্লিব বলল—ভাগ্যিস আগের শুঁটকো সেনাপতিটা, মারা গেছে। নইলে আমাকে ঠিক চিনতো। আমার বিপদ বাড়তো।

তখনই বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে উঠে এল। মৃদুস্বরে বলল—আপনি এভাবে বন্দীদশা মেনে নেওয়াতে কিছু বন্ধু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

—এটা তো ভালো কথা নয়। কথাটা বলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব—আমি অযথা রক্তপাত মৃত্যু থেকে তোমাদের বাঁচাবার জন্যেই ধরা দিয়েছি। ওদের দুজাহাজ বোঝাই সৈন্য। এদিকে আমরা কজন মাত্র। লড়াইয়ে নামলে আমরা শুকনো পাতার মতো উড়ে যেতাম। আমি সবদিক ভেবেই এই বন্দীদশা মেনে নিয়েছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কালকে রাজা ফার্নান্দোর দরবারে যাচ্ছি। অর্থ সম্পদের লোভ রাজা গরিব সবারই সমান। বরং রাজাদের এই লোভ আরো বেশি। দেখা যাক কাল কী হয়।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খাচ্ছে তখন সেনাপতি এল। বলল—খেয়েটেয়ে চলো রাজসভায় তবে এতজনকে যেতে হবে না। তোমাদের শুধু দলপতি গেলেই চলবে।

—আমি একা যাবো না—দুজন বন্ধুকেই নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তাই যেও। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো রাজসভা ঘরে গিয়ে পৌঁছল। ঘরটা একটু অন্ধকার মতো। দেয়ালে আটকানো মশাল জ্বলছে। আর একটা বিচার চলছিল। রাজা ফার্নান্দো একটা কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনের গদীটা নীল ভেলভেটের কাপড়ে ঢাকা। রাজা ফার্নান্দোর বেশ বয়েস হয়েছে। মাথার পাকা চুলের ওপর সবুজ মিনে করা মুক্তো বসানো সোনার মুকুট। মুখে পাকা দাড়ি গোঁফ।

তখন একটা বিচার চলছিল। বিচার শেষ হল। যে দু'জন বিচার চাইতে এসেছিল তাদের একজন হাতের উল্টোপিঠে চোখের জল মুছতে মুছতে গেল। অন্যজন হাসছিল। সে কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে সভাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার সেনাপতি ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইশারা করল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এসে মাথা একটু নিচু করে রাজাকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতি বলতে লাগল কী করে সে ফ্রান্সিসদের বন্দী করেছে।

—ওদের কী বলে আপনার সন্দেহ হয়? রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন।

—ওরা ভাইকিং ভাই কিংবা জলদস্যু। ওদের জাহাজে তল্লাশী চালালে অনেক

সোনাদানা চুনীপান্না পাওয়া যাবে। সেনাপতি বলল। এবার ফ্রান্সিস বলল—মহামান্য রাজা—ইচ্ছে করলে সেনাপতিমশাই আমাদের জাহাজে তল্লাশী চালাতে পারেন। কিন্তু শুধু সন্দেহ করে আমাদের বন্দী করতে পারেন না।

—সেটা পরে দেখছি। এখন কয়েদঘরে থাকতে হবে। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস খাতিবকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—এগিয়ে যাও। কোন ভয় নেই।

খাতিব রাজসিংহাসনের দিকে একটু এগিয়ে গেল। খাতিব রাজার নজরে পড়ল। রাজা গলা চড়িয়ে বললেন—কি নিজে থেকেই ধরা দিতে এসেছো?

খাতিব কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথা তুলে বলল—মাননীয় রাজা—আমি যা জেনেছিলাম যা শুনেছিলাম সবই আপনাকে বলেছি।

—না-না-তুই মিথ্যে কথা বলেছিস। তুই সব জানিস্। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মান্যবর রাজা! আমরা জাতিতে ভাইকিং। আমরা বেশ পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে নানা গুপ্তধন সম্পদ উদ্ধার করেছি। রাজা ফার্নান্দো সাগ্রহে বললেন—সত্যি! তোমরা কি রোমান সম্রাট মাতসের গুপ্ত রাজকোষ উদ্ধার করতে পারবে?

—সব কিছু দেখে শুনে খোঁজখবর করে তবে বলতে পারবো সেই ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—দ্যাখো চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

—এবার কয়েকটা অনুরোধ। আমার বন্ধুরা কয়েদঘরে বন্দী। তাদের মুক্তি দিতে হবে। ওরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাবে।

—বেশ। তারপর? রাজা বললেন।

—এই রাজপ্রাসাদেই একটা ঘর আমাদের চারবন্ধুকে দিতে হবে। এতে আমাদের কাজ করার সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাদের থাকবার ঘর দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

—আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। তাঁকে অন্দরমহলে থাকতে দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তিনি অন্দরমহলেই থাকবেন। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিসরা রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসছে তখনই দেখল একটু দূরে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে গেল। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না, না আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।

—তা হয় না মারিয়া। তার চেয়ে তুমি যখন খুশি আমাদের ঘরে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। কথাটা বলে মারিয়া পরিচারিকাটির সঙ্গে চলে গেল।

প্রাসাদের বাইরে আসতে একজন রাজসভার প্রহরী পেতলের বর্শা হাতে ওদের কাছে এল।

—চলুন—আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি।

দ্বারীর সঙ্গে ওরা চলল। প্রাসাদের দক্ষিণ কোণায় প্রহরী একটা তালাবন্ধ ঘরের তালা খুলল। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। পাথর আর কাঠ দিয়ে ঘরটা তৈরি। ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেয় কাঠের বড় তক্তার ওপর বিছানাপত্র পাতা। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। হ্যারি প্রহরীকে বলল—খাবার সময় আমাদের ডেকো। প্রহরীটি মাথা ওঠানামা করে চলে গেল।

এবার হ্যারিও বসল। শাঙ্কো ঘরে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তোমার কি মনে হয়? রোমান সম্রাট মাতিসের রাজকোষ ঐ জিরাল্ডা টাওয়ারেই আছে? ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়েই বলল—নিশ্চয় আছে। সেই গভীর রাতে সম্রাট ঐ টাওয়ারে গিয়েছিলেন কোষাগার গোপনে লুকিয়ে রাখার জন্য। খাতিবের প্রপিতামহকে আর একজন মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য কর সম্রাট মাতিস অন্য কাউকে নিয়ে যান নি। নিয়ে গেলেন দুজন অভিজ্ঞ রাজ মিস্ত্রিকে। কাজেই ঐ টাওয়ারের কোথাও রাজকোষ লুকোবার জায়গা ওদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে রাজকোষ লুকিয়ে রেখেছিলেন।

হ্যারি বলল—কিন্তু ঐ টাওয়ারের সব সিঁড়িই তো ভেঙে ফেলা হয়েছে। উঠবে কী করে?

—হ্যারী, বেশি ভাবতে পারছি না। ভীষণ খিদে পেয়েছে। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন প্রসাদরক্ষী ফ্রান্সিসদের খেতে ডাকল। প্রাসাদরক্ষী ফ্রান্সিসদের প্রাসাদের খাবার ঘরেই নিয়ে এল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। টেবিলে ফিকে নীল রঙের কাপড়ের ঢাকনা। প্লেট ছুরি কাটা চামচ ঝক্‌ঝক্ করছে। তখনই মারিয়া ঢুকল। বলল—আমি বলেছি যে দিনের বেলার খাবার আমি তোমাদের সঙ্গে খাবো। খেতে বলে মারিয়ার মনে পড়ল ওদের প্রাসাদের খাবার ঘরের কথা। মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। ও গম্ভীর মুখে খেতে লাগল। পাশেই খেতে খেতে ফ্রান্সিস বুঝল সেটা কিছু বলল না।

হঠাৎ মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়া তখন হাতের উল্টো পিঠে চাখ মুছছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া আমাদের জীবনটাই এমনি। কখনও বারোয়ারি অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কখনও কয়েদখানার নোংরা পরিবেশ কখনও এইরকম সাজানো গোছানো সুন্দর ঝকঝকে পরিবেশ। আমাদের জীবনে দুটোই সত্যি। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—কেঁদো না। আমার মন দুর্বল করে দিও না। মারিয়া চোখের জল মুছতে মুছতে হাসল। বলল—আর কাঁদবো না।

খেয়ে দেয়ে ফ্রান্সিসরা ঘরে ফিরল। মারিয়া অন্দর মহলে চলে গেল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বলল—অনেকদিন এত সুস্বাদু খাবার খাই নি। হ্যারি বলল—ভালো খাবারের স্বাদই ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যারি আর শাঙ্কো বসল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—বলেছিলাম না পেটপুরে খেলেই আমার

বুদ্ধি খুলবে।

হ্যারি হেসে বলল—তোমার বুদ্ধি কী বলছে?

ফ্রান্সিস হেসে বলল—বুদ্ধি বলছে এখনও তোমার ভাবনার শেষ হয় নি। আরো ভাবো।

ওরা যখন কথাবার্তা বলছে তখনই সেই প্রহরীটি এল। বলল—সেনাপতি মশাই আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না জানতে।

ফ্রান্সিস বলল—গিয়ে বলো যে আমাদের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। উনি যেন একবার আসেন। প্রহরীটি চলে গেল।

একটু পরে সেনাপতি বেশ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এল। বলল—আপনাদের কী অসুবিধে হচ্ছে?

—বিশেষ কিছু না। আমাদের এবার দুটো জিনিস চাই। বেশ লম্বা একগাছা কাছি নয় তো দড়ি। শক্ত দড়ি। ধরে ওঠানামা করা যায় এমনি। অন্যটা হল একটা বড় লাঠি মত। এটা কাঠের টুকরোয় জোড় দিয়ে করা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—কাছি বা দড়ি দেখছি পাওয়া যায় কি না। তবে লাঠির মত যেটা করতে বলছেন সেটা আমাদের কাঠের মিস্ত্রিকে বলুন সে তৈরি করে দেবে। আর কিছু? প্রহরীটি বলল।

—না শুধু এই। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি চলে গেল।

একটু পরে কাঠের মিস্ত্রি এল।

ফ্রান্সিস তাকে বলল—তুমি তো ঐ জিরাল্ডা মিনারটা দেখেছো।

—হ্যাঁ ও তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। মিস্ত্রি হেসে বলল।

—ঐ মিনারের ঠিক মাঝামাঝি পর্যন্ত ওঠে এরকম একটা লাঠি তৈরি করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মিস্ত্রি একটু ভেবে নিয়ে বলল—তা করা যাবে।

—তাহলে আজকেই লেগে পড়ো কাল দুপুর নাগাদ ওটা আমার চাই। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন দুপুর নাগাদ মিস্ত্রি এল। বলল দেখে যান কাঠের লাঠিটা ঠিক বানানো হল কিনা। ফ্রান্সিসরা ঘরে থেকে বেরিয়ে এল। দেখল লম্বা কাঠ জোড়া দিয়ে দিয়ে বেশ বড় একটা কাঠের লাঠি মিস্ত্রি তৈরি করে প্রাসাদের চত্বরে রেখেছে। ফ্রান্সিস দেখল। টাওয়ার আর তার কাছেই চেস্টনাট গাছের উচ্চতাটা হিসেব করল। বলল—ঠিক আছে। তারপর লাঠিটার মাথা দেখিয়ে মিস্ত্রিকে বলল—ঐ চেস্টনাট গাছটা থেকে গুলতির মত জোড়া ডাল কেটে আন। তারপর সেটাকে লাঠির মাথায় পেরেক দিয়ে ঠুকে গুলতির মত কাটা ডালটা লাগিয়ে দাও।

মিস্ত্রি চলল টাওয়ারের কাছে অনেকটা উঁচু চেস্টনাট গাছটার দিকে। ডাল কেটে এনে গুলিতর মত লাঠির মাথায় লাগিয়ে দিল।

এমন সম দেখা গেল চারজন সৈন্য একটা দড়ির কুণ্ডলি নিয়ে আসছে। সেটা জিরাল্ডা টাওয়ারের নিচে রাখা হল।

দুপুরের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা টাওয়ারের নিচে এল। মারিয়াও অন্দরমহল থেকে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—শোন—আমি গাছটার মগ ডালে উঠি। তোমরা আন আমাকে লাঠিটা দেবে। লাঠিটার মাথায় গুলতি মত জায়গায় দড়ির একটা মুখ আটকে দেবে। আর দড়ির মাথায় পাথরের ছোট চাঙ বেঁধে দেবে। আমি গাছে উঠছি?

ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছের কাণ্ড ধরে ধরে উঠল। তারপর খুব সহজেই ডাল ধরে ধরে একেবারে মগডালে উঠে গেল। এবার নিচে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—শাঙ্কো, দড়ির একটা মুখ দাও।

শাঙ্কো তৈরি ছিল। লাঠির মাথায় গুলতির মুখটাতে দড়ির একটা মুখ আটকাল। তারপর হ্যারি আর মারিয়ার সাহায্যে লাঠিটা গাছের মগডাল পর্যন্ত তুলল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে লাটিঠা ধরল। দড়ি পরানো অবস্থায় ও লাঠিটা টাওয়ারের মাথার কাছে তুলল। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিতেই লাঠির মাথা থেকে দড়িবাঁধা পাথরের চাঙরটা টাওয়ারের মধ্যে পাথরের দেওয়ালে ঘা খেয়ে নিচে পড়ে গেল। টাওয়ারে গম্ভীর শব্দ উঠল ঢাং-ঢাং।

ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছ থেকে মেঝে এল। টাওয়ারের মধ্যে ঢুকল। দড়ি বাঁধা পাথরটা পড়ে আছে। হ্যারিরা এগিয়ে এল। হ্যারি হেসে বলে উঠল—সাবাস্ ফ্রান্সিস। মারিয়া হেসে বলল—তোমার মাথায় এতও আসে।

এবার ফ্রান্সিস দড়ির মুখ থেকে পাথরের চাঙরটা খুলে ফেলল। তারপর দড়িটা টানতে লাগল। একসময় টাওয়ারের মাথা থেকে চেস্টনাট গাছ পর্যন্ত দড়িটা টানটান হয়ে গেল। ফ্রান্সিস দড়ি ধরে টান দিল বার কয়েক। দেখা গেল চেস্টনাট গাছের কাণ্ডে বাঁধা দড়িটা টাওয়ারের মুখ দিয়ে নেমে বেশ শক্ত হল টান টান হয়ে আছে।

ফ্রান্সিস এবার দড়ি টেনে ধরে উঠতে লাগল। টাওয়ারের দেয়ালের গায়ে সারা জানালার মত চৌকোণো ফোকর আছে মাঝে মাঝে। চৌকোনা ফোকরে গরাদ নেই। ওগুলো থেকে কিছু আলো টাওয়ারের ভেতরে আসছে। তবু টাওয়ারের ভেতরের অন্ধকার কাটে নি।

ফ্রান্সিস উঠতে লাগল।

ওদিকে রোমান সম্রাট মাতিসের গুপ্ত কোষাগার একজন বিদেশী উদ্ধার করার চেষ্টা করছে—এই খবর রটে গেল। দলে দলে লোকজন এসে টাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। ততক্ষণে রাজা ফার্নান্দোও এসেছেন। প্রাসাদ থেকে একটা আবলুস কাঠের আসন নিয়ে আসা হল। রাজা ফার্নান্দো বসলেন তাতে। দুজন অমাত্য রাজাসনের দুপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস টাওয়ারে আস্তে আস্তে উঠে ওপরে উঠে পড়ল। টাওয়ারের মাথায় বসে দড়িটা ধরে থাকল। নিচের দর্শকরা মহা উৎসাহে হাততালি দিল। এবার

আসল কাজ। ফ্রান্সিস টাওয়ারের মুখটায় উঠে দাঁড়াল। দেখল পাথরের গোল মুখটা। সিঁড়িগুলো ভেঙে ফেলেও কোষাগার পাওয়া যায় নি। তাহলে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে রাজকোষ? ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল গোল মুখটা। দেখল ওপরে একটা পাথরের ধাপ আছে। সম্রাট মাতিস এখানে কোথাও রাজকোষ লুকিয়ে রেখেছেন। এ সিঁড়িগুলো ভেঙে ফেলেও কোথাও রাজকোষ পাওয়া যায় নি। ফ্রান্সিস পাথরের ধাপটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। অল্প আলোতেও ফ্রান্সিস হঠাৎ দেখল পাথরের ধাপটায় তিন রঙের তিনটি পাথরের পাটা—কালো কষ্টিপাথর, শ্বেতপাথর আর হলদেটে রঙের পাথরের তিনটি পাটা। মিনারে যদি নকশা করার উদ্দেশ্য হত তাহলে বাইরের দিকে করা হত। ভেতরের নকশা কে দেখতে আসবে?

ফ্রান্সিস তিন রঙের পাথরের পাটায় হাত বুলোল। বুঝল এই পাথর তিনটি পরে গাঁথা হয়েছে। আগের তিনটি পাথর খুলে ফেলে সেখানে এই তিনরঙা পাথরের পাটা গেঁথে রাখা হয়েছে। জোড়ে মেলে নি। তাই তিনটি পাথরই একটু বেরিয়ে আছে। এই তিনটি পাথর খুলতে পারলে সম্রাটের গুপ্ত ধনভাণ্ডার দেখা যাবে। এখানে ছাড়া অন্য কোথাও গুপ্ত রাজকোষ রাখা হয়নি।

এবার তিনটি পাথর খুলে ফেলতে হবে। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে রোমান সম্রাট মাতিসের গুপ্ত রাজকোষ। ফ্রান্সিস টাওয়ারের মাথায় বসল। কোন রকমে হাত বাড়িয়ে কষ্টিপাথরটা টানল। কয়েকবার হ্যাঁচকা টান দিতে পাথরটা একটু নড়ল। ওরকম শুধু টানাটানি করে ঐ তিনটি পাথর খুলে ফেলা যাবে না।

নিচের দিকে মুখ নামিয়ে ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো—ও—ও। ডাকের শব্দটা টাওয়ারের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। শাঙ্কো নিচে থেকে বলল—বলো—শুনছি।

ফ্রান্সিস কথাটা শুনতে পেল। বলল—একটা কুড়ুল নিয়ে এখানে উঠে এসো।

একটু পরেই একটা কুড়ুল কোমরে গুঁজে দড়ি বেয়ে বেয়ে শাঙ্কো উঠে এল। শাঙ্কোর হাত থেকে ফ্রান্সিস কুড়ুলটা নিল। দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। দড়িতে দুপা জড়িয়ে একটু আলগা হয়ে কষ্টিপাথরে কুড়ুলের ঘা মারল। কুড়ুলের ঘায়ে মিনারে শব্দ উঠল—গম্—গম্।

ফ্রান্সিস আরো কয়েকবার ঘা মারলো। কষ্টিপাথরটা ভাঙল না। ক্লান্ত ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো কুড়ুলটা নাও। মনে হচ্ছে কষ্টিপাথরটা ভাঙা যাবে না। ঠিক খাঁজে খাঁজে মারো। শাঙ্কো কুড়ুল নিল। দড়িতে পা জড়িয়ে ভারসাম্য রেখে কষ্টিপাথরটার খাঁজে খাঁজে কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। কষ্টিপাথরটার একটা কোণা ভেঙে পড়ল। আরো কটা ঘা মারতে কষ্টিপাথরের অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে গেল। খোঁদল হল। খোঁদলের মধ্যে দেখা গেল রূপোর সুতোয় প্যাঁচানো একটি দড়ি। শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ফ্রান্সিস—একটা দড়িমত দেখা যাচ্ছে।—তুমি উঠে এসো। আমি দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো উঠে এল। মিনারের মুখে বসল। ফ্রান্সিস বলল—কষ্টিপাথর ভেঙেছে।

এখন বাকি দুটো পাথর সহজেই বের করা যাবে।

এবার ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ঝুলে কষ্টিপাথরটায় কটা কুড়ুলের ঘা মারতেই কষ্টিপাথর ভেঙে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। দেখল একটা দড়ি। দড়িটা রূপোর সূতোর কাজ করা। ফ্রান্সিস দড়িটা ধরে টানল। কিন্তু দড়িটা বেরিয়ে এল না। ওটার পরেই শ্বেতপাথরের পাটা। ফ্রান্সিস সেটায় কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। শ্বেতপাথরটার মাঝামাঝি ভেঙে পড়ে গেল। দেখা গেল একটা বড় চামড়ার থলির মুখ।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—সম্রাট মাতিসের গুপ্ত কোষাগার আমাদের সামনে। ফ্রান্সিসের কথাটা টাওয়ারের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। নিচে দাঁড়ানো লোকেদের কানেও গেল রাজাও শুনলেন। মারিয়া রাজার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। মারিয়া হেসে দুহাত তুলে বলে উঠল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস শ্বেতপাথরের বাকি অংশটা ভেঙে ফেলল। বড় ক্লান্ত লাগছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো হলদেটে পাথরটা ভাঙো। ফ্রান্সিস মিনারের মুখটায় উঠে বসল। শাঙ্কো দড়ি ধরল। পা দিয়ে দড়িটা জড়িয়ে হলদেটে পাথরটায় কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। সেটাও ভেঙে গেল। দেখা গেল একটা সুদৃশ্য চামড়ার বড় থলি। মুখটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। ফ্রান্সিস থলেটা ধরে জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। হলদেটে পাথরের বাকিটা ভেঙে পড়ে গেল। শাঙ্কো বলে উঠল—সাবাস ফ্রান্সিস। দুজনে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। নিচে মারিয়াও ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো টাওয়ারের মাথায় বসল। ফ্রান্সিস থলেটার দড়ি আলগা করে হাত ঢোকাল। একমুঠো তুলে আনল। মণিমুক্তো হীরের টুকরো। বিকেলের নিস্তেজ আলোতে সব ঝিকিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস সব থলেতে রেখে দিল। বলল—শাঙ্কো চলো নামি।

দুজনে দড়ি ধরে ধরে নেমে এল।

চামড়ার থলে হাতে ফ্রান্সিস নেমে আসতেই হ্যারি হাসতে হাসতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি আর শাঙ্কো ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস রাজা ফার্নান্দোর দিকে এগিয়ে গেল। থলিটা রাজাকে দিল। রাজা মুখ বাঁধা দড়িটা খুলে থলিটার মুখ খুলল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন একমুঠো মণিমাণিক্য। সেগুলো রোদ লেগে ঝিকঝিক করতে লাগল।

রাজা এবার ফ্রান্সিসকে বললেন—তোমরাই সম্রাট মাতিসের রাজকোষ উদ্ধার করেছো। বলো—তোমরা কী চাও?

ফ্রান্সিস হেসে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা কিছুই চাই না। শুধু বলি—আপনার প্রজাদের কল্যাণে এই ধনসম্পদ ব্যয় করুন। এটাই আমাদের অনুরোধ।

ফ্রান্সিসরা রাজা ফার্নান্দোর কাছ থেকে বিদায় নিল। চলল হুয়েনভা বন্দরের দিকে যেখানে ওদের বন্ধুরা আর ওদের জাহাজ আছে।

রত্নহার উদ্ধারে ফ্রান্সিস

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে ওদের দেশের দিকে। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা খুব খুশি। আকাশে মেঘ নেই। জোর বাতাস বইছে। ভাইকিংরা সব পাল খুলে দিয়েছে। বেগবান বাতাসে পালগুলো যেন বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। খুব দ্রুত গতিতে জাহাজ ঢেউ ভেঙে চলেছে। এখন আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। ভাইকিংরা জাহাজের এখানে-ওখানে দল বেঁধে বসেছে। ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে। গল্পগুজব করছে। বেশিরভাগই দেশের কথা। দেশের আত্মীয়স্বজন অবাক হয়ে শুনবে ওদের এই অভিযানের বিচিত্র কাহিনী। এসব নিয়েই কথা হচ্ছে।

তখন বিকেল হয়েছে। সূর্য অস্ত যায়নি। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য অনেকটাই ঢলে পড়েছে। হঠাৎই মাস্তুলের মাথা থেকে নজরদার পেড্রোর চিৎকার করে বলা কথাটা শোনা গেল। "ভাইসব, সাবধান। ঝড় আসছে।" পেড্রো দড়িদড়া ধরে দ্রুত মাস্তুল বেয়ে নামতে লাগল। বিস্কো ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। পেড্রো ফ্রান্সিসের কাছে এল। পেড্রো তখনও হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ফ্রান্সিস, ঝড় আসছে। ওপর থেকে দেখলাম দক্ষিণ দিকে কালো মেঘ জমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় উঠবে।"

পেড্রো জাহাজের অভিজ্ঞ নজরদার। ওর অনুমান ঠিকই হবে। ঝড় আসার আর একটা লক্ষণও দেখা গেল। বাতাস পড়ে গেছে। পালগুলো নেতিয়ে পড়েছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, ঝড় আসছে। ডেকে এসে নিজের নিজের জায়গা নাও। পাল নামিয়ে ফেলো। ঝড়ের মোকাবিলা করতে সবাই তৈরি হও।"

ভাইকিংরা ডেকে কিছুটা অন্তর অন্তর পালের খুঁটির দড়িদড়া ধরল। ঝড়ের সময় দাঁড় বেয়ে কোনও লাভ নেই। তাই দাঁড় ঘরে কেউ গেল না। ডেকে তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে এল। বলল, "ঝড়ের মেঘ উঠেছে। আর কিছুক্ষণ মধ্যেই ঝড় আসবে। তুমি তৈরি তো?"

ফ্লেজার বলল, "হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি দিক ঠিক রাখতে চেষ্টা করব। ঝড়ের ধাক্কায় জানি না কতটা সফল হব।"

ফ্রান্সিস বলল, "এটা ভূমধ্যসাগর এলাকা। এখানে কয়েকবার ঝড়ের মুখে পড়েছি। দেখেছি এখানে প্রচণ্ড ঝড় হয় না। তবু তৈরি হও। দিক ঠিক রাখো।"

দু'জনে যখন কথা বলছে তখনই হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল। গুমোট ভাবটা আর রইল না। বাতাসের জোর বাড়তে লাগল। ঘন কালো মেঘ দক্ষিণের আকাশ থেকে মধ্য আকাশের দিকে উঠে আসতে লাগল। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল। কালো মেঘের মধ্যে শুরু হল আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠা। সেই সঙ্গে বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। সমুদ্রের জলে বড় বড় ঢেউ তুলে ঝড় ছুটে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। ঝড়ের ধাক্কায় ফ্রান্সিসদের জাহাজ বেগে দুলতে লাগল। ঝোড়ো বাতাসে জলের ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ডেকে। ভাইকিংরা দড়িদড়া টেনে ধরে জাহাজকে সোজা রাখার চেষ্টা করতে লাগল। অল্প অল্প বৃষ্টির পর এখন শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি পড়া। জাহাজ কখনও ঢেউয়ের মাথায় উঠে পড়তে লাগল। তারপরেই দুই ঢেউয়ের মধ্যে নিচে নেমে আসতে লাগল। জাহাজের এই ওঠাপড়ার সঙ্গে ভাইকিংরা জাহাজকে সোজা রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ফ্রান্সিসদের সৌভাগ্য বলতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি কমে এল। তারপর থেমে গেল। বাতাসের বেগও কমতে লাগল। আকাশে ধোঁয়ার মতো কালো মেঘ উত্তরমুখো উড়ে যেতে লাগল। তারপরেই আকাশে আর মেঘ নেই। ফুলের মতো তারা ফুটতে লাগল। আধভাঙ্গা চাঁদ থেকে উজ্জ্বল আলো সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে পড়ল।

এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ভাইকিংরা অবসন্ন হল। সপ্‌সপে ভেজা পোশাক গায়ে তারা ডেকে বসে রইল কয়েকজন। বাকিরা ডেকে শুয়ে রইল। জলে ভেজা পোশাক গায়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে এল। বলল, "ফ্লেজার, আমাদের দিক ভুল হয়নি তো?"

"ঝোড়ো বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় দিক ঠিক রাখতে পারিনি। একবার এদিকে আর একবার ওদিকে জাহাজটা যেন ছিটকে পড়েছে। দিকটিক সব গুলিয়ে গেছে।" ফ্লেজার বলল।

"তা হলে এখন কী করবে?" ফ্রান্সিস বলল।

"জাহাজ যে মুখো চলছে চলুক। দ্বীপ বা দেশ যাই হোক সেখানে পৌঁছতে হবে। তবেই দেখেশুনে দিক ঠিক করতে পারব।" ফ্লেজার বলল।

"বেশ, জাহাজ চলুক। দেখা যাক কোনও দ্বীপ বা দেশে পৌঁছনো যায় কিনা।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর কেবিনঘরে যাবে বলে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল।

হ্যারি এগিয়ে এল। সঙ্গে আরও কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু। হ্যারি বলল, "এখন কী করবে?"

ফ্লেজারের সঙ্গে যা কথা হল সেসব ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল, "এখন আমাদের কিছুই করবার নেই। জাহাজ যেমন চলছে চলুক।"

সন্ধে হল। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় ওর বসার জায়গায় বসে আছে। চারদিকে নজর রাখছে কোনওদিকে ডাঙা দেখা যায় কিনা। আবার নজর রাখছে জলদস্যুদের জাহাজ আসছে কিনা তার দিকেও।

রাত হল। চাঁদের উজ্জ্বল আলো সমুদ্রে ছড়াল। সমুদ্র বেশ দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সাদাটে কুয়াশা নেমে এলে অবশ্য বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। কুয়াশার অস্পষ্টতার মধ্যে দিয়েও পেড্রোর নজরে পড়ল ডাঙা। ও চিৎকার করে বলে উঠল, "ডাঙা, ডাঙা দেখা যাচ্ছে।" কথাটা কানে যেতেই ডেকের ওপর যারা শুয়ে বসে ছিল তারা উঠে দাঁড়াল। জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। ডাঙা তখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে কোনও টিলা বা ছোট পাহাড় নেই। সমতলভূমি সমুদ্র থেকে উঠে গেছে। দুটো জাহাজ নোঙর করে আছে দেখা গেল।

ততক্ষণে ফ্রান্সিস হ্যারি ডেকে উঠে এসেছে। সঙ্গে মারিয়া। হ্যারি জাহাজ দুটো দেখতে দেখতে বলল, "একটা যুদ্ধজাহাজ, অন্যটা মালবাহী জাহাজ।"

ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী করবে এখন?"

ফ্রান্সিস বলল, "ফ্লেজারকে জাহাজ থামাতে বলো।" একজন ভাইকিং-বন্ধু ফ্লেজারকে সে-কথা বলতে গেল।

ডেকে জড়ো হওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল, "ভাইসব, আমরা ওই জাহাজঘাটায় এখন জাহাজ ভেড়াব না। অচেনা অজানা জায়গা। সব আগে দেখেশুনে তারপর যা করবার করব। এখন জাহাজ এখানেই নোঙর করো। পরে ভাবব কী করা যায়।"

ততক্ষণে জাহাজ থেমে গেছে। ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হল। থেমে থাকা জাহাজ ঢেউয়ের ধাক্কায় দোল খেতে লাগল। হ্যারি বলল, "ডাঙায় জাহাজ না ভেড়ালেও কোথায় এলাম তা তো জানতে হবে।"

ফ্রান্সিস বলল, "এজন্যেই রাত একটু বাড়লে তুমি, শাঙ্কো আর আমি আমাদের নৌকোয় চড়ে ওখানে যাব। লোকজনদের জিজ্ঞেস করে জানব, এই জায়গাটা কি কোনও দ্বীপ না দেশ। এটা জানতে পারলে আমাদের দেশ কতদূর সেটা বুঝতে পারব। এবার চলো রাতের খাওয়া খেয়ে নিই।"

মারিয়া বলল, "এখানে কারা থাকে, কী রকম মানুষ তারা, সেসব তো তোমরা কিছুই জানো না।"

ফ্রান্সিস বলল, "উপায় নেই, এই ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে।"

ফ্রান্সিসরা রাতের খাওয়া একটু আগেই খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে বলল, "তোমরা এখন শুয়ে বিশ্রাম করে নাও। আমি সময়মতো তোমাদের ডাকব।"

রাত বাড়তে লাগল। তখন মধ্যরাত্রি। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল। কোমরের ফেট্টিটা ভাল করে বাঁধল। তরোয়াল ঝোলাল। মোমের আলোয়

দেখল মারিয়া উঠে বসেছে। ফ্রান্সিস বলল, "তুমি রাত জেগো না। ঘুমিয়ে পড়ো।"

মারিয়া ম্লান হেসে বলল, "তোমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে যাচ্ছ, আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোব, এটা কি হয়?"

ফ্রান্সিস বলল, "যাতে বিপদে না পড়ি তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না।"

ফ্রান্সিস তৈরি হয়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকতে। হ্যারি তরোয়াল নিল। শাঙ্কো নিল তীরধনুক। তিনজনে জাহাজের ডেকে উঠে এল। সমুদ্র থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এসে ওদের গায়ে লাগল।

ফ্রান্সিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। অত রাতেও বেশ কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। হালের কাছে দড়ির মই বেয়ে হ্যারি আর শাঙ্কো ছোট নৌকোটায় নেমে এল। ফ্রান্সিস নামবার আগে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনও ভয় নেই, আমরা নিরাপদেই ফিরে আসব। এখন থেকে ফ্লেজারের কথামতোই তোমরা চলবে।"

ফ্রান্সিস নৌকোয় নেমে দাঁড় তুলে নিল। শাঙ্কো জাহাজে বাঁধা নৌকোর দড়িটা খুলে দিল। একটা পাক খেল নৌকোটা। ফ্রান্সিস ডাঙার দিকে লক্ষ্য রেখে দাঁড় বাইতে লাগল।

চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। সমুদ্রে ঢেউয়ের মাথায় সেই আলো নাচছে। নৌকো চলেছে তীরের দিকে। সমুদ্রে কখনও কুয়াশা জমছে, কখনও জোর হাওয়া কুয়াশা উড়িয়ে দিচ্ছে।

তীরের কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল, বন্দর, জাহাজ বেশ দূরে। কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নৌকো তীরে লাগল। তিনজনে নৌকো থেকে নামল। তীর এদিকটা ঢালু। তিনজনে ঠেলে নৌকোর অর্ধেকটা তীরে তুলে রাখল, যাতে ভেসে না যায়। ঢালু তীর দিয়ে ওরা উঠে এল। দেখল, বিস্তৃত প্রান্তর। এদিকে বাড়িঘর নেই। বাড়িঘর সব বন্দরের দিকে। প্রান্তরের শেষে ঝোপজঙ্গল। ফ্রান্সিস বলল, "চলো, ওই বন্দরের দিকে—ওই বাড়িঘরের দিকে।"

তিনজনে চলল। ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। হেঁটে চলল ওরা। বনজঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই শুনল, অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ। বনজঙ্গলের মধ্য থেকে চারজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত পায়ে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল, ওদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম, হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস বুঝল, এরা আরবি সৈন্য। ফ্রান্সিসরা কিছু বোঝার আগেই সৈন্য চারজন ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দ্রুত হাতে তরোয়াল খুলল। সৈন্যদের প্রথম আক্রমণটা ঠেকাল।

এবার শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। শাঙ্কো তার আগেই কয়েক পা পেছনে সরে এল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল, "শাঙ্কো, মেরো না, আহত করো।" শাঙ্কো ততক্ষণে ধনুকে তীর পরিয়েছে। হ্যারির সঙ্গে লড়াই করছে যে সৈন্যটা, শাঙ্কো তাকেই নিশানা করল। হ্যারির শরীর দুর্বল। ও বেশিক্ষণ লড়তে পারবে না। শাঙ্কো তীর ছুড়ল। সৈন্যটার ডান হাতে তীরটা বিঁধে গেল। তরোয়াল ফেলে সৈন্যটি মাটিতে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস তখন তিনজন সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করছে। ফ্রান্সিসদের মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই, গায়ে বর্মও নেই। শুধু মনের জোরে ফ্রান্সিস লড়াই করতে লাগল। ততক্ষণে শাঙ্কো আরও একটা তীর ছুড়েছে। তীরটা লাগল যুদ্ধরত এক সৈন্যের পায়ে। সৈন্যটি মাটির ওপর বসে পড়ল। বাকি দু'জনের একজনকে ফ্রান্সিস এবার ঘায়েল করল। তরোয়ালের কোপে তারা হাত কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। তখন দু'জন সৈন্য গলা ছেড়ে চিৎকার করে কী বলে উঠল। আরবি ভাষা। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না।

ফ্রান্সিস দেখল, বনজঙ্গলের দিক থেকে প্রায় পনেরো-বিশজন সৈন্য ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস লড়াই থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁফাতে লাগল। সৈন্যটিও আর ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করল না। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

সেই সৈন্যরা ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন সর্দার গোছের সৈন্য ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল, "তোমরা কারা?" ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না।

হ্যারি স্পেনীয় ভাষায় বলল, "স্পেনীয় ভাষায় বলুন।"

সেই সৈন্যটি এবার ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল, "তোমাদের পরিচয় কী? তোমরা কেত্থেকে এসেছ?"

হ্যারি বলল, "আমরা ভাইকিং। অনেক দূরে আমাদের দেশ।"

"সে তো তোমাদের দেখে, পোশাক দেখে বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আমাদের সৈন্যদের মারলে কেন?"

ফ্রান্সিস বলল, "আপনার সৈন্যরা এসেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আত্মরক্ষার জন্যেই আমাদের লড়তে হয়েছে। নইলে এখানে আমাদের মৃতদেহ পড়ে থাকত।"

"তোমাদের বার্বারদের গুপ্তচর ভেবেই আমাদের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।" সর্দারটি বলল।

"বার্বার কারা আমরা জানি না।" হ্যারি বলল।

"যাকগে," সর্দারটি বলল, "আমাদের তিনজন সৈন্যকে তোমরা আহত করেছ। তোমাদের বন্দি করা হল।"

"আমরা আক্রান্ত হয়েই আক্রমণ করেছি।" হ্যারি বলল।

"এসব কালকে আমাদের শস্ত মিনকে বোলো। তিনি বিচার করে যা হুকুম

দেবেন তাই আমাদের মানতে হবে।" সর্দারটি বলল। তারপর হাত তুলে বন্দরের দিকটা দেখিয়ে বলল, "চলো সব।" ফ্রান্সিসদের নিয়ে সব সৈন্য চলল।

যেতে যেতে হ্যারি সেই সর্দারকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি কোনও দ্বীপ না দেশ।"

সর্দার বলল, "দ্বীপ নয়, এটা উত্তর আফ্রিকা। আমাদের ভাষায় নাম আল-মেঘারি। বার্বাররা এই দেশকে আলজিরিয়া বলে।"

"এই বন্দর শহরের নাম কী?" শাঙ্কো বলল।

"সিউত্তা", সর্দারটি বলল।

সিউত্তার পথে নামল সবাই। চলল পুবমুখো। দু'পাশে বাড়িঘরদোরে কোথাও আলো নেই। সবাই ঘুমিয়ে। অন্ধকার পথে ওরা চলল।

একটা লম্বাটে পাথরে তৈরি ঘরের সামনে এসে সর্দার দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল এই ঘরটাই কয়েদঘর। ঘরটার লোহার দরজার দু'পাশে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা গেল দু'জন পাহারাদার সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। সর্দারটি এগিয়ে গেল। পাহারাদারদের কী বলল। একজন পাহারাদার কোমরে ঝোলানো চাবির থোকা থেকে একটা চাবি বের করল। তালা খুলল। ঢঢাং-ঢন শব্দ তুলে লোহার দরজাটা খুলে দিল। সর্দারটি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার ইঙ্গিত করল। ওরা মাথা নিচু করে কয়েদঘরে ঢুকল। আবার শব্দ তুলে লোহার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে দুটো মশাল জ্বলছে। সেই আলোতে ফ্রান্সিস দেখল ঘরটা লম্বামতো। কয়েদঘর যেমন হয় এই ঘরটাও তেমনই। ছাদটা কাঠ আর শুকনো লম্বা লম্বা ঘাসে তৈরি। অনেক ওপরে দুটো জানলা। জানলায় শিক বলে কিছু নেই। খোঁদল বললেই হয়। মেঝেয় দড়িদড়া দিয়ে শুকনো ঘাস বেঁধে বিছানা করা। তাতে একপাশে আট-দশজন লোক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দরজা খোলার শব্দে দু'-একজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারা ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল, আগের বন্দিদের হাত বাঁধা নয়। ও নিশ্চিন্ত হল যে, ওদেরও হাত বাঁধা হবে না।

হ্যারি আর শাঙ্কো ক্লান্তিতে বিছানায় বসেই শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বসল। শুয়ে পড়ল না। ওর কানে পাখির ডাক ভেসে এল। বাইরে ভোর হল বোধ হয়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। তখনই ফ্রান্সিস মৃদু গোঙানির শব্দ শুনল। কে গোঙাচ্ছে? ফ্রান্সিস তাকাল সেইদিকে। দেখল একটা লোক। এখানকার লোকেদের মতো ঢোলা হাতা জোব্বামতো পরা। বিছানার বাইরে পাথরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। হাত দুটো ঝুলে পড়েছে। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। একটু থেমে আবার গোঙাতে লাগল লোকটা।

ফ্রান্সিসের কেমন কৌতূহল হল। ভাবল কে লোকটা? এরকম গোঙাচ্ছে কেন? কে মেরেছে ওকে? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘাসের বিছানা থেকে নেমে

লোকটার পাশে গিয়ে পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। দেখল লোকটার গায়ে জামা বলে কিছু নেই। লোকটা গোঙানি থামিয়ে মুখ তুলে ফ্রান্সিসকে দেখল। ফ্রান্সিস দেখল লোকটার মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় উড়ো-উড়ো কাঁচাপাকা চুল। লোকটা এবার মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "নতুন আমদানি।" আরবি ভাষা। ফ্রান্সিস বুঝল না। স্পেনীয় ভাষায় বলল, "আমি আরবি ভাষা জানি না।"

লোকটা এবার স্পেনীয় ভাষায় বলল, "অল্পস্বল্প জানি।"

ফ্রান্সিস বলল, "তুমি গোঙাচ্ছ। তোমার কি শরীর খারাপ?"

"চাবুকের ঘা খেয়ে কি লোকের শরীর ভাল হয়?" লোকটা বলল।

"তা তো বটেই।" ফ্রান্সিস বলল, "কিন্তু তুমি তো ওই ঘাসের বিছানায় গিয়ে শুতে পারো।"

লোকটা দেওয়াল থেকে আস্তে আস্তে পিঠটা তুলে বলল, "আমার পিঠটা দ্যাখো।" মশালের আলোয় লোকটার পিঠের অবস্থা দেখে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। সারা পিঠে চাবুক মারার দাগ। দু'-এক জায়গায় চাবুক কেটে বসে গেছে। রক্ত জমে আছে।

ফ্রান্সিস বুঝল পিঠে এরকম ঘা আর দাগ নিয়ে ঘাসের বিছানায় শোয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল, "তোমাকে কে এরকম নির্দয়ভাবে চাবুক মেরেছে! কেনই বা মেরেছে?"

"সে অনেক কথা?" লোকটা আস্তে আস্তে বলল।

"তোমার নাম কী?" ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

"আমার নাম জিতা।" লোকটা বলল।

"এবার সব খুলে বলো তো।" ফ্রান্সিস বলল।

"কী হবে এসব শুনে! তুমিও তো আমার মতোই বন্দি।" জিতা বলল।

"আমি তোমাকে এই বন্দিজীবন থেকে মুক্তি দেব।" ফ্রান্সিস বলল।

জিতা চমকে উঠে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। বলল "মিনের এই কয়েদঘর থেকে পালানো অসম্ভব!"

"ঠিক আছে, সেটা পরে ভাবা যাবে।" ফ্রান্সিস বলল।

একটু থেমে বলল, "এই মিন কে? আমাকে সব বলো। তোমার কোনও ভয় নেই।" জিতা বলতে শুরু করল, "প্রায় দুশো বছর আগের কথা। এই মেঘারিব-এ রাজত্ব করতেন এক বার্বার জাতির রানি তুহিনা। এক আরব দলনেতা বেনি এই দেশ আক্রমণ করল।" একটু থেমে জিতা বলল, "এবার আমাদের কথা বলি। আমরা জিতা পরিবার বংশানুক্রমে বৈদ্য চিকিৎসক। আর এক চিকিৎসক পরিবার এই সিউতাতে আছে। বেন্দিতো পরিবার। রানি তুহিনা যুদ্ধে ভীষণ আহত হলেন। সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে যায় অয়েস পাহাড়ে রানির দুর্গে। সেই দুর্গে রানির চিকিৎসার জন্যে আমাদের পূর্বপুরুষ জিতাকে নিয়ে

যাওয়া হয়। অন্য চিকিৎসক বেন্দিতো পরিবারের পূর্বপুরুষকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দু'জন বৈদ্যই রানির চিকিৎসা করেছিল। কিন্তু রানির তখন শেষ অবস্থা। মৃত্যুর আগে রানি তুহিনা সবাইকে ঘরের বাইরে যেতে বললেন। সবাই বেরিয়ে গেল। তখন রানি অতি কষ্টে গলা থেকে দুটো রত্নহার খুললেন। একটা দিলেন আমাদের পূর্বপুরুষকে, অন্যটা দিলেন বেন্দিতোর পূর্বপুরুষকে। দুটো রত্নহারই দেখতে একরকম, শুধু একটা রত্নহারে লকেট আছে। সেটা আমাদের পূর্বপুরুষকে দিয়ে রানি অতিকষ্টে বলেছিলেন, চিহ্ন দিলাম, বুদ্ধি খাটান, অলঙ্কার অমূল্য।

"বেন্দিতো পরিবারের পূর্বপুরুষকে কিছু বলার আগেই রানি তুহিনার মৃত্যু হয়।" জিতা থামল। তারপর বলল, "সেই থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে বেন্দিতো পরিবারের শত্রুতা। ওদের রত্নহারে লকেটটা ছিল না। তারপর বার্বার, মুর, আরবীয় অনেকেই এখানে রাজত্ব করে গেছে। কেউ রানি তুহিনার অলঙ্কারের গোপন ভাণ্ডার উদ্ধারের চেষ্টা করেনি। এখন আরবি দলনেতা মিনকে আমাদের চিরশত্রু বেন্দিতো পরিবারের লোকেরা বুঝিয়েছে যে, রানি তুহিনার দেওয়া লকেটসহ রত্নহার আমাদের কাছে আছে। লকেটে গুপ্ত অলঙ্কার ভাণ্ডারের চিহ্ন আছে, যা দেখে সেই ভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে।" জিতা থামল। একটু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "এতসব তোমাকে বলে কী হবে!"

"ঠিক আছে। অনুমান থেকে আমি বলছি—ওই লকেটসহ রত্নহার কোথায়, মিন তোমার কাছ থেকে সব জানতে চেয়ে চাবুক মারছে।" ফ্রান্সিস বলল। "ঠিক তাই। মিন আমার বাবা-মার ওপরেও অত্যাচার করেছে। আমি কিছুতেই সেই লকেটসহ রত্নহার দেব না।" জিতা থামল।

ফ্রান্সিস বলল, "আমার শুধু একটাই প্রশ্ন, লকেটসহ রত্নহারটা এখন কোথায় আছে?"

"সেটা জেনে তোমার কী লাভ?" জিতা বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "আমি অনেক গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। সব জানলে এটাও উদ্ধার করতে পারব।"

জিতা কথাটা শুনে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, "তুমি পারবে?"

"আগে সব জানি, শুনি, তারপর বলতে পারব।" ফ্রান্সিস বলল।

জিতা একবার চারদিকে তাকিয়ে নিল। তখন সকাল হয়েছে। আগে যারা বন্দি ছিল তারা অনেকেই উঠে বসেছে। কেউ কেউ ওপরে দু'হাত উঠিয়ে হাই তুলছে। জিতা ফিসফিস করে বলল, 'রত্নহারটা আমার কোমরের ফেট্টিতে সেলাই করে রেখেছি।"

"ঠিক আছে।" ফ্রান্সিস দেখল হ্যারি আর শাঙ্কোর ঘুম ভেঙেছে। দু'জনে বসে আছে। ফ্রান্সিস আঙুল নেড়ে ইশারায় ওদের কাছে আসতে ডাকল।

হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল,

"আমার পাশে যে লোকটাকে দেখছ তার নাম জিতা। ও কোমরের ফেট্টি থেকে একটা লকেটসহ রত্নহার খুলে দেখাবে। সবাই ওকে ঘিরে বোসো।"

তিনজনই এবার জিতাকে ঘিরে বসল। এবার জিতা কী করছে কয়েদঘরের কেউ দেখতে পাবে না। জিতা একটু ইতস্তত করল। বলল, "রত্নহারটা তোমাদের দেখালে আমার কোনও বিপদ হবে না তো?"

ফ্রান্সিস বলল, "কথা দিচ্ছি তোমার কোনও বিপদ হলে আমরা তোমাকে রক্ষা করব। দেরি কেরো না, বেলা বাড়ছে।"

এবার জিতা কোমরের ফেট্টির মধ্যে আঙুল চেপে বলল, "এখানটায় আছে। কিন্তু সেলাই করা। সুতো কাটতে হবে।" শাঙ্কো জামার গলার দিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। সুতো কেটে রত্নহারটা বের করা হল। ফ্রান্সিস রত্নহারটা বাঁ হাতের তেলোয় রাখল।

রত্নহারটা দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, এই লকেটের নকশাটা ভাল করে দেখে রাখো।"

হ্যারি বলল, "মিনে করা চারটে ফুলের পাপড়ি। নীল মিনে করা। মাঝখানে রক্তপ্রবাল।"

ঢং ঢঢাং, দরজা খোলার শব্দ হল। ফ্রান্সিস দ্রুত রত্নহারটা জিতার হাতে দিয়ে বলল, "কোমরে গুঁজে রাখো।"

পাহারাদাররা সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। গোল করে কাটা রুটি আর নানা সব্‌জির ঝোলমতো। ফ্রান্সিসরা যখন খাচ্ছে তখনই সেই দলের সর্দার ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বলল, "খাওয়ার পর তোমাদের শাসক মিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। জিতা তুমিও যাবে।"

খাওয়া শেষ হল। সর্দার ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের উঠে আসতে বলল। ফ্রান্সিসরা সর্দারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিসরা সর্দারের পেছনে পেছনে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল সর্দারের পেছনে পেছনে। তখনই ফ্রান্সিস দেখল কয়েদঘরের পেছনে একটু দূর থেকেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। তাই ভোরে পাখির ডাক শুনেছিল।

একটু পরেই ফ্রান্সিসরা পাথর বাঁধানো একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সর্দার ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। দেখল একটা বড় কালো পাথরের টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটা বাঁকা পায়াওয়ালা চেয়ারে বসে আছে মধ্যবয়স্ক একজন লোক। তার থুতনিতে অল্প দাড়ি। মাথায় বিড়েমতো সাদা কাপড়ের ঢাকা। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার। মশাল জ্বলছে।

ফ্রান্সিস এসব দেখছে, ততক্ষণে সর্দার ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে যা জানে সব বলে চলেছে। সর্দার থামল। মিন দু'-একবার মাথা নেড়ে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল, "তোমাদের কয়েদঘরে থাকতে হবে। আমার

লোক যাবে। তোমাদের জাহাজ খানাতল্লাশি করা হবে। দেখা হবে তোমরা জলদস্যু লুঠেরার দল কিনা।"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "আমরা জলদস্যু, লুঠেরা নই। আমরা ভাইকিং জাতি। যারা শৌর্যে-বীর্যে আমাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না তারাই আমাদের বদনাম দেয়।"

"ঠিক আছে তোমাদের কথা বিবেচনা করা হবে।" মিন বলল।

জিতা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার জিতার দিকে তাকিয়ে মিন বলল, "জিতা আর কত চাবুকের ঘা খাবে। চাবুক খেতে খেতে তুমি তো মরেই যাবে। যদি বাঁচতে চাও তো বলো লকেট ঝোলানো সেই রানি তুহিনার রত্নহারটা কোথায়?" জিতা কোনও কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মিন দরজার কাছে দাঁড়ানো এক রক্ষীকে ইঙ্গিত করল। রক্ষী চাবুক হাতে এগিয়ে এল। মিনের ইঙ্গিতে জিতার গায়ে চাবুকের ঘা মারল। জিতার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। জিতার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল—আর দু'-একদিন এরকম মার খেলে জিতা বাঁচবে না। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে বলল, "শাসক মিন দয়া করে চাবুক মারা বন্ধ করুন। আমি জানি সেই রত্নহার কোথায় আছে।" মিন বেশ চমকে উঠল। বলল, "তুমি কী করে জানলে? কোথায় সেই রত্নহার?"

"আপনাকে দেব সেই রত্নহার। কিন্তু তার আগে কথা দিন রত্নহার পেলে আপনি জিতাকে মুক্তি দেবেন।" ফ্রান্সিস বলল।

"সেসব পরে। আগে তো হারটা পাই।" মিন বলল।

"বেশ," ফ্রান্সিস বলল। তারপর জিতার কাছে গিয়ে বলল, "জিতা, রত্নহারটা বের করো।"

"না। তুমি বিশ্বাসঘাতক।" জিতা চেঁচিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল, "আমাকে এখন যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু হারটা দিয়ে দাও।" জিতা কোমরের ফেট্টি থেকে হারটা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস হারটা উঁচু করে হাতে তুলে মিনকে দেখিয়ে বলল, "এই নিন রত্নহার, লকেট ঝোলানো।"

মিন টেবিলের ওপাশ থেকে ছুটে এসে হারটা নিল। হারটা দেখতে দেখতে হা হা করে হাসতে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল, "আপনি বলেছিলেন হারটা পেলে জিতাকে মুক্তি দেবেন।"

"তোমাদের কাউকে মুক্তি দেওয়া হবে না। আগে রানি তুহিনার গুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করি—তারপর ভাবা যাবে।" একটু থেমে ডাকল—"এই সর্দার।" সর্দার এগিয়ে এল। মিন বলল, "যা, এগুলোকে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দে।" সর্দার এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসদের নিয়ে সর্দার কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে চলল কয়েদঘরের দিকে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল, "ফ্রান্সিস, রত্নহারটা মিনকে দিয়ে দেওয়া কি ঠিক হল?"

"উপায় কী বলো। আর দিনদুয়েক চাবুক খেলেই জিতা মারা যেত।" ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি জিতার দিকে তাকাল। দেখল জিতা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

ফ্রান্সিস বলল, "মিন রত্নহারটা পেয়েছে বটে, কিন্তু রত্নহারের লকেটে যে নকশাটা রয়েছে সেটা কোনওদিনই বুঝবে না।" একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, "আচ্ছা হ্যারি, লকেটটায় কী নকশাটা ছিল বলো তো!"

হ্যারি বলল, "একটা ফুল। চারটে পাপড়ি। মাঝখানে একটা রক্তপ্রবাল। ফুলগুলো নীল রঙের মিনে করা। পেছনটা সবুজ।"

"ঠিক বলেছ।" ফ্রান্সিস বলল, "এই চার পাপড়িওয়ালা ফুলটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চলো তো জিতার কাছে বসি গে।" দু'জনে জিতার কাছে এসে বসল।

ফ্রান্সিস জিতাকে একটু ধাক্কা দিয়ে ডাকল, "জিতা।" জিতা মুখ তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল, "আচ্ছা জিতা—ওই লকেটে ঝোলানো রত্নহারটা পুরুষানুক্রমে তোমাদের গয়নাগাঁটির সঙ্গেই ছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষ কেউ কি ওই লকেটের নকশাটা নিয়ে রানি তুহিনার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার খোঁজেনি।"

জিতা মাথা নাড়ল, "না। তবে আমি প্রায় কুড়ি বছর ধরে ওই ফুলের নকশাটা নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাইনি। বছর কয়েক আগে অরেস পাহাড়ের মধ্যে যে দুর্গ আছে সেখানে দেখলাম দেওয়াল কুঁদে আঁকা হয়েছে লকেটের ফুলের মতো ফুল।"

"বলো কী!" ফ্রান্সিস চমকে সোজা হয়ে বসল।

"হ্যাঁ, দেখেছি সেই ফুলের নকশা," জিতা বলল, "কিন্তু সেই নকশায় ফুলের পাপড়ি তিনটে। কিন্তু লকেটে আছে চারটে পাপড়ি।" ফ্রান্সিস চুপ করে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা তুমি বলেছিলে রানি তুহিনার মৃত্যু হয়েছিল ওই দুর্গে।"

"হ্যাঁ, পুরুষানুক্রমে আমরা ওটাই শুনে এসেছি।" জিতা বলল।

"আচ্ছা, অরেস পাহাড়ের দুর্গ কোথায়?" ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

"এই কয়েদঘরের পেছনে যে বনজঙ্গল শুরু হয়েছে সেই বনজঙ্গলের মাঝবরাবর রয়েছে সেই দুর্গ। শুনে আশ্চর্য হবে সেই দুর্গ মানুষের হাতে গড়া নয়, প্রকৃতির খেয়ালে তৈরি। দেখলে বুঝবে।" জিতা বলল।

হ্যারি বলল, "অবাক কাণ্ড।" ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল, "ফুলের রহস্যের সমাধান আছে ওই দুর্গেই।"

"তা হলে তো ওই দুর্গে যেতে হবে।" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ এবার এখান থেকে পালানোর উপায়টা ভাবতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রান্সিস গিয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল না। দু'চোখ বুজে পালানোর পরিকল্পনা ছকতে লাগল।

তখন রাতের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। পাহারাদাররা তখন ঢঢাং ঢং শব্দ তুলে দরজা বন্ধ করে বারান্দায় পাহারা দিতে শুরু করেছে।

রাত বাড়তে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠল। লোহার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল দু'জন পাহারাদার বারান্দায় বসে আছে। ভাল করে চারদিক দেখে বুঝল আজ পাহারাদার দু'জনই। দূরে মিনের বাড়ির সামনে কিছু সৈন্যের জটলা।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে জিতার কাছে এল। ঠেলে জিতার ঘুম ভাঙাল। জিতা বলে উঠল, "কী ব্যাপার?" ফ্রান্সিস মুখে আঙুল ছোঁয়াল। বলল, "আস্তে। যা বলছি তাই করো।"

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমার সঙ্গে এসো।" ফ্রান্সিস চলল ঘরের কোনার দিকে, যেখানে বার্বার বন্দিরা ঘুমিয়ে আছে সেইদিকে। সেখানে এসে জিতাকে বলল, "ওদের ঘুম ভাঙ্গাও। সাবধান, কেউ যেন চেঁচামেচি না করে। তারপর আমি যা বলব তুমি আরবি ভাষায় ওদের বুঝিয়ে বলবে।"

দু'জনে বার্বার বন্দিদের ঠেলেঠুলে ঘুম ভাঙ্গাতে লাগল। ফ্রান্সিস জিতাকে বলল, "বলো যে, কেউ যেন চেঁচামেচি না করে।"

যাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, উঠেও বসল কেউ কেউ। জিতা ফিসফিস করে তাদের বলতে লাগল, "সবাই চুপ করে থাকো। কেউ কোনও কথা বোলো না।"

এবার ফ্রান্সিস বলল, "খাবার জলের পিপেগুলো নাও। ওই পুব কোনা থেকে বিছানায় জল ছিটিয়ে দাও। জল একবারে বেশি ঢেলে দেবে না। আমি বিছানার পুব দিকটাতে মশাল ছুড়ে ফেলে আগুন লাগাব।"

জিতা কথাগুলো আরবি ভাষায় ওদের বুঝিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস সবশেষে বলল, 'দরজা যখন খোলা পাবে। তখন যে যেদিকে খুশি পালিয়ে যেও।"

জিতা সব বুঝিয়ে বলল।

বার্বার বন্দিদের তখন ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওরা সব শুনল। তারপর ফ্রান্সিসের নির্দেশমতো জলের পিপেগুলো ধরাধরি করে নিয়ে এল। ঘাসের বিছানায় জল ছিটোতে লাগল। সব জল ছেটানো হলে ফ্রান্সিস যেখানে মশাল জ্বলছে সেখানে এল। মশালটা পাথরের খাঁজ থেকে তুলে নিয়ে পুব দিকের কোণে ছুড়ে দিল। ঘাসের বিছানায় আগুন লাগল। কিন্তু আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল না। ঘাস ভেজা থাকায় আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই হল বেশি। সেই ধোঁয়ায় কয়েদঘর ঢেকে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বলে উঠল, "সবাই চেঁচিয়ে বলো, আগুন, আগুন।" জিতা ফ্রান্সিসের কথাটা বলল।

সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, "আগুন, আগুন।"

পাহারাদার দু'জন ছুটে দরজার কাছে এল। ওরা ধোঁয়া দেখল। তেমন আগুন দেখল না। ভালভাবে দেখার জন্য একজন পাহারাদার অন্যজনকে বলল, "চল তো দেখি কী ব্যাপার।"

দু'জনে তালা খুলে দরজা দিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল, "শাঙ্কো।"

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে একজন পাহারাদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যটির ওপর ফ্রান্সিস। পাহারাদার দু'জনেই ঘাসের বিছানার ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল। হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। ওদিকে খোলা দরজা দিয়ে বার্বাররা পালাতে শুরু করল।

কয়েদঘরের চিৎকার চেঁচামেচি মিনের বাড়ির সামনে সৈন্যদের কানে গেল। তারা তরোয়াল উঁচিয়ে বর্শা তুলে এদিকে আসতে লাগল। বার্বাররা তখন এদিক ওদিক দিয়ে পালাচ্ছে। সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করল।

এবার ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো ছুটে বাইরের বারান্দায় এল। তারপর বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটল পেছনের বনজঙ্গলের দিকে। ঠিক তখনই কয়েদঘরের পেছন থেকে ছুটে এল দু'জন সৈন্য। একজনের হাতে খোলা তরোয়াল, অন্যজনের হাতে বর্শা। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। বনের প্রথম গাছটার কাছাকাছি ফ্রান্সিসরা ছুটে এসেছে তখন। পেছনের সৈন্যটি বর্শা ছুঁড়ে মারল। বর্শাটা শাঙ্কোর বাঁ পায়ের হাঁটুতে লেগে পড়ে গেল। শাঙ্কো থমকে দাঁড়াল। দেখল হাঁটুর কাছে বেশ কিছু জায়গা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস ছুটে এসে শাঙ্কোকে ধরল। শাঙ্কো খোঁড়াতে খোঁড়াতে বনের দিকে ছুটল। তরোয়াল হাতে সৈন্যটি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। সৈন্যটা উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে তরোয়ালটা তুলে নিল। সৈন্য দু'জনের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। তখনই শাঙ্কো বলে উঠল, "ফ্রান্সিস, আরও সৈন্য আসছে, পালাও।"

ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় দেখল—খোলা তরোয়াল হাতে চার-পাঁচজন সৈন্য ঘাসের প্রান্তর দিয়ে ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে পিছু ফিরল। তরোয়াল ফেলে দিয়ে শাঙ্কোর কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল। জিতাও সুস্থ নয়। দু'জনকে প্রায় নিজের গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গভীর বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছপালা, ঝোপঝাড়, লতাপাতা। ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে দু'জনকে ধরে ধরে নিয়ে ছুটতে লাগল। পেছনে সৈন্যদের হইহল্লা শোনা যাচ্ছে। সৈন্যদের সঙ্গে দূরত্ব কমে আসছে।

ফ্রান্সিস বুঝল, এই গতিতে ছুটলে সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের ধরে ফেলবে। দৌড়োতেও অসুবিধা হচ্ছে। পায়ের গোড়ালি পচা পাতার স্তূপে ডুবে যাচ্ছে। ছাড়া ছাড়া গাছপালা। চাঁদের উজ্জ্বল আলো পড়েছে এখানে ওখানে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে ছুটছে। পেছনে সৈন্যদের হইহল্লা কানে আসছে।

হঠাৎই ফ্রান্সিস দেখল ডানধারে কিছুদূরে একটা পাথরের টিলা। টিলার পেছনে আত্মগোপন করা যাবে। ফ্রান্সিস সেদিকেই ছুটল। টিলা ঘুরে ওপাশে গিয়ে দেখল, টিলায় একটা গুহামতো। গুহার মুখের কাছে এসে দেখল, গুহাটা খুব বড় নয়। তবে ওরা চারজন পরপর ঢুকে বসতে পারবে। ফ্রান্সিস তখন ভীষণ হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ছুটে পালাতে গেলে আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে যাব। এই গুহায় আশ্রয় নিতে হবে। সাবধানে লুকিয়ে থাকতে হবে।"

ফ্রান্সিস প্রথমে জিতাকে ধরে ধরে গুহায় ঢোকাল। জিতা তখন মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। শাঙ্কো হাঁফাচ্ছে। ও নিজে নিজেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে গুহায় ঢুকল। হ্যারিও ঢুকল। এবার ফ্রান্সিস ঢোকার আগে কান পাতল। সৈন্যদের হাঁকডাক খুব কাছেই শোনা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়েই রইল। শুনল সৈন্যদের চিৎকার। হাঁকডাক ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ফ্রান্সিস গুহায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। হ্যারি আর জিতা আগেই শুয়ে পড়েছে। শাঙ্কো বসে হাঁটুর কাটা জায়গাটা দেখছে। তখনও রক্ত পড়ছে।

জিতা চোখ বুজে টানা টানা সুরে বলল, "তোমার কাটার ওষুধ—আমার পিঠের ঘা... সব চিকিৎসার ওষুধ... আমি জোগাড় করে... আনব... আমাকে একটু... বিশ্রাম করতে দাও।"

পুব আকাশে লালচে রং ছড়ানো। একটু পরেই সূর্য উঠল। বনের গাছগাছালিতে নরম রোদ ছড়াল। পাখির ডাক শোনা গেল। গুহার মুখেও রোদ পড়ল। গুহাটার ধুলোটে মেঝেয় ফ্রান্সিসরা তখনও ঘুমোচ্ছে।

সকাল হল। পাখির ডাকাডাকিতে প্রথমে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ও উঠে বসল। শাঙ্কোও উঠল। পায়ের দিকে তাকাল। কাটা জায়গাটা থেকে আর রক্ত পড়ছে না। যে রক্ত পড়েছিল সেটাই জমে কালচে হয়ে আছে। জিতাও উঠে বসল। বলল, "তোমরা অপেক্ষা করো। আমি ওষুধ, খাবার নিয়ে আসছি।"

ফ্রান্সিস বলল, "আমি সঙ্গে যাব?"

"না, না, এখন আমার শরীর অনেকটা ভাল লাগছে।"

জিতা বলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গুহার মুখ থেকে আস্তে-আস্তে নেমে এল। বনের গাছগাছালির নিচে দিয়ে জিতা চলে গেল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারি অপেক্ষা করতে লাগল।

বেলা বাড়ল। জিতা ফিরে এল। ওর কোমরে লতাপাতা জড়িয়ে বাঁধা। হাতে একটা তরমুজ।

গুহায় এসে জিতা বলল, "এই বনের বাঁ দিকে বালি এলাকা। স্থানীয় লোকরা সেখানে তরমুজের চাষ করে। একটা পাকা দেখে তরমুজ নিয়ে এলাম। আগে সবাই তরমুজ খেয়ে নাও।"

শাঙ্কো জামার নিচে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তরমুজ কেটে সবাইকে ভাগ করে দিল। ওরা তরমুজ খেতে লাগল। খাওয়ার পালা চুকল। জিতা কোমরে জড়ানো লতাপাতা আস্তে আস্তে খুলল। তারপর শাঙ্কোকে তিনটে পাতা দিল। বলল, "মুখে ভরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করো। একটু তেতো লাগবে।" শাঙ্কো পাতা তিনটে মুখে পুরল। দাঁত দিয়ে চিবোল। সত্যিই তেতো। চিবনো পাতার ছিবড়ে বের করল। জিতা সেটা নিয়ে শাঙ্কোর হাঁটুর কাটা জায়গাটায় আস্তে আস্তে টিপে টিপে লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাটা জায়গাটায় যন্ত্রণা শুরু হল। শাঙ্কো মুখে শব্দ করল, উঃ।

"একটু পরেই আরাম লাগবে।" জিতা বলল। তারপর দুটো পাতা শাঙ্কোর কাটা জায়গায় আস্তে চেপে ধরে লতা দিয়ে বেঁধে দিল। একটু পরে সত্যিই শাঙ্কোর যন্ত্রণা কমে গেল। এবার জিতাও কয়েকটা পাতা চিবোল। ছিবড়ে বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফান্সিস আস্তে আস্তে সেই ছিবড়ে জিতার পিঠে চাবুকে কাটা জায়গাটা বসিয়ে দিল।

চারজন চুপচাপ গুহার মুখে বসে রইল।

এক সময় ফ্রান্সিস বলল, "জিতা, অরেস পাহাড়ের দুর্গটা কতদূর?"

জিতা বলল, "আমরা সেই দুর্গের কাছাকাছি চলে এসেছি।"

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল, "তা হলে দুর্গেই আমরা আশ্রয় নেব। আমার স্থির বিশ্বাস, রানি তুহিনার ধনরত্নের ভাণ্ডার ওই দুর্গেই কোথাও আছে।"

"বেশ চলো।" জিতা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কোও উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ধরে ধরে গুহা থেকে মাটিতে নামিয়ে আনল। জিতা উত্তরমুখো হাঁটতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারি চলল।

দুপুর নাগাদ ফ্রান্সিসরা অরেস পাহাড়ের নিচে এস দাঁড়াল। পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। জিতা কয়েকটা এবড়োখেবড়ো পাথরের ধাপমতো পার হয়ে একটা গুহার সামনে এল। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কোও এসে দাঁড়াল। কিন্তু গুহার মুখটা গোল নয়, চৌকোনো মতো। জিতা তার মধ্যে ঢুকল। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরাও ঢুকল। কিছুদূর এগোতেই অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। যেতে যেতে জিতা বলল, "পরে মশাল আনতে হবে। এবার তোমরা একটুক্ষণ দাঁড়াও। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে দাও। তারপরে অস্পষ্ট হলেও সব দেখতে পাবে।"

ফ্রান্সিসরা অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সত্যি, তারপরে ওরা দু'পাশের এবড়োখেবড়ো পাথরের দেওয়াল আবছা আবছা দেখতে পেল। জিতা বলল,

"এবার এগিয়ে চলো। কিছুটা এগোতেই দেখল ডাইনে-বাঁয়ে দুটো ঘরের মতো, চৌকোনো নয়, গোল। বাঁদিকের ঘরমতো জায়গায় জিতা ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। জিতা পেছন ফিরে বলল, "দ্যাখো, গোলমতো দরজার ওপরে দেওয়ালে তিন পাপড়ির ফুল।" ফ্রান্সিসও ফিরে তাকাল। আবছা দেখল, তিন পাপড়ির ফুল পাথরে কুঁদে তোলা। হুবহু লকেটের ফুলের মতো। শুধু একটা পাপড়ি নেই।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে জিতা আবার গুহাপথে চলল। আবার ডাইনে-বাঁয়ে ঘরের মতো। সেই ঘরের মতো জায়গাটার দরজার মাথায় দেখা গেল, সেই তিন পাপড়ির ফুল। এখানে গুহাপথ দু'পাশে চলে গেছে। সেইদিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল, "আশ্চর্য! প্রকৃতি নিজেই একটা দুর্গ তৈরি করেছে।"

ওরা এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অসুস্থ জিতা, শাঙ্কো ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুস্থ হ্যারি আর ফ্রান্সিসও ক্লান্ত তখন। ফ্রান্সিস বলল, "জিতা, মেঝেয় ধুলো পাথরকুচি নেই এমন একটা জায়গায় নিয়ে চলো।"

"তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা অন্য ঘরগুলো দেখবে না?" জিতা বলল।

"সেসব পরে হবে। এখন আমরা সবাই ক্লান্ত। খাদ্য চাই, বিশ্রাম চাই।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে রানি তুহিনার শয়নকক্ষে চলো।" জিতা বলল।

জিতা ডানদিকের গুহাপথ দিয়ে চলল। পেছন পেছন ফ্রান্সিসরাও চলল। কিছুদূর গিয়ে বাঁদিকে একটা ঘরের মতো দেখল। সেটায় ঢুকল সবাই। এই ঘরমতো জায়গায় মেঝেটা অনেকটা পরিষ্কার, মসৃণও। ফ্রান্সিস পাথরের মেঝেয় বসে পড়ল। জিতা আর শাঙ্কো মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। হ্যারিও ক্লান্তিতে বসে পড়ল। জিতা টেনে টেনে বলল, "লোকে বলে—এটা নাকি রানি তুহিনার শয়নকক্ষ ছিল। এই কক্ষেই নাকি রানি তুহিনার মৃত্যু হয়েছিল।" অন্ধকারেই ফ্রান্সিস ঘরটা ভাল করে দেখল। বুঝল, মশাল বা মোমবাতি না হলে ঘরটা ভালভাবে দেখা যাবে না।

বেশ কিছুক্ষণ সবাই শুয়ে-বসে বিশ্রাম করল। একসময় জিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, "এখন তোমরা কী করবে?"

ফ্রান্সিস বলল, "আমরা এখন এই দুর্গের মতো জায়গাটাতেই থাকব। বাইরে থাকলে মিনের সৈন্যদের নজরে পড়ে যেতে পারি। তা ছাড়া রানি তুহিনার গুপ্ত ভাণ্ডার তো এখানেই রয়েছে। তা তো খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই কয়েকদিনের খাবারদাবার, জল, মশাল, চকমকি পাথর এসব তো লাগবে। দুটো কুড়ুলও আনতে হবে।"

"ঠিক বলেছ," জিতা বলল, "কিন্তু এসব কিনতে তো মুদ্রা লাগবে।" শাঙ্কো উঠে বসল। কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা দুটো স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সিসের দিকে

এগিয়ে ধরল। মুদ্রা দুটো নিয়ে ফ্রান্সিস বলল, "সাবাস শাঙ্কো।"

ফ্রান্সিস আর জিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল গুহাপথ ধরে।

কাটা পায়ের যন্ত্রণা, ব্যথা নিয়ে শাঙ্কো শুয়ে রইল। হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ক্লান্তিতে উত্তরদিকের দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে রইল। এই দেওয়ালটা এবড়োখেবড়ো নয়। বেশ মসৃণ।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ফ্রান্সিস আর জিতা ফিরে এল। প্রয়োজনীয় সবই নিয়ে এসেছে ওরা। জিতা লতাপাতা এনেছিল। পাতা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে শাঙ্কোর কাটা জায়গায় আর নিজের পিঠে লাগল। তারপর তিনটে পাথর পেতে উনুন করল। বয়ে আনা কাঠকুটো উনুনে ঢোকাল। চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাল। রান্না শুরু করল। পাথরের দেওয়ালের খাঁজে রাখা ছিল একটা নেভানো মশাল।

ফ্রান্সিস মশালটা নিয়ে উনুনের আগুন থেকে মশালটা জ্বেলে নিল। হ্যারিকে বলল, "চলো কয়েকটা গাছের ডাল কেটে আনি।" ফ্রান্সিস মশালটা হ্যারির হাতে দিল। নিজে কুড়ুলটা নিল।

গুহাপথ দিয়ে হেঁটে দু'জনে মুখের কাছে এল। বাইরে তখন দুপুর। গুহামুখে পাথরের খাঁজে মশালটা গুঁজে রেখে দু'জনে বনের মধ্যে ঢুকল।

খুঁজে খুঁজে কয়েকটা লম্বা ডাল ফ্রান্সিস কুড়ুল দিয়ে কাটল। তারপর মোটা শুকনো আর কাঁচা লতাগাছ দড়ির মতো পাকিয়ে নিল। দু'জনে ডালগুলো, লতাগাছ নিয়ে গুহার মুখে ফিরে এল।

মাটিতে ঝরে পড়া কিছু গোল গোল বড় পাতাও নিল হ্যারি। গুহামুখে এসে মশালটা নিল। তারপর সে গুহাপথ দিয়ে চলল। রানির শয়নকক্ষে এসে দেখল—মশাল জ্বলছে। রান্না হয়ে গেছে। হ্যারি যে শুকনো গোল গোল পাতাগুলো এনেছিল সেসব পেতে দিল। আরও কিছু পাতা রেখে দিল। সকলেই ক্ষুধার্ত তখন। পাতায় দেওয়া হল আটার মোটা মোটা পোড়া রুটি আর বুনো আলু আর সেদ্ধ করা শাকসবজি। সকলেই পেটপুরে তাই খেল।

খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস ওই ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে ভাবতে লাগল এই দুর্গে কোথায় রানি তুহিনা তাঁর অলঙ্কারের পেটিকা গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন? মৃত্যুশয্যায় তিনি জিতার পূর্বপুরুষকে লকেটসহ রত্নহার দিয়েছিলেন। রানি নাকি রত্নহার দিয়ে বলেছিলেন, চিহ্ন দিলাম, বুদ্ধি খাটাস—অলঙ্কার—অমূল্য। ফ্রান্সিস ভাবল, রানির অলঙ্কারের পেটিকা নিশ্চয়ই এই দুর্গে কোথাও গোপনে রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রমতো এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। তারপর কুড়ুলটা নিয়ে এল যেখানে লম্বা গাছের ডাল দুটো রাখা হয়েছে সেখানে। লম্বা ডাল দুটো পাশাপাশি রাখল। এবার দুটো ডাল কেটে ছোট ছোট ফালি করল। তারপর ফালিগুলো লম্বা ডাল দুটোয় রেখে রেখে বুনো লতা

দিয়ে বাঁধতে লাগল। শাঙ্কো, হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। হ্যারি বলল, "মই বানাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, তোমরাও হাত লাগাও।" হ্যারিকে বলল। তিনজনে মিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা লম্বা মই বানিয়ে ফেলল।

ফ্রান্সিস এই ঘরটার চারদিকে তাকাল। আশ্চর্য! এই ঘরের কোনও দেওয়ালেই তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা নেই। ফ্রান্সিস মই কাঁধে নিল। কুড়ুলটা শাঙ্কো হাতে নিল। ফ্রান্সিস বলল, 'না শাঙ্কো, তুমি বিশ্রাম করো। বেশি হাঁটাহাঁটি করলে আবার রক্ত পড়া শুরু হতে পারে। বরং হ্যারি আসুক।"

ফ্রান্সিস মই কাঁধে চলল। পেছনে হ্যারি মশাল আর কুড়ুল হাতে চলল। একটা ঘরে ঢুকল। দেখল, পাথরের দেওয়ালে তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা! ফ্রাসিস সেই দেওয়ালে মই পাতল। তারপরে হ্যারির হাত থেকে কুড়ুলটা নিয়ে মই বেয়ে বেয়ে ফুলটার কাছে চলে এল। তিন পাপড়ির ফুলটা ভালভাবে দেখল। বুঝল, আলাদা কোনও পাথরের পাটায় ফুলের নকশা কুঁদে তুলে এখানে বসানো হয়নি। পাথরের একবোখেবড়ো দেওয়ালেই কুঁদে কুঁদে নকশাটা তোলা হয়েছে।

এবার ফ্রান্সিস ফুলের নকশার ওপর কুড়ুল চালাল। বেশ কয়েকবার কুড়ুলের ঘা মারল নকশাটার ওপর। নাঃ, ফাঁপা শব্দ হচ্ছে না। বোঝা গেল, ফুলের নকশাটা কঠিন পাথরের দেওয়ালে কুঁদে কুঁদে তোলা হয়েছে। ফ্রান্সিসের কুড়ুলের ঘা খেয়ে নকশার দুটো পাপড়ি ভেঙ্গে গেছে। ফ্রান্সিস ভাবল, 'নাঃ, এখানে কঠিন পাথরের মধ্যে কোনও খোঁদল নেই। কাজেই এখানে রানি তুহিনার গুপ্ত সম্পদ নেই।"

মই থেকে নেমে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, "ভেবেছিলাম তিন ফুলের নকশা যেখানে খোদাই, রানি তুহিনার অলঙ্কারের পেটিকা সেখানে রাখা হয়েছে। দেখছি অনুমান ভুল।"

"তা হলে অন্য ফুলের নকশা দেখে লাভ কী?" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, "না, না, প্রত্যেকটি তিন ফুলের নকশায় ঘা মেরে দেখতে হবে।" দু'জনে চলল অন্য ঘরে। এভাবে সবক'টা ঘরে যেখানে তিন ফুলের নকশা খোদাই করা আছে, সব ক'টাতেই কুড়ুলের ঘা মেরে ফ্রান্সিস বুঝল, কোনওটার পেছনেই ফাঁপা খোঁদল নেই। কাজেই রানি তুহিনার অলঙ্কার পেটিকা ওসব জায়গায় নেই।

দু'জনে রানির শয়নকক্ষে ফিরে এল। জিতা আর শাঙ্কো তখন বসে আছে। শাঙ্কো বলল, "ফ্রান্সিস, কিছু হদিস করতে পারলে?"

"নাঃ। তবে সারা দুর্গটাই ভালভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে কোথায় খোদাই করা তিন ফুলের নকশা আছে!" ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস মই, কুড়ুল রেখে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত হ্যারি ওর পাশে বসল।

ফ্রান্সিস চোখ বুজে ভাবতে লাগল রানি তুহিনা মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, চিহ্ন দিলাম, বুদ্ধি খাটাস। চিহ্ন বলতে তো লকেটের চার পাপড়ির ফুলের নকশাটাই বোঝাচ্ছে। কিন্তু চিহ্ন হিসেবে পেলাম তিন পাপড়ির ফুলের নকশা। পাথুরে দেওয়াল কুঁদে তোলা ওই নকশাগুলোয় কুড়ুলের ঘা মেরে দেখেছি ওগুলোর পেছনে ফাঁপা কিছু নেই। অলঙ্কারের পেটিকা তো ওসব ফাঁপা জায়গায় থাকারই সম্ভাবনা বেশি।

জিতা হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল, "কী হল জিতা?" জিতা আস্তে আস্তে বলল, "গুহাপথে এই দুর্গে কারা ঢুকেছে?"

"বলো কী!" হ্যারি বলে উঠল।

"হ্যাঁ, এই দুর্গে তো আমি অনেকদিন এসেছি, থেকেছি। রানি তুহিনার গুপ্ত অলঙ্কারের ভাণ্ডারের খোঁজ করেছি। এই গুহার দুর্গে কোনও জায়গায় একটু শব্দ হলেই তা প্রতিধ্বনি হয় সারা দুর্গের পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে।"

"তুমি কি তেমন শব্দ পেয়েছ?" ফ্রান্সিস বলল।

"হ্যাঁ, তোমরাও কান পাতো, প্রতিধ্বনির শব্দ শুনতে পারবে।" জিতা বলল।

ফ্রান্সিসরা কান পাতল। খুব ক্ষীণ শব্দ শুনল। পায়ে চলার শব্দ। ফ্রান্সিস বলল, "শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কে বা কারা এখানে ঢুকল?"

"খুবই সহজ।" জিতা বলল, "যার কবজা থেকে তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়েছ।"

"তার মানে মিন।" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ, ওর সৈন্যরাই আমাদের পিছু ধাওয়া করেছিল।" জিতা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমাদের পালাতে হবে।"

জিতা মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল, "পালানোর কোনও উপায় নেই। এই দুর্গ থেকে ঢোকার আর বেরনোর গুহাপথ একটাই। অন্য কোনও পথ নেই।"

"তা হলে তো আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হয়।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক আছে। আমরা অপেক্ষা করব।" হ্যারি বলল।

শাঙ্কো বলল, "আচ্ছা জিতা, এখানে আত্মগোপন করে থাকা যায় এমন কোনও জায়গা নেই।" জিতা মাথা নেড়ে বলল, "না, সব ঘরের সঙ্গে গুহাপথের যোগ আছে।"

হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস একটা কথা ভেবেছ?"

"যদি মিন তার সৈন্যদের নিয়ে আসে, আর যদি আমাদের হত্যা করতে আসে, তা হলে নিরস্ত্র আমাদের মৃত্যু ছাড়া গতি নেই।"

"তা ঠিক," ফ্রান্সিস বলল, "তবে মিনের সামনে লোভনীয় প্রস্তাব দেব। তখন মিন আমাদের একেবারে মেরে ফেলবে না। এখন দেখা যাক, কে বা কারা আসছে।"

চারজনেই কান পাতল। এবার কয়েকজন লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। পদধ্বনি এগিয়ে আসতে লাগল। গুহাপথের পাথুরে দেওয়ালে মশালের আলো পড়ল। সেই আলো এগিয়ে আসতে লাগল। রানি তুহিনার শয়নকক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল মিন। সঙ্গে দশ-পনেরোজন সৈন্য। মিনের ঘর্মাক্ত মুখে মশালের আলো কাঁপছে।

ফ্রান্সিস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "আমরা নিরস্ত্র। আপনি ইচ্ছে করলেই আমাদের হত্যা করতে পারেন। আমরা বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করতে পারব না।"

মিন একটু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "তোমরা কয়েদঘর থেকে পালালে কেন?"

"নিজেদের জীবন রক্ষা করতে।" ফ্রান্সিস বলল।

"এখনই তোমাদের জীবন শেষ করে দিতে পারি, তা জানো?" মিন বলল।

"সে কথা তো আগেই বললাম।" ফ্রান্সিস বলল।

"না, তোমাদের হত্যা করব না। তোমাদের বাঁচিয়ে রাখব। ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসায়ীরা আসে। তাদের হাতে তুলে দেব। ভাল দাম পাওয়া যাবে।" মিন বলল।

ফ্রান্সিস বলল, "রানি তুহিনার যে রত্নহার আপনি পেয়েছেন তার লকেটে রানি যে নকশা মিনে করিয়েছেন সেটার সমাধান করতে পারলেই রানির অলঙ্কার ভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে।"

"এ-কথা আমার দুই পণ্ডিতও বলেছে।" মিন বলল।

"তাঁরা কি সমাধান করতে পেরেছেন।" ফ্রান্সিস বলল।

"না, তবে সমাধান করতে পারবে।" মিন বলল।

"তা হলে তো ভালই। তবে আমাদের যদি বন্দি না করেন তবে আমরা রানির গুপ্তভাণ্ডার উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারি।" ফ্রান্সিস বলল।

"কোনও প্রয়োজন নেই। আমার পণ্ডিতেরাই পারবে।" পণ্ডিতেরা পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে রানি তুহিনার ভগ্ন প্রাসাদের পাথর সরাচ্ছে। দিন কয়েক লাগবে সব ধ্বংসস্তূপ সরাতে। তারপর পণ্ডিতরা ওখানে রানির ভাঙা সভাঘরে রানির অন্তঃপুরের ঘরগুলোয় অনুসন্ধান চালাবে। মনে হয় রানির গুপ্তভাণ্ডার ওরা সন্ধান করতে পারবে।" মিন বলল। তারপর সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সবক'টাকে নিয়ে চল, কয়েদঘরে আটকে রাখবি।"

সর্দার এগিয়ে এল। সৈন্যদের আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। সর্দার বলল, "সবাইকে নিয়ে চল।"

ফ্রান্সিসরা চলা শুরু করল। ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, মিন আমার প্রস্তাবে সাড়া দিল না। পণ্ডিতদের ওপরেই ওর বিশ্বাস বেশি। পণ্ডিতেরা ভাঙা প্রাসাদে কিছুই পাবে না।"

"এখন কী করবে?"

"বন্দিদশা মেনে নেব। আমার বন্ধুরা তো মুক্ত রয়েছে। ওদের কাছে আমাদের বন্দিদশার কথাটা পৌঁছে দিতে হবে। ওরাই যা করার করবে।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে তো মিনের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে।" হ্যারি বলল।

"প্রয়োজনে লড়াই তো হবেই। তবে মিনের সৈন্যদের মাথায় থাকবে শিরস্ত্রাণ বুকে বর্ম। আমার বন্ধুদের সেসব থাকবে না। তাই লড়াইটা যদি হয় তা হলে আমাদের পক্ষে কঠিনই হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

গুহাপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবাই বাইরে এসে দাঁড়াল।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মিনের ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল। মিন সর্দারকে ডেকে কিছু বলল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ছোটাল সিউতার দিকে।

এবার সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের চারদিক ঘিরে নিয়ে চলল। ছাড়া ছাড়া গাছের বনের মধ্যে দিয়ে সবাই চলল। হেঁটে যেতে সবচেয়ে কষ্ট হতে লাগল শাঙ্কোর। তখনও ওর পায়ের ঘা শুকোয়নি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে ওকে।

ফ্রান্সিস সর্দারের কাছে এল। সর্দার কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফ্রান্সিস ওর খাপ থেকে এক হ্যাঁচকা টানে তরোয়ালটা খুলে আনল। অমনই দু'তিনজন সৈন্য তরোয়াল খুলে ছুটে এল। ফ্রান্সিস বাঁ হাতটা তুলে ওদের শান্ত থাকতে বলল। একটা লম্বা ডালওয়ালা গাছের কাছে গেল। তরোয়ালের এক কোপে একটা লম্বা ডাল কাটল। ডালটার পাতা ছেঁটে শাঙ্কোকে দিল। শাঙ্কো ভর দেওয়ার মতো ডালটা পেয়ে খুশি হল। ডালে ভর দিয়ে হাঁটতে ওর কষ্ট কম হল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা সর্দারকে ফিরিয়ে দিল।

বন পার হওয়ার আগেই সন্ধে নামল। অন্ধকারে চলল ওরা। একটু পরেই গাছের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলো পড়ল ঘাসে ঢাকা মাটিতে।

বন শেষ হল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল সিউতার বাড়িঘর। সর্দার ফ্রান্সিসদের নিয়ে এল কয়েদঘরের সামনে। পাহারাদার ঢং ঢ্যাং শব্দ তুলে লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। গাছের ডালে ভর দিয়ে চলা শাঙ্কো সেই ধাক্কায় প্রায় ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস পেছন ফিরে সৈন্যদের একজনকে জামা ধরে টেনে এনে ঘরে ঢোকাল। তখনও দরজা বন্ধ হয়নি। তিন-চারজন সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল। হ্যারি দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "ফ্রান্সিস, শান্ত হও।" ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত ভাবল। তারপরে সৈন্যটির জামা ছেড়ে দিল। ততক্ষণে শাঙ্কো উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ধরে ধরে ঘাসের বিছানায় বসিয়ে দিল। পাহারাদাররা ঠং শব্দ করে দরজা বন্ধ করল। তালা লাগাল।

দুটো মশাল জ্বলছে, তবু ঘরের এদিকে-ওদিকে অন্ধকার কাটেনি। এমনই অন্ধকার কোণ থেকে একজন লোক ফ্রান্সিসের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসতে যাবে, তখনই লোকটা ডাকল, "ফ্রান্সিস।"

ফ্রান্সিস মুখ ফেরাতেই দেখল, বিস্কো সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস অবাক। সে বলে উঠল, "বিস্কো, তোমরা বন্দি হলে কী করে?"

"সব বলছি, তার আগে এদিকে এসো। রাজকুমারী মারিয়া ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন।" বিস্কো বলল। তারপরের ঘরের ডানদিকে চলল। ততক্ষণে হারি আর শাঙ্কো উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই চলল বিস্কোর পেছনে পেছনে। দেওয়ালের কাছে গিয়ে দেখল, পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মারিয়া চোখ বুঁজে বসে আছে। মারিয়ার কাছে পাঁচজন বন্ধু বসে আছে। মারিয়ার চোখমুখ শুকনো। মাথার চুলও উসকোখুসকো। মারিয়া বেশ রোগা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের মন কেঁদে উঠল। ও দ্রুত বসে মারিয়ার ডান হাতটা ধরল। না, গা গরম নয়। ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল, "মারিয়া।"

মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, "তোমরাও বন্দি হলে?"

"হ্যাঁ, পালিয়েছিলাম কিন্তু পরে ধরা পড়েছি। ওসব পরে শুনবে। তোমার শরীর ভাল তো?"

মারিয়া হেসে বলল, "তুমি এসেছ। এবার আমি একেবারে ভাল হয়ে যাব।"

ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল, "তোমরা ধরা পড়লে কী করে?"

বিস্কো বলল, "প্রায় তিনদিন হতে চলল তোমরা ফিরে এলে না। তখন রাজকুমারী বললেন, চলো, আমরা কয়েকজন গিয়ে গোপনে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করি। আমরা পাঁচজন আর একটা নৌকোয় চড়ে সমুদ্রতীরে এলাম। দেখলাম তোমাদের নৌকোটা মাটিতে তোলা আছে। বুঝলাম তোমরা এখানেই নেমেছিলে। রাজকুমারী মানা করেছিলেন তাই আমরা তরোয়াল নিইনি।" বিস্কো থামল। তারপর বলতে লাগল, "বন্দরের কাছাকাছি একটা বাড়ির সামনে এলাম। ডাকাডাকি করলাম। একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। বৃদ্ধের কাছেই জানলাম, এটা আলজিরিয়া আর এই বন্দর-শহরটির নাম সিউতা। বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলাম এখানে সে কয়েকজন বিদেশিকে দেখেছে কিনা। বৃদ্ধটি বলতে পারল না। অগত্যা আমরা খুঁজতে লাগলাম কয়েদঘরটা কোথায়? আমরা ঝোপজঙ্গলের আড়ালে আড়ালে এখানে এলাম। এই বাড়িটা দেখে বুঝলাম, এটাই কয়েদঘর।" বিস্কো থামল। তারপর বলতে লাগল, "একটা ঝোপের আড়ালে সবাইকে রেখে আমি একা এই কয়েদঘরের পেছনে এলাম। আমাদের দেশীয় ভাষায় চিৎকার করে বললাম, ফ্রান্সিস তোমরা কি বন্দি? তখন বেশ রাত। আমার কথা বলা বেশ জোরেই শোনাল। কিন্তু তোমাদের কোনও উত্তর

পেলাম না। ওখান থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে পারলাম না। আমরা পাঁচজনই ধরা পড়ে গেলাম।" বিস্কো চুপ করল।

ফ্রান্সিস বলল, "তোমাদের এভাবে আসা উচিত হয়নি।" মারিয়াকে বলল, "তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন। নিজেই চলে এলে। যাকগে, কালকে মিনকে বলে তোমার জাহাজে থাকার ব্যবস্থা করব। তবে মনে হয় না মিন রাজি হবে।" ততক্ষণে হ্যারি আর শাঙ্কোও সেখানে এসে বসে পড়েছে। হ্যারি বন্ধুদের কাছে বলতে লাগল কী ঘটেছে এখানে।

তখন রাত হয়েছে। ঢঢাং শব্দে দরজা খুলল। পাহারাদাররা খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা নিঃশব্দে খেয়ে নিল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস পাহারাদারকে বলল, "সর্দারের সঙ্গে কথা আছে। সর্দারকে নিয়ে এসো।"

একটু পরেই সর্দার এল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। এখানকার এই কষ্টকর জীবন উনি সহ্য করতে পারবেন না। রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে বন্দি করে রাখো।"

"ঠিক আছে, এসব শাসক মিনকে বলবে। তিনি যা চাইবেন তাই হবে।" সর্দার কথাটা বলে চলে গেল।

তিনদিন কেটে গেল। কয়েদঘর পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থায় কড়াকড়ি হল। আটজন প্রহরী রাখা হল। ফ্রান্সিস কিছুটা হতাশই হল। এত কড়া পাহারা এড়িয়ে পালানো অসম্ভব মনে হল। শুধু ফ্রান্সিস একা হলে হয়তো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালানো যেত। কিন্তু মারিয়া হ্যারিদের নিয়ে পালাতে গেলে কেউ বাঁচবে না। এসব ভেবে ফ্রান্সিস খুব চিন্তায় পড়ল। ঘাসের বিছানায় শুয়ে ফ্রান্সিস এরকম সাত-পাঁচ ভাবছিল। হ্যারি কাছে এসে বসল। বলল, "ফ্রান্সিস, কী করবে এখন?"

"কিছুই করার নেই। এই কয়েদঘর থেকে সবাইকে নিয়ে পালানো অসম্ভব।" ফ্রান্সিস বলল।

"হুঁ, যেরকম পাহারা বসিয়েছে।" হ্যারি বলল।

"একমাত্র আশা, জাহাজ থেকে আমরা ফিরছি না দেখে বন্ধুরা যদি আসে। বন্ধুরা এলেও এই শিরস্ত্রাণ বর্মপরা সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে কি আমাদের বন্ধুরা পারবে?" ফ্রান্সিস বলল।

"এ-কথা সত্যি। কিছু বন্ধুর মৃত্যু হবেই। সৈন্যরা সুশিক্ষিত, সশস্ত্র। তুলনায় আমাদের বন্ধুদের একমাত্র অস্ত্র তরোয়াল। শাঙ্কো থাকলে তবু তীরধনুক কাজে লাগাতে পারত।" হ্যারি বলল।

মারিয়া পাশেই বসেছিল। বলল, "জাহাজের বন্ধুরা নিশ্চয়ই একটাই চিন্তা করবে মুক্ত হবো কী করে?

ফ্রান্সিসদের আরবী শাসক মিনের কয়েদখানায় একঘেয়ে দিন কাটাতে লাগল। ফ্রান্সিস প্রায় সারাদিনই ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকে। কত পরিকল্পনা

করে পালানোর জন্যে। কিন্তু হিসেব করতে গিয়ে বোঝে সে সব পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না। আরো বিপদ হয়েছে যে ফ্রান্সিসরা একবার পালিয়েছিল। কাজেই মিন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে। কয়েদঘরের সামনে সারা দিনরাত চারজন করে প্রহরী মোতায়েন থাকে। তাদের হাতে থাকে খোলা তরবারি। রাতে বাড়তি আরো দু'জন সশস্ত্র সৈন্য কয়েদঘরের সামনের মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আট-দশজন বার্বার জাতির লোক বন্দী ছিল। সেদিন রাঁধুনিরা খাবার নিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দুজন বার্বার বন্দী দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যাতে দরজা খোলা অবস্থায় থাকে আর ওরা পালাতে পারে। কিন্তু প্রহরীরা খুবই তৎপরতার সঙ্গে লোহার দরজা বন্ধ করে দেয়। তাই বার্বার বন্দী দু'জন পালাতে পারল না।

একজন প্রহরী চলে গেল। ফ্রান্সিস ভাবল হয়তো দু'জন বার্বারের কোন শাস্তি হবে না। কিন্তু ফ্রান্সিস ভুল ভেবেছিল। কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। হাতে চাবুক। প্রহরী দরজা খুলে দিল। সেনাপতি কয়েদঘরে ঢুকল। যে প্রহরীটি সেনাপতিকে খবর দিয়েছিল সে এগিয়ে গিয়ে সেই দু'জন বার্বারকে দেখিয়ে দিল। সেনাপতি বার্বার দু'জনকে সামনে এগিয়ে আসতে বলল। বার্বার দু'জন বুঝল কপালে দুঃখ আছে। দু'জন এগিয়ে গেল। সেনাপতি একটাকে সরিয়ে দিয়ে অন্যটার গায়ে চাবুক মারতে লাগল। বার্বারটি চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। সেনাপতির তখন চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে। তবু চাবুকের মার বন্ধ করল না। হাঁফাতে হাঁফাতে সেনাপতি পরেরটাকে ধরল। তারপর চাবুক মারতে লাগল। এই বার্বারটি কাঁদল না। মুখ বন্ধ করে চাবুকের মার খেতে লাগল। একটুক্ষণ পরে পরিশ্রান্ত সেনাপতি থামল। চাবুকটা পাকাতে পাকাতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—" আজকে এই পর্যন্ত। আবার পালাবার চেষ্টা করলে চাবুক মেরে মেরে নরকে পাঠাবো।

সেনাপতি এবার চারদিকে সব বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বলল—পালাতে চেষ্টা করলে সবার কাপালেই চাবুকের মার জুটবে। সেনাপতি চাবুকটা একজন প্রহরীকে দিল। বলল—"রেখে দে।" তারপর চলে গেল।

পরদিন রাতে চাবুকের মার খাওয়া একজন বার্বার বন্দীর প্রচণ্ড জ্বর এল। ওর সঙ্গীদের একজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল— "আমাদের যে সঙ্গীটি চাবুকের মার খেয়েছে তার ভীষণ জ্বর এসেছে। একবার দেখে যান।" — "জ্বর আসাটা ভাল কথা নয়। কিন্তু আমি তো বৈদ্য নই। তবু চলো—দেখি।"

ফ্রান্সিস অসুস্থ বন্দীটির কাছে এল। কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। বুঝল ভীষণ জ্বর এসেছে। ফ্রান্সিস কী বলবে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ভেন তো আমাদের সঙ্গে নেই। কে চিকিৎসা করবে এই বার্বার বন্দীটির? ফ্রান্সিস ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল। জিতাকে মারিয়াকে ঐ অসুস্থ বার্বার

বন্দীটির কথা বলল। জিতা বলল—আমি এর ওষুধ জানি কিন্তু আমি তো বন্দী। মারিয়া মুখ নিচু করে ফ্রান্সিসের সব কথা শুনল। তারপর নিজের পোশাকের রুলের দিক থেকে আধহাত খানেক কাপড় ছিড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে চলল যেখানে পীজের মধ্যে খাবার জল রাখা হয়েছে সেখানে। একটা কাঠের গ্লাশ নিল। জল ঢেলে নিয়ে চলল সেই বন্দীটির দিকে।

মারিয়া বন্দীটির পাশে বসল কপালে হাত দিয়ে বুঝল ভীষণ গরম। জলের গ্লাশটা রাখল। তারপর ছেঁড়া কাপড়টা জলে ভিজিয়ে নিল। বন্দীটির কপালে জলে ভেজা ছেঁড়া কাপড়টা আস্তে চেপে ধরে রইল। কিছুক্ষণ রেখে আবার তুলল। একটু পরে আবার ভেজা কাপড়টা কপালে রাখল। মারিয়া প্রায় আধঘন্টা ধরে এইভাবে জলপট্টি লাগাল। পরে কপাল মুছে কপালে হাত রাখল। কপালের গরম ভাবটা অনেকটা কম লাগল। এই অসুস্থ বন্দীটির সঙ্গে আর একজনকে যে চাবুক মারা হয়েছিল সে কিন্তু চুপ করে অসুস্থ বন্ধুটির পাশে বসে। জ্বালা যন্ত্রণা মুখ বুঁজে সহ্য করতে লাগল। মারিয়া তাকে বলল —আপনার বন্ধুটির জ্বর বেশ কিছুটা কমেছে।

—কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো—বার্বার যুবকটি বলল।

—সে সব পরে জানাবেন। এখন আপনার বন্ধুটি কিভাবে সুস্থ হবে সেই চেষ্টা করতে হবে।

মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বসল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ বার্বার যুবকটি কেমন আছে?

—ভালো না। প্রচণ্ড জ্বর ছিল। কপালে জলপট্টি দিয়ে কিছুটা জ্বর কমিয়েছি। আরও জলপট্টি দিতে হবে। মারিয়া বলল।

—তাই দিও। ফ্রান্সিস বলল।

রাতের খাওয়ার পর মারিয়া সেই অসুস্থ বার্বার যুবকটির কাছে এল। যুবকটির কপালে জলপট্টি দিতে লাগল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে মারিয়া সারারাত জলপট্টি দিল। ভোরের দিকে জ্বর কমল। কিন্তু জ্বর সেরে গেল না।

মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—কেমন আছে যুবকটি?

—জ্বর ছাড়েনি। তবে জ্বর কমেছে। মারিয়া বলল।

দুপুরবেলা যুবকটির জ্বর আবার বাড়ল। মারিয়া শুয়েছিল। সারারাত জেগেছিল। একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল। সেই ভাবটা কেটে গেল একজন বার্বার বন্দীর ডাকে। মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। বার্বার বন্দীটি বলল—আবার ওর জ্বর বেড়েছে। বন্ধুটি ভুল বকছে। আপনি যদি একবার আসেন।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—মারিয়া—চলো—তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

দুজনে অসুস্থ বন্দীটির কাছে এল। বন্দীটি তখন প্রলাপ বকছে। বলছে—যে আমাকে চাবুক মেরেছে—কে সে? সেনাপতি আবার কে? মার মার সেনাপতিকে—আমি বাড়ি যাবো—কে ডাকছে? বাবা? আমি ভালো আছি—একটু জ্বর হয়েছে—সেরে যাবে। হ্যাঁ—পিঠে অসহ্য ব্যথা। মাঝে মাঝে সেই ব্যথা—হাত পা বুকে ছড়িয়ে যাচ্ছে—আমি বাড়ি যাবো—।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। তারপর অসুস্থ যুবকটির কপালে হাত রাখল। গলায় বুকে হাত বুলোল। মৃদুস্বরে বলল—শরীরটা আগুনের মত গরম। তুমি এখানে থাকো। জলপট্টি দাও। জ্বরটা কমাও। নইলে—। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

মারিয়া কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে এল। ছেঁড়া কাপড়টা জলে ভিজিয়ে যুবকটির কপালে চেপে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস উঠল। চলে এল নিজেদের জায়গায়। জিতাকে বলল অসুস্থ যুবকটির কথা। জিতা মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল—যদি কালকেও জ্বর না সারে তবে জানবে যুবকটির বাঁচার আশা নেই।

পরদিনও যুবকটির জ্বর ছাড়ল না। মারিয়া কিছুক্ষণ পরপরই জলপট্টি দিতে লাগল। কিন্তু জ্বর কমার নাম নেই। সেই সঙ্গে যুবকটি সারা শরীর মোচড়াতে লাগল আর কিছুক্ষণ পরপরই প্রলাপ বকতে লাগল।

মারিয়া যুবকটির কষ্ট দেখতে পারছিল না। ও ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তোমরা থাকতে যুবকটি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া সেনাপতির চাবুকের মার খেয়েই যুবকটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেই সেনাপতিকে ডেকে আনিয়ে অনায়াসে হত্যা করা যায়। কিন্তু তাহলে আমাকেও মরতে হবে। কাজেই সেটা করা যাবে না। সেনাপতিকে ডাকিয়ে আনতে পারি। সে কী বলবে তাও আমি জানি। সে বলবে কয়েদ ঘর থেকে পালাতে গেলে এই যুবকটির মতই অবস্থা হবে আমাদের।

যাক গে—আমি সেনাপতিকে খবর পাঠাচ্ছি।

ফ্রান্সিস উঠে দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডাকল। বলল—ভাই সেনাপতিকে খবর দাও। উনি যেন এখানে একবার আসেন। একজন বার্বার যুবকের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ।

—কার কথা বলছো? প্রহরটি বলল।

—যে যুবকটিকে সেনাপতি চাবুক মেরেছে তার শরীর খুব খারাপ। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব ভালো হয়েছে—পালাতে গিয়েছিল কেন? প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিসের রাগে মাথায় রক্ত উঠে গেল। তবু ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলল—ভাই যুবকটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেনাপতিকে খবর দাও।

—পারবো না। প্রহরীটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিস পরপর তিনজন প্রহরীকে একই অনুরোধ করল। চতুর্থ প্রহরীটিকেও একই অনুরোধ করল।

চতুর্থ প্রহরীটি বলল—সেনাপতিকে ডেকে নিয়ে এসে কিছুই হবে না। উনি বলবেন—যা করেছি ঠিক করেছি। মরলে আমি কী করবো? সেনাপতিকে ডেকে কোন লাভ নেই।

—লাভ লোকসানটা আমরা বুঝবো। তুমি খবর দিয়ে আসতে বল। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—যাচ্ছি। প্রহরীটি বলল।

প্রহরী বারান্দা থেকে মাঠে নামল। তারপর চলল সেনাপতির বাড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস বাকি তিনজন প্রহরীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলল—তোমাদের ভাই বলে একটা অনুরোধ করেছিলাম, তোমরা শুনলে না। অনুরোধ রাখলে না। তোমাদের তিনজনকে হত্যা করা আমার কাছে কিছুই না। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে তাহলে আমার বন্ধুদের বিপদ বাড়বে। কারণ তাহলে আমাকেও মরতে হবে। কিন্তু আমি এখন মরতে রাজি নই। আমাকে এখন বেঁচে থাকতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। সেনাপতির মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল সেনাপতি ক্রুদ্ধ। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। সেনাপতি ঘরে ঢুকল। চারদিকে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী হয়েছে? কী বলতে চাও তোমরা? সবাই শুয়ে বসেছিল। কেউ কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—মাননীয় সেনাপতি মহাশয়—গত পরশু যে দুজন বার্বার বন্দীকে আপনি চাবুক মেরেছিলেন—তাদের একজন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বোধহয় বাঁচবে না। তার চিকিৎসার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করছি।

—কই সেই বন্দী? সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস ঘরের কোনার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—ঐ দিকে যান। দেখতে পাবেন।

সেনাপতি সেদিকে গেল। মারিয়া তখন যুবকটির কপালে জলপট্টি দিচ্ছিল। সেনাপতি অসুস্থ যুবকটিকে দেখল। নিচু হয়ে নির্জীব উবু হয়ে শুয়ে থাকা বার্বার যুবকটির কপালে গায়ে হাত দিল। বুঝল—প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। গা পুড়ে যাচ্ছে। সেনাপতি মাথা তুলে বলল—কয়েদঘর থেকে পালাবার শাস্তি এটা। আমার কিছু করার নেই।

ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। শুধু ওর জন্যে একজন বৈদ্য পাঠান।

—না। সেনাপতি চেঁচিয়ে উঠল—এভাবেই মরুক। ফ্রান্সিস বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিও উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের হাত ধরল। গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ছুটে এল। ফ্রান্সিসকে ধরল। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—ক্রুদ্ধ হয়ো না। নিরস্ত্র আমরা। বিপদ হতে পারে।

ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলল—এই কয়েদঘর থেকে কোনদিন মুক্তি পেলে তোমাকে আমি যখন যে অবস্থায় পাবো তোমাকে আমি হত্যা করবো। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সেনাপতি একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস চোখ মুছতে মুছতে বসে পড়ল। হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পাশে বসল। কেউ কোন কথা বলল না।

মারিয়া ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?—সবই তো শুনলে। যুবকটিকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে। আমরা কিছুই করতে পারবো না।

মারিয়া বসে পড়ল। তারপর দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসরা কেউই কোন কথা বলল না।

তখন গভীর রাত। যুবকটি শরীর এপাশ ওপাশ করে মোচড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া পাশে বসে আছে। মারিয়া যুবকটির কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ যুবকটি উঠে বসল। অস্ফুটস্বরে কী বলল। তারপর বিছানায় পড়ে গেল। শরীরের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। যুবকটি মারা গেল। মারিয়া মৃত যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো হ্যারি মাথা নিচু করে রইল। ওদের চোখেও জল। আজ ওরা অক্ষম। যুবকটিকে বাঁচাতে পারল না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এল। একজন প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল—শুনে যাও। প্রহরীটি এগিয়ে এল। বলল, কী ব্যাপার?

—একজন বার্বার বন্দী মারা গেছে। তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো সেনাপতিকে খবরটা জানাতে হয়। প্রহরীটি বলল।

—যাও। জানিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরীটি চলে গেল। ফ্রান্সিস ফিরে এসে বসল। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলছে না। চুপ করে আছে।

কিছু পরে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি। হ্যারি ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি। যদি সেনাপতি মৃতদেহ কবর দেবার দায়িত্ব আমাদের দেয় তাহলে আমরা বাইরে যেতে পারবো। সুযোগ বুঝে পালাতেও পারবো।

—কিন্তু রাজকুমারীকে রেখে আমরা কী করে পালাবো? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ—এই একটা ভুল আমরা করেছি। মারিয়াকে আমাদের জাহাজে গিয়ে রাখতে মিনকে বলেছিলাম। পরে ঐ ব্যাপারে আর চেষ্টা করিনি। ঐ ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে।

প্রহরীটি ফিরে এল। দরজার কাছে এসে বলল—সেনাপতি বললেন—কয়েদী মারা গেলে অন্য কয়েদীর দল মৃতদেহ কবর দেবে। তোমাদের মধ্যেই সাতজনকে ছাড়া হবে। তারাই ঐ থর্ন বনে গিয়ে মৃতদেহ কবর দেবে। তোমাদের মধ্যে সাতজন এগিয়ে এসো। ফ্রান্সিস যা ভেবেছিল তাই হল। ফ্রান্সিস শেষ চেষ্টা করল। প্রহরীকে বলল—আমাদের রাজকুমারীও আমাদের সঙ্গে যাবে।

—না। রাজকুমারীকে ছাড়া চলবে না। রাজকুমারী পালিয়ে গেলে আমাদের গর্দান যাবে। তাছাড়া রাজকুমারী এখানে বন্দী আছে বলেই তোমরা আমাদের কব্জায় আছো।

হ্যারি বলল—একটা কফিন তো লাগবে। একজন পাদ্রীকেও তো চাই। —তোমরা কয়েকজন এসো। কফিন আনতে হবে। পাদ্রী ফাদ্রী এই রাতে আর পাওয়া যাবে না। জিতা ঘুমোয়নি। প্রহরীর কথাটা ওর কানে গেল। জিতা গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস পাদ্রীর কাজ আমিই করবো। পাদ্রীরা বাইবেলের যে জায়গাটা বলে সেই জায়গাটা আমার মুখস্থ। বাইবেলও লাগবে না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা যখন কয়েদঘর থেকে বেরোচ্ছে তখন কয়েকজন বার্বার বন্দী এগিয়ে এল। বলল—আপনারা আমাদের বন্ধুর জন্যে যা করেছেন তা তো আমরা দেখেছি। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমরা যাচ্ছি।

কথাটা প্রহরীর কানে গেল। প্রহরীটি বলল—না। তোমাদের ছাড়া যাবে না। তোমরা যাবে না। বার্বার সৈন্যটি বলল—আমরা আমাদের বন্ধুকে কবরও দিতে পারবো না?

—না। এই ভাইকিংরা সব করবে। ফ্রান্সিস বার্বারদের দিকে তাকিয়ে বলল—

—তোমরা নাই বা যেতে পারলে। আমরা সব করবো। তোমাদের চিন্তার কিছু নেই।

প্রহরীরা গুনে গুনে সাতজন ভাইকিংকে কয়েদঘর থেকে বেরোতে দিল। ফ্রান্সিস প্রহরীদের বলল—আর একজনকে যেতে হবে। পাদ্রীর কাজ করবে।

—বেশ। যে পাদ্রীর কাজ করবে তাকে ডাকো। প্রহরীটি বলল।

—জিতা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল। জিতা কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—জিতা তুমিও চলো। পাদ্রীর কাজ করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে চলো। সর্দারটি বলল।

তিনজন প্রহরীও খোলা তরোয়াল হাতে ওদের সামনে যেতে লাগল। এক সর্দারগোছের প্রহরী বলল—প্রথমে আমরা কফিন আনবো। এত লোকের দরকার নেই। কয়েকজন ভাইকিং কয়েদঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাকিরা চাঁদের আলোয় প্রান্তরের ওপর দিয়ে চলল। দু'জন সৈন্য দুটো মশাল নিয়েছে। শুধু তাদের হাতেই তরোয়াল নেই। প্রাসাদের এক কোনায়

একটা ঘর। তালাবদ্ধ। সর্দারটি কোমরের চামড়ার বন্ধনি থেকে চাবি বের করল। দরজা খোলা হল।

ঘরটার ভেতরে ঢুকল সবাই। মশালের আলোয় দেখা গেল অনেক কফিন ছিটিয়ে ছড়িয়ে রাখা। সৈন্যরা কফিনগুলো থেকে একটা কফিন বের করল। কফিনের কাঠ ভেঙে গেছে। আবার খোঁজ শুরু হল। ফ্রান্সিসরাও হাত লাগাল। একটা মোটামুটি ভালো কফিন পাওয়া গেল। শাঙ্কো খুঁজে বের করল সেটা।

কফিনটা নিয়ে বাইরে এলো সবাই। ঘরটায় তালা ঝুলল। সবাই ফিরে চলল কয়েদঘরের দিকে।

প্রান্তর পার হয়ে সকলে কয়েদঘরের সামনে এল। কয়েদঘরের সামনে এসে সর্দার বলল—কফিন বারান্দায় রাখো। মড়া বের করে কফিনে রাখো। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন যুবকটির মৃতদেহ কয়েদঘর থেকে নিয়ে এল। কফিনে শুইয়ে দিল।

সর্দারটি জোর গলায় বলল—কফিন থর্ন বনের দিকে নিয়ে চলো।

ফ্রান্সিসরা কফিন কাঁধে নিল। চলল বনের দিকে। তখনই দুটো বেলচা নিয়ে একজন সৈন্য ছুটে এল। হাঁপাচ্ছে তখন।

সকলে কিছু পরে বনভূমির কাছে পৌঁছল। সর্দার বলল—বনে ঢোক। সবাই কফিনটা নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল।

গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে কফিন কাঁধে চলল সবাই। অন্ধকার খুব একটা বেশি নয়। ছাড়া ছাড়া গাছ-গাছালি বলে কোথাও কোথাও মাটিতে গাছের গায় চাঁদের ভাঙ্গা আলো পড়েছে।

কিছুদূর গিয়ে সর্দার বলল—থামো। সেখানেই দাঁড়াল সবাই। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সর্দার একটা বুনো গাছের তলায় দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—এখানে কবর খোঁড়।

ফ্রান্সিস সৈন্যের হাত থেকে বেলচাটা নিল। এগিয়ে গিয়ে গাছটার কাছে মাটিতে বেলচা চেপে ঢোকাল। আর এক ভাইকিং বন্ধু অন্য বেলচাটা নিল। মাটি খুঁড়তে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁড়া চলল। শাঙ্কো বিস্কোও হাত লাগাল।

একটা বড় গর্ত হল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন মিলে কফিনটা গর্তের কাছে নিয়ে এল। দু'জন ভাইকিং গর্তটায় নামল। ওপর থেকে ফ্রান্সিসরা কফিনটা আস্তে আস্তে ধরে ধরে গর্তটায় নামাল। দুই বন্ধু নিচ থেকে ধরে ধরে কফিনটা গর্তের মধ্যে নামাল।

দুই বন্ধু উঠে এল। গর্তটা ঘিরে দাঁড়াল সবাই। জিতা মৃদুস্বরে বাইবেল থেকে গরগর করে মুখস্থ বলে গেল। কবরে মাটি ফেলা শুরু হল। ফ্রান্সিসরা আগে একমুঠো করে মাটি কবরে ফেলল। তারপর সবাই মাটি ফেলল। এবার বেলচা দিয়ে মাটি ফেলতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কবরের গর্ত মাটিতে ঢেকে গেল। বিস্কো একটা গাছের লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে এল। ডালটা ভেঙে দু'টুকরো করল। বুনোলতাও সঙ্গে এনেছিল। বুনো লতা দিয়ে ক্রুশের মত দুটো ডালকে বাঁধল। তারপর কবরের ওপর চেপে বসিয়ে দিল।

সর্দারের গলা শোনা গেল—ফিরে চলো কয়েদখানায়। সবাই ফিরে চলল।

যখন ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে এল তখন সূর্য উঠছে। ওরা প্রান্তর পার হতে হতেই সূর্য উঠল। ভোরের সূর্যালোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বনের পাখির ডাকাডাকি এখান থেকেও কানে আসছে। ফ্রান্সিস মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ। সাদা হালকা মেঘ উড়ছে। ওর মনে হল পৃথিবী কত সুন্দর! এরমধ্যে মানুষের মৃত্যুর কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে এক মৃতদেহ কবর দিয়ে এলাম। মানুষের হাতে মানুষের মৃত্যু। আরবী শাসক মিন কী নিষ্ঠুর। তারই হাতে চাবুকের ঘা খেয়ে একজন তরতাজা যুবক মারা গেল। কথাটা ভাবতেই ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ফ্রান্সিস হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে নিল।

কয়েদঘরে ফিরে এল ফ্রান্সিসরা।

দেখল হাঁটুতে মুখ গুঁজে অন্য যুবকটি কাঁদছে। এই যুবকটিকেও চাবুক মারা হয়েছিল। কিন্তু ওর সামান্য জ্বর হয়েছিল। জ্বর কমেও গিয়েছিল। মৃত বন্ধুর জন্যে ও মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁদতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওর পাশে বসল। যুবকটির কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল—কেঁদো না—তোমার বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী সেই শাসক মিনকে হত্যা করার সংকল্প নাও। কেঁদো না। মনকে শক্ত কর। প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারি মারিয়ার কাছে গিয়ে বসল।

সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। একটাই চিন্তা কী করে জাহাজের বন্ধুদের কাছে খবর পাঠানো যায় যে মিনের কয়েদখানায় তারা বন্দী। ফ্লেজারবাই বা কী করে ওদের খোঁজ পাবে! কিভাবে ওদের মুক্ত করতে পারবে?

শাসক মিন কথা রাখল না। মারিয়াকে জাহাজে নিয়ে রাখল না। এই কয়েদঘরেই মারিয়াকে থাকতে হচ্ছে। ভালো করে খাওয়া নেই ঘুম নেই—এত কষ্ট মারিয়া সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু এই নিয়ে মারিয়া ফ্রান্সিসকে কিছুই বলল না। ফ্রান্সিস প্রতিদিনই দেখছে মারিয়ার মুখ শুকনো। চোখের নিচে কালি। মাথার চুলে জট পাকিয়ে গেছে। সবই বুঝতে পারছে ফ্রান্সিস কিন্তু উপায় নেই। সবই সহ্য করতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শেষ চেষ্টা। দেখা যাক শাসক মিন মারিয়াকে ওদের জাহাজে রাখার ব্যবস্থা করে কিনা।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। লোহার দরজা ধরে ঝাঁকুনি দিল। এক প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—কী হয়েছে।

—শাসক মিনকে এখানে আসতে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—শাসক মিন তোমার চাকর না। প্রহরীটি বলল।

—আমাদের মুক্তি দাও—তোমাদের শাসক মিনকে আমার চাকর বানিয়ে ছাড়বো। যাক তো—তুমি গিয়ে বলো যে ভাইকিং সর্দার কিছু বলতে চাইছে।

—আমি বলতে যাবো না। প্রহরীটি মুখ ঘুরিয়ে বলল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে লোহার দরজা ঝাঁকাতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরাও এগিয়ে এল। একসঙ্গে কয়েকজন ফ্রান্সিসের সঙ্গে মিলে দরজা ঝাঁকাতে লাগল। সবাই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। চলল দরজা ঝাঁকানো।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—তুমি যদি শাসক মিনকে খবর না দাও তবে আমরা সারারাত ধরে দরজা ঝাঁকাবো। প্রহরীটি ছুটোছুটি করতে লাগল। বুঝে উঠতে পারল না কী করবে? অন্য প্রহরীদেরও এক অবস্থা। জোর ঝন্‌ঝন্ শব্দে ওরা দিশেহারা।

তখন একজন প্রহরী উঁচু গলায় বলল—আমরা শাসক মিনকে খবর দিচ্ছি তোমরা শব্দ থামাও। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ঝাঁকুনি বন্ধ কর। প্রচণ্ড একঘেয়ে শব্দ বন্ধ হল।

সেই প্রহরীটি চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে শাসক মিন এল। কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে বলল—তোমরা কী আরম্ভ করেছো।

—এটা করলাম বলেই একজন পাহারাদার আপনাকে ডেকে আনতে রাজি হল।

—কী বলতে চাও বলো। মিন বলল।

—আপনি আমাদের দেশের রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে রাখবেন বলেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কতজনকে কত কথাই তো বলি। সবসময় কি সেসব কথা মনে থাকে। মিন বলল।

—আপনি রাজী না হলে আমরা আবার দরজা ঝাঁকানো শুরু করবো, শাঙ্কো বলল।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। মিন বেশ ঘাবড়ে গেল।

—তাহলে বলুন। হ্যারি বলল।

—বেশ তো রাজকুমারী কখন যেতে চান বলুন আমি প্রহরী সঙ্গে দিয়ে পাঠাচ্ছি। মিন বলল।

—রাজকুমারী দ্রুত উঠে দাঁড়ান। চড়া গলায় বলল—আপনার মত নৃশংস নির্দয় মানুষের কাছে আমি কক্ষনো অনুরোধ জানাবো না। জাহাজের যুগের জীবন আমি চাই না।

—মারিয়া কী বলছো তুমি? এখানে থাকলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—অসুখ হলে মরে যাবো তাও ভালো এই খূনীর কাছে কিছু চাইব না। একটু পরে বলল—ফ্রান্সিস আজকে আমি তোমার কথাও শুনবো না। মারিয়া বলল।

—মারিয়া —শান্ত হও—সবদিক ভেবে দেখো। ফ্রান্সিস বলল।

—না আমি জাহাজে যাবো না। এখানেই থাকবো। মারিয়া বলল। মিন অল্প হাসল। বলল—দেখছো তো রাজকুমারী নিজেই যেতে চাইছে না। আমার আর কিছু করার নেই।

মিন চলে গেল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল। মারিয়া এসে ওর পাশে বসল। ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল-তুমি আমার ওপর রাগ করেছো—তাই না। ফ্রান্সিস হেসে মুখ তুলল। বলল—পাগল—আমি তোমার ওপর রাগ করতে পারি? আমি তোমার শরীরের কথা ভেবেই এই প্রস্তাব করেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—এখন মহা সমস্যায় পড়লাম। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কী করে পালাতে পারবো বুঝতে পারছি না। ততদিনে তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড় তাহলে বিপদ বাড়বে। তাই তোমাকে জাহাজে রাখার ব্যবস্থা করতে চাইছিলাম। আর একটা উদ্দেশ্যে ছিল—তুমি জাহাজে গিয়ে থাকলে আমরা সহজেই পালাতে পারবো। —তাহলে মিনকে বল—আমি আমাদের জাহাজে থাকতে রাজি হয়েছি। —না—এই জঘন্য চরিত্রের নরপশুটাকে আর অনুরোধ করবো না। শুধু তুমি সুস্থ থাকলেই আমি পালাবার পরিকল্পনা বেশ চিন্তা করে করতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই করো। মারিয়া বলল।

ওদিকে জাহাজের বন্ধুরা অস্থির হয়ে উঠেছে। কী করবে ওরা বুঝে উঠতে পারছে না। ফ্রান্সিস, হ্যারি, শাঙ্কো, বিস্কো কেউ নেই। এই অবস্থায় ফ্রেজার এগিয়ে এল। পেড্রোকে বলল, "যাও সকলকে ডেকে উঠে আসতে বলো।" পেড্রো নিচে নেমে সবাইকে খবরটা দিল।

তখন একটু রাত হয়েছে সবাই এসে ডেকে জড়ো হল। ফ্রেজার সকলকে সম্বোধন করে বলল, "ভাইসব, আমাদের আজ দিশেহারা অবস্থা। বুঝে উঠতে পারছি না এখন আমরা কী করব! প্রথমে গেল ফ্রান্সিস। পরে বিস্কোরা। সাতদিন হতে চলল ওরা কেউ ফিরে এল না। আমাদের কোনও খবরও পাঠাতে পারল না। এখন এই একটা সম্ভাবনার কথাই মনে আসছে। সেটা হল, তারা সবাই বন্দি হয়েছে। এটা কী দেশ বা দ্বীপ আমরা জানি না। এখানে কারা থাকে, তাদের রাজাই বা কে আমরা কিছুই জানি না।" একটু থেমে ফ্রেজার

বলতে লাগল, "বলতে আমার মন ভেঙ্গে যাচ্ছে তবু বলি, তবে কি ফ্রান্সিসরা কেউ জীবিত নেই?"

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। একজন ভাইকিং বলল, "ফ্রেজার, এতটা আশঙ্কা করো না। ওরা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। হয়তো মুক্ত নয়—বন্দি।"

বয়স্ক বৈদ্য ভেন বলল, "আমরা এখনও বিনা কারণে কোনও লড়াইয়ে জড়িয়ে যাইনি। আজকে আমাদের লড়াইয়ে নামতে হবেই, যদিও জানি ফ্রান্সিসরা বন্দি হয়ে আছে।"

এবার ফ্রেজার বলল, "ভাইসব, আমাদের সামনে আজ দুটো কাজ আছে। এক, ফ্রান্সিসদের ফেরার আশা নেই দেখে আমরা জাহাজ চালিয়ে চলে যেতে পারি। দুই, তীরে নেমে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে পারি। বলো—তোমরা কী চাও?"

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরা এখান থেকে নড়ব না। ভেন বলল—আমরা তীরে নামব। ফ্রান্সিসদের খোঁজ করব। খোঁঝ করতে গিয়ে যদি লড়াইতে নামতে হয় আমরা লড়াইয়ে নামব।"

ফ্রেজার বলল, "আমিও ঠিক এটাই চাইছিলাম। আমরা যে ফ্রান্সিসদের পরম বন্ধু, এটা প্রমাণ করবার সময় এসেছে।"

একজন ভাইকিং বলল, "একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে, এই অঞ্চলের সৈন্যরা সুশিক্ষিত আর শিরস্ত্রাণে, বর্মে সশস্ত্র। এরকম সৈন্যদের সঙ্গে যদি আমাদের লড়তে হয় আমরা কি লড়তে পারব?"

ফ্রেজার বলল, "কথাটা ঠিক। তবে আমরা লড়ব বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যে। এখানেই আমরা মনের জোর বেশি পাব। দেখা যাক, যদি ওরকম এক অসম লড়াই লড়তে হয় লড়ব।" একটু থেমে ফ্রেজার বলল, "সবাই তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া খেয়ে নাও। রাত একটু গভীর হলে আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তীরে নামব। ফ্রান্সিসদের মুক্ত করার জন্যে যা করার করব।" সভা ভেঙ্গে গেল। কেউ কেউ কেবিনঘরে চলে গেল, কেউ কেউ ডেকে বসল। দু'-চারজন ডেকেই শুয়ে পড়ল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সকলেই তরোয়াল নিয়ে তৈরি হল। ডেকে উঠে এল। ফ্রেজারও এল। পেড্রোকে ডেকে বলল, "সমুদ্রতীরে যাও। নৌকো দুটো নিয়ে এসো।" পেড্রো রেলিং টপকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সাঁতার কেটে চলল তীরের দিকে।

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। চাঁদের আলো পড়েছে সমুদ্রের জলে, ঢেউয়ের মাথায়। চিকচিক করছে। কোথাও সাদাটে কুয়াশার জটলা। তার মধ্যে দিয়েই পেড্রো সাঁতরে চলল। জাহাজঘাটা অনেক দূরে। ওখান থেকে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

পেড্রো তীরের কাছে এল। দেখল, ওদের দুটো নৌকোই তীরে ঠেলে তোলা আছে। পেড্রো তীরে উঠল। একটা নৌকোর দড়ি দিয়ে অন্য নৌকোটার সঙ্গে বাঁধল। তারপর ঠেলে দুটো নৌকো জলে নামাল। একটা নৌকোয় উঠল। দাঁড় নৌকোটার গলুইয়ে রাখা ছিল। দাঁড়টা তুলে নিল। দাঁড় বাইতে লাগল। দুটো নৌকোই চলল ভাইকিংদের জাহাজের দিকে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নৌকো দুটো জোরেই চলল।

দাঁড় বেয়ে পেড্রো নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে এসে লাগাল। দড়ির মই বেয়ে ডেকে উঠে এল। তখন পেড্রো হাঁফাচ্ছে। ও নিজের কেবিনঘরের দিকে চলল। ভেজা পোশাক পালটাতে হবে।

রাত গভীর হল। ফ্লেজার উঁচু গলায় বলল, "এবার চলো ভাইকিংরা।" দড়ির মই বেয়ে নৌকোয় নামতে লাগল। দুটো নৌকো ভরে গেল। নৌকো দুটো আস্তে আস্তে তীরের দিকে চলল।

তীরে এসে নৌকো লাগল। সবাই তীরে নামল। পেড্রো বলল, "কেউ দাঁড়িয়ে থেকো না নজরে পড়ে যাবে। সবাই বসে পড়ো।" সবাই বালি মেশানো মাটিতে বসে পড়ল।

পেড্রো আবার দুটো নৌকো চালিয়ে চলল জাহাজের দিকে। নৌকো দুটো জাহাজে লাগল। জাহাজ থেকে ফ্লেজার আর বাকি ভাইকিংরা নেমে এল। নৌকো দুটো এবার চলল তীরের দিকে। নৌকো তীরে ভিড়ল। সবাই নেমে দাঁড়াল। পেড্রো ওদের বসে পড়তে বলল। ওরা বসে পড়ল। দুই বন্ধুকে ডেকে নিয়ে পেড্রো নৌকো দুটো ঠেলে মাটিতে তুলে রাখল।

ফ্লেজার জাহাজঘাটার দিকে তাকাল। জাহাজঘাটা বেশ দূরে। ওদের যেতে হবে জাহাজঘাটার কাছে। দেখা যাচ্ছে ওদিকেই জনবসতি। এখানে দেখা যাচ্ছে বালিমাটি ঢাকা ঘাসের প্রান্তর। বেশ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রান্তরে ফুটফুটে জোছনা। ফ্লেজার প্রান্তরের ওপর দিয়ে জনবসতি এলাকার দিকে চলল, পেছনে ভাইকিং বন্ধুরা। কেউ কোনও কথা বলছে না। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চলেছে সবাই।

বসতি এলাকায় এল ওরা। একটা পাথরের দেওয়ালওলা বাড়ির পেছনে এল সবাই। ফ্লেজার বলল, "এই বাড়ির পেছনে তোমরা অপেক্ষা করো। আমি খোঁজখবর নিয়ে আসছি।"

সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্লেজার সেই বাড়িটার সামনে এল। দু'দিকে তাকিয়ে বুঝল, এটা সদর রাস্তা। জাহাজঘাটা থেকে এসে দূরে চলে গেছে।

ফ্লেজার বাড়িটার বারান্দায় উঠে দরজার কাছে এল। দেখল দরজাটা হাঁ করে খোলা। ফ্লেজার বুঝল বাড়িটা পোড়ো বাড়ি। তবু দরজাটায় বার দুয়েক শব্দ করল। কারও সাড়াশব্দ নেই।

ফ্লেজার রাস্তায় নামল। জোছনায় যতদূর দেখা যাচ্ছে লোকজন নেই। ফ্লেজার আর একটা বাড়ির সামনে এল। বারান্দা পার হয়ে দরজার সামনে

এল। দরজায় হাত দিয়ে শব্দ করল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। আবার ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে বুড়ির গলায় শোনা গেল, "কে?"

কথাটা আরবি ভাষায় বলা। ফ্রেজার আন্দাজে বুঝল। গলা নামিয়ে বলল, "একটু আসুন। কথা আছে।"

একটু পরে দরজাটা খুলে গেল। একজন বয়স্কা মহিলা এসে দাঁড়াল। ফ্রেজার বলল, "আপনি স্পেনীয় ভাষা বোঝেন?"

মহিলাটি মাথা কাত করে বললেন, "অল্প, অল্প।"

ফ্রেজার বলল, "তাতেই হবে।" থেমে বলল, এখানে কয়েদঘরটা কোথায়?"

মহিলাটি হাত তুলে কিছুদূরে একটা ঝুপসি পাতার গাছ দেখিয়ে বললেন, "ওই গাছ—বাঁ দিক—একটু দূর—কয়েদখানা।" মহিলাটি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ফ্রেজার বন্ধুদের কাছে ফিরে এল। বন্ধুদের বলল, 'কয়েদঘর কোথায় জেনেছি। আগে দেখতে হবে ফ্রান্সিসরা কয়েদখানায় বন্দি হয়ে আছে কিনা। যদি না থাকে তা হলে অন্য জায়গাগুলো দেখতে হবে।"

বৃদ্ধা হদিশ বলে ঘরে ঢুকে গেল। ফ্রেজাররাও ঘুরে দাঁড়াল কদেকঘরের দিকে যাবে বলে। হঠাৎ বৃদ্ধার বাড়ির দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল। আটদশজন সশসস্ত্র সৈন্য বেরিয়ে এল। বারান্দা থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নামল। ফ্রেজারদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রেজার অবাক। সৈন্যদের হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রেজার একবার পেছন ফিরে তাকাল। বন্ধুরাও অবাক। ফ্রেজার কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আত্মরক্ষার জন্যে ফ্রেজার তরবারি কোষমুক্ত করল। বন্ধুরাও তববারি খুলল। ভেন দুহাত তুলে বলে উঠল —ফ্রেজার ওরা সংখ্যায় বেশি। লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না। মাথা ঠাণ্ডা কর। ওরা কী বলে শোনা যাক। ভেন-এর কথামত বন্ধুরা তরোয়াল কোযবদ্ধ করল। এখন শুধু অপেক্ষা করা। সৈন্যরা ওদের নিয়ে কী করবে তাই দেখা।

সশস্ত্র সৈন্যদের দল থেকে একজন এগিয়ে এল। তার মুখে চাপ দাড়ি গোঁফ। আদেশের স্বরে বলল—তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রেজাররা তরোয়াল খুলে রাস্তায় ফেলল। খোলা তরোয়ালের ডগাটা ভেন-এর বুকে ঠেকিয়ে দাড়ি গোঁফ বলল—এ্যাই বুড়ো—তোরা কোত্থেকে এসেছিস্?

—আমরা ভাইকিংদের দেশ থেকে এসেছি। আমরা ভাইকিং। দেশ দ্বীপ ঘুরে বেড়াই। কোন গুপ্তধনের সংবাদ পেলে সেই গুপ্তধন বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করি।

—তারপর সেই উদ্ধার করা গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাস্। সৈন্যটি বলল।

ভেন বলল—এই অভিযোগ অন্যায়। উদ্ধার করা গুপ্তধন সেই সেই দেশের রাজার হাতে তুলে দিয়েছি আমরা। একটা স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নিই নি।

—রানি তুহিনার গুপ্তধন আছে এখানে। খুঁজবি নাকি? দাড়ি গোঁফ বলল।

এবার ফ্রেজার বলল—আমাদের দলনেতা কিছুদিন এখানকার শাসক মিনের কারাগারে হয়তো বন্দী। তাদের মুক্তি করতে পারলে এবং শাসক মিন যদি বলে তবে আমরা খুঁজবো।

—শাসক মিন কী করবে জানি না। আমরা কিন্তু মিনের সৈন্য নই। আমরা রানি ঈশাকার সৈন্য। মিনের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। লড়াই হবে দিন আট দশ পরে। আমরা জাতিতে বার্বার। শাসক মিন আরবীয়। লড়াই হবেই। যাক গেবনের বাইরে বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। একটু গলা চড়িয়ে বলল—মিনের সৈন্যরা যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। সবাই বনে ঢুকে পড়। তার আগে এই বিদেশি ভুতদের অস্ত্র কেড়ে নাও। দু'জন সৈন্য এসে ফ্রেজারদের পথের ওপর ফেলে দেওয়া তরোয়ালগুলি তুলে নিল।

ফ্রেজারদের নিয়ে দাড়ি গোঁফওয়ালা সর্দার বনের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর ফ্রেজারদের নিয়ে চলল। খুব একটা গভীর বন নয়। চাঁদের ভাঙ্গা আলো এখানে ওখানে পড়েছে। পথ বলে কিছু নেই। শুকনো ভাঙ্গা ডাল পাতায় শব্দ তুলে ফ্রেজাররা চলল।

বেশ কিছু পরে বনভূমি শেষ হল। ফ্রেজাররা দেখল একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ মত। তারপরেই পাথরের বাড়িঘরদোর। ফ্রেজাররা মাঠ পার হয়ে বাড়ি ঘরের কাছে এল। একটা পাথর বাঁধানো রাস্তায় এসে উঠলো। বাড়িঘরে আলো জ্বলছে না। নিস্তব্ধ চারদিক। পথ জনশূন্য। রাস্তা দিয়ে কিছুটা যেতেই একটা পাথরের লম্বাটে বাড়ি পড়ল। বাড়িটা অন্য সব বাড়ি থেকে অনেক বড়। বাড়িটার সামনে আসতে দাড়ি গোঁফওয়ালা সর্দার ডান হাতটা উঁচু করে বলল—থামো।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

সর্দার একটা ঘরের দরজার কাছে গেল। বাড়িটার সদর দরজা একটু দূরে। সদর দরজার দুপাশে পরপর ঘর। সর্দার দরজার কাছে গিয়ে কী বলল। দুজন পাহারাদারের একজন কোমর থেকে চাবির গোছা বের করল। একটা বড় ঘরের দরজার তালা খুলল। শক্ত কাঠের দরজাটা খুলে ধরল। সর্দার ফ্রেজারদের তাকিয়ে বলল—সবাই এই ঘরে ঢোকো। ফ্রেজাররা একে একে ঘরে ঢুকল। ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাথুরে দেয়ালের মধ্যে গর্ত। তাতে দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। মেঝেয় শুকনো ঘাসের বিছানা। দড়ি দিয়ে বিছানাটা শক্ত করে বাঁধা। তার ওপর একটা মোটা কাপড় পাতা।

সর্দার বলল—এই বাড়িটা হচ্ছে রানি ঈশিকার প্রাসাদের লাগোয়া কয়েদঘর। আরামেই থাকবে। সর্দার হো হো করে হেসে উঠল। ফ্রেজার হাসির মানেটা ঠিক বুঝল না।

ঘুরে ঢুকে ভাইকিংরা কেউ কেউ শুয়ে পড়ল কেউ কেউ বসল। শুধু ফ্রেজার বসল না। ঘরটায় পায়চারি করতে লাগল।

কিছু পরে ফ্রেজার ভেনের দিকে তাকিয়ে বলল—ভেন এখন কী করবো বলো।

—কিছু তো করার দেখছি না। বন্দীদশা মেনে নিতেই হবে। তাছাড়া আমরা নিরস্ত্র। আমাদের তরোয়াল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লড়াই করার প্রশ্নই নেই। ভেন বলল।

—এখন রানি ঈশিকা কী বলে সেটাই শোনার। কালকে আমাদের রানির দরবারে নিয়ে যাবে মনে হয়। রানির কথা থেকেই বুঝতে পারবো আমাদের মুক্তির ব্যাপারে সে কী ভাবছে। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে রানি যদি বলে আমাদের বন্দী হয়েই থাকতে হবে? পেড্রো বলল।

—তাহলে বন্দীই থাকতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—একটা কথা ভাববার—ভেন বলল—আমাদের বন্দী করে রেখে রানির কী লাভ?

—রানির কথা থেকেই সেটা বোঝা যাবে। ফ্রেজার বলল। তারপর বিছানায় বসল।

বাইরে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগান থেকে পাখির ডাক কিচিরমিচির ভেসে এল। ভাইকিংদের কারো কারো ঘুম ভেঙ্গে গেল। ফ্রেজারের ঘুম ভেঙ্গে গেছে আগেই। চোখ বুঁজে সমস্যার কথাটাই ভাবছে। ফ্রান্সিস নেই হ্যারি নেই শাঙ্কো বিস্কো কেউ নেই। অন্তত ফ্রান্সিস থাকলে সমস্যার সমাধান ভাবতে পারতো। আজকে ওরা একেবারে অসহায়। না, ফ্রেজার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসল। ফ্রান্সিসরা বেঁচে থাকলে কোথায় আছে অথবা ওদের হত্যা করা হয়েছে কিনা এসব জানতে পারলেও মনে জোর পাওয়া যেতো। কিন্তু ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। একেবারে অন্ধকার। ফ্রেজার এসব সাত পাঁচ ভাবতে লাগল।

শব্দ করে কাঠের বড় দরজাটা খুলে গেল। প্রহরীরা সকলের খাবার নিয়ে ঢুকল।

ফ্রেজার খুব মনোযোগ দিয়ে প্রহরীরা কিভাবে খাবার দিচ্ছে অন্য প্রহরীরা তখন কী করছে দেখতে লাগল। দেখল প্রহরীরা যখন খাবার দিচ্ছে অপেক্ষা করছে ওদের খাওয়া হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, প্রহরী দুজন চুপ করে ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে ফ্রেজারদের খাওয়া দেখছে। বাইরের চারজন প্রহরী দরজা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছে। ফ্রেজারদের দিকে নজর নেই। ফ্রেজার সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে লাগল খেতে খেতে ভাবতেও লাগল—কিভাবে কখন পালাতে হবে। ভেবে দেখল খাওয়ার সময়ই পালাতে হবে। এবার কী ভাবে

পালাবে সেটা ভাবতে লাগল।

ফ্রেজারদের খাওয়া হয়ে গেল। প্রহরীরা গামলা কাঠের বড় রেকাবি কাঠের বড় হাতা এসব জিনিস নিয়ে চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

একটু বেলা হল। কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। সেনাপতি ঢুকল। মাথায় উষ্ণীষ। গাল পর্যন্ত জুলপি। ইয়া বড় গোঁফ। বুকে বর্ম।

ঘরে ঢুকেই বাজখাঁই গলায় বলে উঠল—এখানে বাইকিং দেশের লোক কারা?

—আমরা। ফ্রেজার উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরাও উঠে দাঁড়াল।

—বাঃ তোমরা তো বেশ তাগড়াই জোয়ান। রানি ঈশিকা এরকম জোয়ানই তো চান। সেনাপতি বলল।

—আমাদের মত জোয়ান চান কেন? ভেন বলল।

—আছে—আছে—কারণ আছে। পরে বুঝবে। যাক গে—তোমরা দু'তিনজন বাইরে এসো। রানি ঈশিকার দরবারে যেতে হবে। সর্দার বলল।

—কেন যেতে হবে? ফ্রেজার বলল।

—তোমাদের বিচার হবে। সেনাপতি হা হা করে হেসে উঠল।

—ঠিক আছে। চলুন। ফ্রেজার বলল। তারপর ভেনকে ডেকে বলল—চলো তুমি আর আমি যাবো।

সেনাপতি কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের মাঠে এল। পেছনে ফ্রেজার আর ভেন। চলল দুজনে। প্রাসাদের শেষের দিকে রানি ঈশিকার দরবার কক্ষ। সেনাপতি ফ্রেজারদের সেই ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রেজার আর ভেন সেই ঘরে ঢুকল। দুইদিকে কয়েকটা জানালা থাকা সত্ত্বেও ঘরের ভেতরের অন্ধকার ভাবটা সম্পূর্ণ কাটে নি।

ফ্রেজার দেখল রানি ঈশিকা একটা পাথরের সিংহাসনে বসে আছে। আসলে গভীর নীল রঙের গদি আঁটা। ডানদিকে মন্ত্রী বসে আছে। রানির বয়েস হয়েছে। মুখে বলি রেখা। একটা বড় মুক্তো বসানো মুকুট মাথায়। মুকুটে মনিমানিক্য বসানো। মীনে করা। ঢোলা হাতা পোশাক সোনারূপোর কাজ করা। হাতে একটা দণ্ড। তাতেও মনি-মানিক্যের কাজ।

ফ্রেজাররা যখন পৌঁছল তখন রানির দরবারে একটা বিচার চলছিল। রানি একটু মাথা নুইয়ে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল। সব শুনে রায়দান করল। অভিযোগকারী মাথা নুইয়ে রানিকে সম্মান জানিয়ে চলে গেল। অভিযুক্তের দুহাত ধরে দুজন সৈন্য নিয়ে গেল।

এবার সেনাপতি রানির সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মাননীয় রানি—আমার একটা অভিযোগ ছিল।

—বলুন। রানি বলল।

ফ্রেজারকে দেখিয়ে বলল—এরা জাহাজে চড়ে আপনার রাজত্বে এসেছে। এরা জাতিতে ভাইকিং। বিদেশী। ওদের থর্ন বনভূমিতে ধরা হয়েছে। ওরা

বলছে ওরা বন্ধুদের খুঁজতে এখানে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয় এরা শাসক মিনের গুপ্তচর। আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবরাখবর নিতে এসেছে। এখন আপনার বিচার।

রানি ফ্রেজার আর ভেন-এর দিকে তাকাল। বলল—

—তোমরা এই দেশে এসেছো কেন?

—আমরা জাহাজে চড়ে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। এ ছাড়া যদি কোথাও গুপ্তধন ভাণ্ডারের বা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছুর সন্ধান পাই তাহলে বুদ্ধি খাটিয়ে সেইসব আমরা উদ্ধার করি। এর বদলে আমরা একটা স্বর্ণমুদ্রাও নিই না।

—বলো কি। অবশ্য তোমরা চুরি করলে কে আর ধরতে যাচ্ছে।

—আমরা চোর নই। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে জলদস্যু। রানি বলল।

—না—আমরা তাও নই। আপনাদের সন্দেহ হলে আমাদের জাহাজে তল্লাসী করুন। শুধু খাদ্যসংগ্রহের জন্যে আমরা কিছু স্বর্ণমুদ্রা রেখেছি। বাঁচতে তো হবে। ফ্রেজার বলল।

—কিন্তু সেনাপতি যে বললেন তোমরা শাসক মিনের গুপ্তধন—তার কী হবে? রানি বলল।

—মিছে বদনাম দেওয়া হচ্ছে। আমরা গুপ্তচরগিরি করতে যাব কেন? এই দেশ এখানকার জনসাধারণ তাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আজ এখানে আছি। কাল জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো অন্য দেশে। আপনি বা শাসক মিনের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত নয় তবে কেন আমরা গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো। ফ্রেজার বলল।

—যাক গে—তোমরা কত জন বন্দী হয়ে আছো? রানি বলল।

—সাতজন। ফ্রেজার বলল।

— সবাই কি তোমার বয়সী। রানি বলল।

—হ্যাঁ, শুধু এই ভেন—আমাদের বৈদ্য—এর বয়স বেশি। আর কী জানতে চান বলুন? ফ্রেজার বলল।

—দাঁড়াও—দাঁড়াও—রানী বলল। শোন —আমার এখন খুব অর্থাভাব চলছে। মাথায় লড়াইয়ের চিন্তা—তার জন্যেও আমার খরচ টানতে হচ্ছে। পেরে উঠছি না। সেইজন্যেই ভেবেছি কিছুদিনের মধ্যেই সমুদ্রতীরে ক্রীতদাস বেচাকেনার হাট বসবে। তোমাদের মত জোয়ানদের বিক্রী করতে পারলে ভালো দাম পাবো। আমার অর্থাভাব মিটবে।

ফ্রেজার চমকে উঠল। এই কথাটা ও একবারও ভাবে নি। ও ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল। ও জানে বলে লাভ নেই। রানি এখন অর্থ কিভাবে পাওয়া যাবে সেই চিন্তায় বিভোর। তবু ফ্রেজার বলল—দেখুন—শাসক মিন আর

আপনাদের সম্পর্ক খুব খারাপ। কিছুদিনের মধ্যেই লড়াই হবে। এদিকে ক্রীতদাসের হাট বসবে সমুদ্রতীরে। হয় আপনার রাজত্বে নয় তো মিনের রাজত্বে। কিন্তু আপনারা তো পরস্পরের শত্রু। ক্রীতদাসের হাটে অন্যদের নিয়ে যাবেন কী করে?

এতক্ষণে রানি হাসল। বলল—ক্রীতদাসের হাট মাত্র তিনদিন চলে। সে সময় আমরা আমাদের বিবাদ ভুলে থাকি। আমরা আর ধারেকাছের দেশগুলো থেকেও রাজারা হাটে আসে। ক্রীতদাস কেনা বেচা চলে। একটা দিন কারোর সঙ্গে কারোর শত্রুতা করতে নেই।

—বাঃ—ফ্রেজার হেসে বলে উঠল—তিনদিনের জন্যে আপনারা শত্রুতা ভুলে যান। বরাবরের জন্যে শত্রুতা ভুলতে পারেন না কেন?

—সেটা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে লড়াই লাগবেই। মিনও যুদ্ধ চায়, আমিও যুদ্ধ চাই। রানি বলল।

—আমাদের মুক্তি দিলে আপনাকে আমরা অর্থ দেব। ফ্রেজার বলল।

রানি হেসে উঠলেন—তোমরা তো গরীব ভিখিরি। তোমরা অর্থ দেবে কোত্থেকে।

—আমাদের একবার চেষ্টা করতে দিন। ফ্রেজার বলল।

—না—না। তোমাদের মুক্তি দিলে আমার সব পরিকল্পনাই মার খাবে। আমার অর্থ সমস্যাও মিটবে না। আসলে ক্রীতদাসের হাট যখন বসে আমরা কয়েদঘরে আটক থাকা সব বন্দীকেই ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে দিই। এই নিয়ম বরাবর চলে আসছে। রানি বলল।

—এই নিয়মটা ভালো কি মন্দ—তা বোধহয় কোনদিন ভেবে দেখেন নি। ভেন বলল।

—না—না—এতে ভাববার কী আছে। নিয়মটা চলে আসছে—চলে আসছে। রানি বলল।

—আপনি একজন নারী। নারী হয়ে এরকম একটা অমানুষিক কাজ করেন কী করে। আপনার কি বিবেক বলে কিছু নেই। ভেন বলল।

রানি ঈশিকা জোরে হেসে উঠল। বলল—ক্রীতদাস না থাকলে কি চলে। চাষাবাদ বাগান করা সেসবের দেখাশুনো—ক্রীতদাসের। এতসব কাজ ক্রীতদাসরা ছাড়া কারা করবে।

—তাহলে আপনি স্থির করে ফেলেছেন—আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রী করবেন। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ। কাজেই তোমাদের মুক্তি নেই। রানি বলল।

—বেশ। ফ্রেজার বলল। সেনাপতির পেছনে পেছনে ফ্রেজাররা দরবার কক্ষথেকে বেরিয়ে আসছে তখনই একজন সৈন্য এসে সেনাপতিকে কী বলল।

সেনাপতি ফ্রেজারদের দিকে তাকিয়ে বলল—রানি তোমাদের ডেকেছেন। দরবারে চলো।

ভেন ও ফ্রেজাররা আবার দরবার কক্ষে ফিরে এল। রানির সামনে এসে দাঁড়াতে রানি বলল—তোমাদের নাম কী?

—আমি ফ্রেজার, আমার সঙ্গী ভেন। ফ্রেজার বলল। রানি বলল—তোমাদের মুক্তির উপায় আছে। ফ্রেজার কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না।

—শোনো—তোমরা যদি শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে ওদের যুদ্ধের পরিকল্পনা কী সেটা জেনে আসতে পারো তাহলে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে। ফ্রেজার চুপ করে রইল। দ্রুত ভাবতে লাগল—কী করবো? গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত গর্হিত কাজ নিচু কাজ। এটা করা যাবে না।

—কী হল? রানি বলল।

—একটু ভাবতে সময় দিন। ফ্রেজার বলল।

—বেশ ভাবো। রানি বলল।

ফ্রেজার কিছুক্ষণ ভাবল। ভেবে দেখল—শাসক মিনের রাজত্বে আমাদের যেতেই হবে। ফ্রান্সিসরা নিশ্চয়ই ওখানে বন্দী হয়ে আছে। বন্দী না হলেও ওরা কোথায় কিভাবে আছে সেটা জানা যাবে। সেটা জানলেই পরে কী করবো তা স্থির করা যাবে। কিন্তু কয়েদঘরে পড়ে থাকলে কিছুই জানা যাবে না। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হয়ে যেতে হবে।

ভেন এ সময় বলল—ফ্রেজার আমরা গুপ্তচরবৃত্তি করবো না।

ফ্রেজার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—ভেন —ঐ গোঁ ধরে বসে থাকলে আমাদের ক্ষতিই হবে। আমি পরে সব বুঝিয়ে বলবো। এখন রানি যে প্রস্তাব দিল সেটা গ্রহণ করা যাক।

—ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বোঝ করো। ভেন বলল।

ফ্রেজার রানির দিকে তাকিয়ে বলল—মহামান্যা রানি—আপনি যে প্রস্তাব দিলেন সেটা আমরা গ্রহণ করলাম। আমাকে আর ভেনকে মুক্তির আদেশ দিন। আমরা মুক্তি পেলে-থর্ন বনভূমির মধ্যে দিয়ে শাসক মিনের রাজত্বে যাবো। যুদ্ধের গোপন খবর জোগাড় করে ফিরে আসবো।

—আর তোমাদের বন্ধুদেরও মুক্ত করে আনবো। তোমাদের সবাইকে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করতে পারলে আমার আর কোন অভাব থাকবে না। রানি বলল।

—কিন্তু আমরা এরকম কথা দিতে পারি না। বন্ধুরা যদি বন্দী হয়ে থাকে তবে তাদের মুক্ত করতে পারবো এরকম কথা বলে লাভ নেই। কারণ বন্ধুরা কী ভাবে কোথায় আছে আমরা এখনও জানি না। ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে-তোমরা ছ জন থাকলেই চলবে। রানি বলল।

—তাহলে দেরি না করে তোমরা এখনই বেরিয়ে পড়। রানি বলল।

—না—আমরা কয়েদঘরে যাবো এখন। বন্ধুদের সব বুঝিয়ে বলবো। তারপর থর্ন বনভূমির দিকে যাত্রা করবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ—তাই করো। আমি সেনাপতিকে সেই আদেশই দিচ্ছি। রানি বলল।

রানি সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—সেনাপতি —এই দু'জনকে আমি শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিচ্ছি। এরা শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে কী কাজ করতে বলেছি তা তো শুনেছেন। আপনি সেভাবেই কাজ করুন।

রানিকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

সেনাপতি ফ্রেজারদের নিয়ে কয়েদঘরে এল। পাহারাদার দুজনকে ডেকে বলল—দ্যাখো—এই দুজন বন্দীকে রানি শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছেন। এরা যখন মুক্তি চাইবে তখনই মুক্তি দেবে।

সেনাপতি চলে গেল। ফ্রেজাররা কয়েদঘরে ঢুকল। বন্ধুরা কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। বলল—ফ্রেজার রানির সঙ্গে কী কথা হল?

—সব বলছি। ফ্রেজার বলল। তারপর বন্ধুদের লক্ষ্য করে বলল—ভাই সব—আমি খুব সমস্যায় পড়েছি; রানি আমাকে আর ভেনকে মুক্তি দিয়েছে কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার গোপন খবর আমাদের নিয়ে আসতে হবে।

—এ তো গুপ্তচরের কাজ। এক ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল।

—হ্যাঁ—গুপ্তচরবৃত্তি। এখন আমি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়েছি।

একজন ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল।—বলো কি।

ফ্রেজার বলল—হ্যাঁ, আমরা রাজি হয়েছি। একটু থেমে ফ্রেজার বলল—ভাইসব —ভেবে দেখ। ফ্রান্সিসরা কোথায় কী অবস্থায় আছে আমরা কিছুই জানি না। আবার আমরা এখানে কয়েদঘরে পড়ে আছি। আমাদের এখন দিশেহারা অবস্থা। কাজেই অন্তত আমি আর ভেন মুক্ত হয়ে ফ্রান্সিসদের খোঁজখবর করতে পারবো। তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবো। যত শিগগির সম্ভব এটা করতে হবে। রানি ঈশিকা স্থির করে রেখেছে জাহাজঘাটায় যে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে সেখানে আমাদের সবাইকে বিক্রি করবে। আমরা সবাই যুবক এক ভেন বাদে—কাজেই আমরা ভালো দামে বিকোবো। অর্থাৎ রানি আমাদের জন্যে ভালো দর পাবে। ফ্রেজার থামল। তারপর বলতে লাগল—কাজেই বেশি দিন আমাদের হাতে নেই। এর মধ্যেই আমাদের পালাতে হবে। কাজেই আমি আর ভেন এ অবস্থায় কয়েকদঘরের বাইরে থাকতে পারলে পালাবার ব্যবস্থা করতে পারবো, ফ্রান্সিসদের খোঁজখবরও নিতে পারবো। বন্দী হয়ে এখানে পড়ে থেকে কিছুই করতে পারবো না। তাই গুপ্তচরবৃত্তির কাজ আমাদের করতে হবে। আমরা এখন নিরুপায়।

ভাইকিং বন্ধুরা কোন কথা বলল না। সবাই বুঝতে পারল ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ ছাড়া অন্যকিছু করার উপায় নেই। যদি ফ্রেজাররা মুক্ত থাকে তাহলে

সবদিক থেকেই মঙ্গল। ফ্রেজার বাইরে থেকে ফ্রান্সিসদের খোঁজখবর করতে পারবে আবার ওদের মুক্তির জন্যেও চেষ্টা করতে পারবে। কাজেই ফ্রেজারের সিদ্ধান্ত ওরা মেনে নিল।

দুপুর তখন। ঢং ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। খাবার নিয়ে ঢুকল কয়েকজন পাহারাদার। দেওয়া হল গোল করে কাটা রুটি পাখির মাংসের ঝোল শাকসব্জি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইকিংদের খাওয়া হয়ে গেল। পাহারাদাররা কাঠের থালা বাটি রেকাবি এসব নিয়ে চলে গেল। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেজার এসে ঘাসের বিছানা রাখল। অনেক চিন্তা ওর মাথায়। তখনই ভাবলো—ফ্রান্সিসদের খোঁজখবর যুদ্ধের গোপন খবর এসব করতে হলে এই বিদেশী পোশাকে চলবে না। এদেশী পোশাক চাই।

ফ্রেজার উঠে দরজার কাছে এল। একজন পাহারাদারকে ডাকল। পাহারাদার এল। ফ্রেজার বলল—সেনাপতিকে একবার ডেকে দাও। জরুরী কথা আছে। পাহারাদারটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। ফ্রেজার বলল—দেখুন যে কাজে আমরা যাচ্ছি তা সুষ্ঠভাবে করতে গেলে আমাদের এই বিদেশী পোশাক চলবে না। আপনি দুজোড়া ঢোলা হাতা পোশাক দিন। এ দেশের লোকেরা যেমন পরে।

—তাহলে তো পোশাক তৈরি করাতে হয়। সেনাপতি বলল।

—না—না—আমাদের পুরোনো পোশাক দিন ছেঁড়াখোড়া হলে আরো ভালো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ—দেখছি। পেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেনাপতি বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রেজার অপেক্ষা করতে লাগল। এই কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে কী কী করবে তাও ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন পাহারাদার দুটো ছেঁড়া পোশাক নিয়ে এল। পোশাক দেখে ফ্রেজার খুশি। ফ্রেজার একটা পোশাক ভেনকে দিল। অন্যটা নিয়ে ভাইকিংদের পোশাকেরা ওপরেই পরে নিল। দেখাদেখি ভেনও তাই করল।

ফ্রেজার আর ভেন দরজার কাছে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাই সব—আমরা আজ সকলেই বিপদগ্রস্ত। হতাশ হয়ো না। মিছিমিছি তোমাদের রক্তপাত মৃত্যু আমি চাই না। আমার ওপরে ভরসা রাখো। সময়মত সব হবে। সব বিপদ আপদ কাটিয়ে আমরা দেশের দিকে জাহাজ ভাসাবো। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। ফ্রেজারের কথামত এক প্রহরী ওদের দু'জনের জন্যে দুটো তরোয়াল এনে দিল।

ততক্ষণে এক পাহারাদার দরজা খুলে দিয়েছে। ফ্রেজার আর ভেন কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। সামনের ঘাসে ঢাকা প্রান্তর পার হয়ে চলল থর্ন বনভূমির দিকে।

দুজনে থর্ন বনভূমিতে ঢুকল। বেশ ঘন গাছপালা। পথ বলে তো কিছু নেই। গাছগাছালির জটলার মধ্যে দিয়ে ওরা চলল। মাঝে মাঝে বুনো লতায় পা আটকে যাচ্ছে। তরোয়ালের কোপে লতাগাছ কেটে ফেলে দুজনে চলল।

গাছের মোটা গুঁড়ি লতাগাছ এসব নজরে রেখে ওদের যেতে হচ্ছে। বেশ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সাবধানে পা রেখে রেখে যেতে হচ্ছে ওদের। বনে লতাগাছে পা জড়িয়ে যেতে পারে। ভীষণ পেছল গাছের গুঁড়িতে পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। হঠাৎ সেই বনভূমি অনেক পাতলা হয়ে এল। ছাড়া ছাড়া গাছপালা। এখানে অন্ধকারও অনেকটা কেটে গেছে। অনেকটা অস্পষ্ট গাছপালা। গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি আর দেখা যাচ্ছে না। গাছের গুঁড়িগুলো আর বড় নয়। সাধারণ উচ্চতার গাছ সব।

গাছের গুঁড়িগুলো আর বড় নয়।

ছাড়া ছাড়া গাছের বনটা পার হতে দুজনে আর দেরি করতে চাইল না। বনের মধ্যে যতটা দ্রুত যাওয়া যায় সেইভাবে চলল। গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছোটা সহজ নয়। ওদের দেরি হতে লাগল। ফ্রেজার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটতে গেল। ভেন বাধা দিচ্ছিল। বলছিল—ফ্রেজার অত দ্রুত ছুটো না। এতে আমরা পথ ভুলতে পারি। একবার এখানে পথ ভুল হলে আমাদের ভোগান্তির একশেষ হবে। কাজেই দেখে শুনে চলো। দেরি হোক ক্ষতি নেই। লক্ষ্য করতে হবে ঠিক উত্তরমুখো যাচ্ছি কিনা।

—কিন্তু এই ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিক হারানো অসম্ভব কিছু না।

—ভেন আমি জাহাজ চালাই। দিক ঠিক রাখা আমার পক্ষে সহজসাধ্য। ফ্রেজার বলল।

—সে তোমার সমুদ্রের বুকে। এখানে বন গাছপালা ওপরে ভালো করে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। এসব দিকভ্রান্তি ঘটাতে পারে। ভেন বলল।

—হুঁ। সেটা একটা সমস্যা বটে। যাকগে—অনেকটা এলাম কিন্তু এখনও বন শেষ হল না। ফ্রেজার বলল।

—আমাদের দিক ভুল হল না তো? ফ্রেজার বলল।

—কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে থর্ন বনটা কি এদিকেও বিস্তৃত? ভেন বলল।

—অসম্ভব নয়। হয়তো আমরা এখনও থর্ন বনের মাঝামাঝি এসেছি। আগে যেতে হবে। ভেন বলল।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। ফ্রেজার বলল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দিকে আঙুল তুলল।

দুজনেই দেখল একটা টিলামত। ওখানেও টিলার চারপাশে গাছগাছালি। বনের মতই জায়গাটা। ফ্রেজার বলল—ঐ টিলাটার চারপাশেই বন। তবে কি এটাই শাসক মিনের রাজ্য?

—ওখানে পৌঁছে সেটা দেখতে হবে। ভেন বলল।

—কিন্তু ওখানে গিয়ে সেটা কীভাবে জানবো? তবে একটা বাঁচোয়া আমাদের পরনে এদেশীয় পোশাক। প্রথমেই আমাদের বিদেশি বলে মনে হবে না। ফ্রেজার বলল।

দুজনেই এবার গতি কমাল। বন শেষ। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের আড়ালে। সামনেই দেখা গেল একটা মাঠমত। সেখানে সশস্ত্র সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে।

—এরাই কি শাসক মিনের সৈন্য? এটাই কি তাহলে শাসক মিনের রাজত্ব?

—ভেন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—উঁহু—শাসক মিনের যোদ্ধারা এত কম হতে পারে না।

—কিন্তু শাসক মিনের কত সৈন্য তা তো আমরা জানি না। তবে মাঠের ডানদিকে দেখা যাচ্ছে দুটো সৈন্যাবাস। সুতরাং ধরেই নিতে হয় শাসক মিনের সৈন্যসংখ্যা কম। ফ্রেজার বলল।

—এখন কী করবে? ভেন বলল।

—খবর জোগাড় করা—কবে নাগাদ শাসক মিন রানি ঈশিতার রাজ্য আক্রমণ করবে। সৈন্যসংখ্যা কত—এসব খবর জোগাড় করতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—চলো—ঐ টিলার নিচে নিশ্চয়ই বসতি আছে। ওখানেই শাসক মিনের রাজবাড়িও হয়তো রয়েছে। ভেন বলল।

—এটা ভাবছো কী করে? ভেন বলল।

—খুব সহজে। এখানে শুধু সেনাপতি আর যোদ্ধাদের থাকার জায়গা। ফ্রেজার বলল।

—চলো—সব আগে দেখি। ভেন বলল।

দুজনে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। গাছ বুনো ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলল সৈন্যাবাসের বাড়ি ছাড়িয়ে পেছনে টিলাটার দিকে।

দুজনে কিছুটা এগিয়ে দেখল একটা রাস্তামত। সোজা চলে গেছে টিলাটার দিকে।

এবারে হল সমস্যা। রাস্তায় নামলেই এখানকার লোকজনেরা ওদের দুজনকে দেখতে পাবে। বলা যায় না কেউ কেউ হয়তো ওদের দুজনকে বিদেশি বলে ধরে নিতে পারবে। সৈন্যদের খবর দেবে। আবার বন্দীদশা।

ফ্রেজার ভাবল এসব সমস্যা তো থাকবেই। এসব ব্যাপার ঘটবেই। সেটা না ঘটিয়ে কী করে খবর সংগ্রহ করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

—এখন এই দিনের বেলা না বেরুনোই ভালো। ভেন বলল।

—কিন্তু এখন তো খাবার ব্যবস্থা করতে হয়। না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে—ভেন বলল—আমি খাবার জোগাড়ে যাচ্ছি তুমি এই গাছের আড়াল থেকে বেরিও না।

—কিন্তু তুমি আবার বিপদে পড়বে না তো? ফ্রেজার বলল।

—আরে আমার মত বুড়ো হাবড়াকে কেউ কিছু বলবে না। তোমাদের পক্ষে যাওয়াই বিপদ। তো ফ্রেজার কিছু অর্থ তো দিতে হবে। ফ্রেজার কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করল। বলল—এটা দেবে আর বলবে যে আমরা কয়েকদিন এখানে খাবো। প্রয়োজনে থাকবোও।

ভেন চলে গেল। রাস্তায় লোকজন বেশি নেই। ভেন হেঁটে চলল। দেখল যত ঘরবাড়ি সব এদিকেই। এখান থেকে সৈন্যাবাস বেশি দূরে নয়।

যেতে যেতে দুএকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল সরাইখানা কোথায়।

ভেন একটা সরাইখানার সামনে এল। সরাইখানার মালিককে বলল—আমি আর আমার এক বন্ধু খাবো। কিন্তু বন্ধুটি অসুস্থ। আসতে পারবে না। আমি এখান থেকে নিয়েই যাবো। বন্ধুটির জন্যে খাবার নিয়ে যাবো। দিতে পারবেন?

—কেন নয়। পাতাটাতা দিয়ে বেঁধে দেব। সরাই মালিক বলল।

—তাহলে তো খুব ভালো হয়। ভেন বলল।

ভেন এসে টানা তক্তাটায় বসল। একটু পরেই সরাইখানাওয়ালা কাজের ছেলেটিকে বলল ভেনকে খাবার দেবার জন্যে।

একটু পরেই ছেলেটি কাটা রুটি মাংস সবজি দিয়ে গেল। ভেন বুঝল—বড় খিদে পেয়েছে। চেখে খাওয়ার ধৈর্য নেই। হাপুস হুপুস খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ খাওয়ার পর ভেন বলল—আপনার দোকানে থাকার ব্যবস্থা আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। পাতবার তুলোর গদীমত বালিশ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনি থাকবেন? সরাইখানার মালিক বলল।

—সেটা এখনও ঠিক করি নি। রাতে খেতে এসে বলবো। ভেন বলল।

খেতে খেতে ভেন বলল—আচ্ছা—এটা তো আরবী শাসক মিনের রাজ্য?

—না—না। মালিক বলল।

—বলেন কি। ভেন হাঁ করে সরাইওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

সরাইওয়ালা বলতে লাগল—শাসক মিনের রাজত্ব হল উত্তর দিকে। এখানকার শাসক ওয়াজির্মো। ভেন আর কোন কথা বলল না। বুঝল—সব কষ্টই বৃথা গেল। আবার যেতে হবে শাসক মিনের রাজত্বে। বোঝা যাচ্ছে থর্ন বনের উত্তর দিকে মিনের রাজত্ব। এটা থর্ন বনের পূবদিক। ভেন বলল—রাজা ওয়াজির্মোর রাজবাড়িটা কোথায়?

—কাছেই। ঐ টিলাটার নিচে। মালিক বলল।

—শাসক ওয়াজির্মো কেমন লোক? সরাইওয়ালা ভেনের কাছে এল।

গলা নামিয়ে বলল—রাস্তার গুণ্ডা রাজা হয়েছে। কে জানে কত মানুষ হত্যা করে ওয়াজির্মো রাজা হয়েছে। সাধারণ মানুষ শাসক ওয়াজির্মোর ওপর খুব রেগে আছে। কিন্তু কী করবে? ক্ষমতা তো শাসক ওয়াজির্মোর হাতে।

—ও।

তখনই রাস্তা দিয়ে ওয়াজির্মোর সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে গেল।

—এখানে যুদ্ধের আয়োজন চলছে। ভেন বলল।

—হ্যাঁ। রানি ঈশিতার রাজ্য ওয়াজির্মো দখল করতে যুদ্ধের আয়োজন করছে। মালিক বলল।

—যা দেখলাম—শাসক ওয়াজির্মোর সৈন্যসংখ্যা খুবই কম।

—কিন্তু উপায় নেই। শাসক ওয়াজির্মো প্রত্যেক দিন সকালে বিকেলে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখে। প্রজাদের সামনে বক্তৃতা দেয়। প্রজাদের উৎসাহিত করে রানি ঈশিতার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে। মালিক বলল।

—প্রজাসাধারণ কি উৎসাহিত হয়েছে? ভেন বলল।

—না—না। কিন্তু উপায় নেই। সেনাপতিটি রাজ্যের সর্বত্র নজর রাখছে কতকগুলি বিশেষ সৈন্যদের সাহায্যে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে অনেকে মারা গেছে। যেমন রাজা ওয়াজির্মো তেমনি তার সেনাপতি। দুজনের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলে কে কত হিংস্র তার প্রমাণ দেওয়ার। কিন্তু শাসক ওয়াজির্মোকে চটাতে কেউ সাহস পায় না। মন্ত্রীও বৃদ্ধ। চুপ করে থাকে। মালিক বলল।

—বিকেলে রাজবাড়িটা দেখবো। ভেন বলল।

—দেখলে অবাক হবেন—এই তল্লাটে এত বড় প্রাসাদ নেই। এত অর্থব্যয়ে কোন রাজা বা রানি অট্টালিকা করতে পারে নি। ঐ প্রাসাদের অর্থ আমরাই দিয়েছি। মালিক বলল।

—তাহলে আপনাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। ভেন বলল।

—সে তো বটেই। মালিক বলল।

—ভেন উঠে দাঁড়াল। মালিক পাতায় জড়ানো খাবার ভেনকে দিল।

খাবার নিয়ে ভেন বলল—চলি ভাই। আমি আর আমার বন্ধু সন্ধ্যেবেলা আসবো।

ভেন আস্তে আস্তে হেঁটে সেই গাছটার কাছে এল। ফ্রেজার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। খাবার নিয়ে ঘাসে ঢাকা মাটিতে বসল। খেতে লাগল। ভেন চুপ করে বসে রইল। ক্ষুধার্ত মানুষটা খেয়ে তৃপ্ত হোক। ভেন কোন কথা বলল না। খেতে খেতে ফ্রেজার বলল—কী খবর এনেছো বলো।

—বলছি তুমি খেয়ে নাও। ভেন বলল।

ফ্রেজারের খাওয়া শেষ হল। ভেন ওর পাশে বসল।

—জল তো খাওয়া হল না। ভেন বলল।

—পরে খাবো। তুমি কী খবর আনলে বলো।

—ফ্রেজার —আমরা ভুল করে অন্য এক দেশে এসেছি। ভেন বলল।

—তার মানে? ফ্রেজার ভেন-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

—আমরা শাসক ওয়াজিমোর রাজত্বে এসেছি—পথ ভুলে। ভেন বলল।

—বলো কি। তাহলে বনভূমিতেই আমরা পথ হারিয়েছিলাম। ফ্রেজার বলল।

—বনের মধ্যে পথ কোথায়? আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিলাম। ভেন বলল।

—তাহলে এখন কী করবো? ফ্রেজার বলল।

এবার ভেন আস্তে আস্তে বেশ কিছুক্ষণ সরাইওয়ালার কাছে যা-যা শুনেছিল সে সব বলল। সব শুনে ফ্রেজার বলল—তাহলে এখানে থেকে কী হবে?

—হবে। আমি সরাইওয়ালাকে বলে খাবার ব্যবস্থা করেছি। সন্ধ্যে হলে সেখানে যাবো। ভেন বলল।

—কিন্তু এখানে থাকতে চাইছো কেন? ফ্রেজার বলল।

—দেখ ফ্রেজার—আমরা রানিকে বলেছি আমরা গুপ্তচর হয়ে শাসক মিনের রাজ্যে যাবো—যুদ্ধের গোপন খবর নিয়ে আসবো। তার সঙ্গে এই শাসক ওয়াজিমোর যুদ্ধ প্রস্তুতির খবরও নিয়ে গিয়ে জানাবো। আমার মনে হয় রানি এই শাসক ওয়াজিমো—যে তার রাজ্য আক্রমণ করবে এই সংবাদটা জানে না। এখন এইখানে থেকে আমরা যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু গোপন খবর সংগ্রহ করবো। তারপর ফিরে গিয়ে রানি ঈশিতাকে জানাবো। দুটো রাজ্যের দুটো সংবাদ রানিকে জানাতে পারলে রানি নিশ্চয়ই খুশি হয়ে আমাদের মুক্তি দেবে। অন্য কোনভাবে মুক্তি পাবো না। ভেন বলল।

ফ্রেজার কিছুক্ষণ ভাবলো তারপর বলল—ভেন—তোমার কথা ঠিক। দু দুটো গোপন সংবাদ দিতে পারলে রানি নিশ্চয়ই আমাদের মুক্তি দেবে।

—ভেবে দেখ—বাধ্য হয়ে আমরা গুপ্তচরবৃত্তির মত হীন কাজ করছি। আমরা নিরুপায়। যেভাবেই হোক এই পথটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভেন বলল।

—কিন্তু প্রথমে তো দিক ভুল করে এখানেই এসে পড়েছি। এবার এখান থেকে শাসক ওয়াজিমো কীভাবে রানি ঈশিতার দেশ আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে এটা জেনে রানিকে সাবধান করে দিতে পারলে রানি খুব খুশি হবে। আমরাও মুক্তি পাবো। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে এখন কী করবে? ভেন বলল।

—এখানেই সরাইখানায় থাকবো ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করবো। ফ্রেজার বলল।

—কিন্তু যদি ধরা পড়ি তাহলে কিন্তু মরতে হবে। ভেন বলল।

—যাতে মরতে না হয় সেইমত কাজে নামতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—দেখা যাক গুপ্তচরবৃত্তিতে আমরা কতটা সফল হই। ভেন বলল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। ফ্রেজার আর ভেন গাছতলায় বসে রইল। যখন সন্ধ্যের পর রাত হল তখন দুজনে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় নামল। হাঁটতে হাঁটতে সরাইখানাটার সামনে এল।

ওরা এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকল। সরাইখানায় বেশ ভিড়। ভিড় কাটিয়ে ভেন সরাইওয়ালার কাছে গেল।

বলল—চিনতে পারছেন?

মোমবাতির আলোয় ভেনকে দেখে সরাইওয়ালা চিনল।

—নিশ্চয়ই। একটা কাজের ছেলেকে সরাইওয়ালা ডাকল। ছেলেটি এলে বলল—যা—দুটো বিছানা পেতে দে। ছেলেটি পেছনের দিকে চলল। লম্বা ঘর। তার ওপর লম্বা ফুল লতাপাতা আঁকা মোটা কাপড়। ছেলেটি বালিশ রেখে চাদরটা টেনে তুলে ঠিক করে দিল। চলে গেল।

ভেন শুয়ে পড়ল। বলল—অত ভিড়ে আমরা খেতে যাবো না। রাত হোক। পরে খাবো। ফ্রেজার উঠল। বসে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরো দুজন লোক এল। ছেলেটি তাদেরও বিছানা বালিশ ঠিক করে দিয়ে চলে গেল।

—ফ্রেজার? ভেন বলল।

—বলো।

—দেখ—এখনি কিছু দরকারি কথা সেরে ফেলি। পরে ভিড় বাড়বে।

—বলো। কথাটা বলে ফ্রেজার ভেনের মুখের দিকে ঝুঁকে বসল।

—কীভাবে খবরটবর জোগাড় করবে? ভেন বলল।

—দেখ—আমি যা ভেবেছি বলছি। একটু থেমে ফ্রেজার বলল—রাজবাড়িতে মন্ত্রণাকক্ষটা কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

—কক্ষটি নিশ্চয়ই রাজবাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে। ভেন বলল।

—তা তো বটেই। কিন্তু সেই ঘরটা রাজবাড়ির কোথায়? ফ্রেজার বলল।

—রাজবাড়িতে না গেলে জানা যাবে না। ভেন বলল।

—তাহলে কালকে সকালে চলো। রাজবাড়ির মধ্যে যেতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—প্রধান প্রবেশ পথে নিশ্চয়ই প্রহরীরা থাকবে। ভেন বলল।

—থাকবে তো বটেই। ওদের ধোঁকা দিতে হবে। সেইসঙ্গে মন্ত্রণাকক্ষটি কোথায় তাও জানতে হবে। ফ্রেজার বলল।

সে রাতটা কাটল। বেশ ভিড় হল সরাইখানায়। কিন্তু ফ্রেজার আর ভেন এর বিশেষ অসুবিধে হয় নি। কিন্তু নানা চিন্তা তো মাথায়। ভালোভাবে ঘুমুতে পারেনি। একটু বেশি রাতেই দুজন ঘুমোতে পেরেছিল। কাজেই একটু বেলায় দুজনের ঘুম ভাঙল।

প্রাতরাশ খেয়ে দুজনে তৈরি হল। তরোয়াল নিল না।

বেলা বাড়ল। দুজনে চলল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। বেশ হাঁটতে হল। রাজবাড়ির সামনে এল। সত্যি বেশ অর্থব্যয় করে বাড়িটা নির্মাণ করা হয়েছে। দামি পাথর আর শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি। সদর দেউড়িতে প্রহরী আছে চারজন। চারজনের হাতেই পেতলের ঝক্‌ঝকে বর্শা। কোমরে তরোয়াল।

ফ্রেজার আর ভেন সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সদর দরজা বন্ধ। দুজনে এল লোহার গরাদে তৈরি সদর প্রবেশ দ্বারে। ফ্রেজাররা গরাদের ফাঁক দিয়ে রাজবাড়ির ভেতরটা দেখতে লাগল। সদর দেউড়ির পরেই বেশ বড় দুটো ফুল বাগান। তারপরেই রাজবাড়ি। দুটো বাগানের মধ্যে দুটো ফোয়ারা।

ফ্রেজার একজন প্রহরীকে বলল—আচ্ছা আমরা ভেতরে ঢুকে রাজবাড়ি দেখতে পারিনা?

—না। ভেতরে যাওয়ার অনুমতি আনতে হবে সেনাপতির কাছ থেকে।

—আমরা ভেতরটা দেখতে চাই। সেনাপতিকে কোথায় পাবো? ফ্রেজার বলল।

—ঐ যে শুধু কাঠে তৈরি বাড়িটা—প্রহরী আঙ্গুল দিয়ে দেখাল—ঐ বাড়িটার পরেই দামি পাথরের বাড়িটা। সেনাপতির বাড়ি ওটাই। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রেজার বলল।

দুজনে সদর রাস্তায় এল। চলল সেনাপতির বাড়ির দিকে। কাঠের বাড়িটার পরেই সেনাপতির বাড়ি।

সেনাপতির বাড়ির দরজায় দুজন সশস্ত্র প্রহরী। ফ্রেজার একজন প্রহরীকে বলল—সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেনাপতি দেখা করতে দেবেন কিনা এটা জানতে পারলে ভালো হত।

—দেখছি। একজন প্রহরী বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরে প্রহরীটা ফিরে এল। বলল—বাইরের ঘরে অপেক্ষা কর। সেনাপতি আসবেন।

প্রহরী দরজা খুলে ধরল। ফ্রেজাররা বাইরের ঘরে ঢুকল। মোটামুটি সাজানো গুছোনো ঘরটা।

দুজনে কালো কাঠের চেয়ারে বসল। একটু পরেই সেনাপতি ঘরে ঢুকল। গদিপাতা চেয়ারটায় বসল। ফ্রেজারদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা বিদেশি।

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। ফ্রেজার বলল।

—হুঁ—তা আমার কাছে কী মনে করে? সেনাপতি বলল।

—আমরা রাজবাড়িটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই। তাই আপনার অনুমতি চাই। ফ্রেজার বলল।

—হঠাৎ রাজবাড়ি দেখার শখ হল কেন? সেনাপতি বলল।

—রাজা ওয়াজিমোর রাজপ্রাসাদ নাকি এত সুন্দর যে লিসবনেও এত সুন্দর অট্টালিকা নেই। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ। কথাটা মিথ্যে শোনো নি। যাকগে—আমি একঘণ্টার সময় দিচ্ছি। তার বেশি থাকতে পারবে না। সেনাপতি বলল।

—এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। ভেন বলল।

পাথরের টেবিলের ওপর থেকে সেনাপতি একটা পার্চমেন্ট কাগজ নিল। পাখির পালকে তৈরি কলমটা হাতে নিল। রুপোর দোয়াতদানে কলমটা ডুবিয়ে নিল। লিখতে লাগল। লেখা হলে কাগজটা ফ্রেজারের হাতে দিল।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে দুজনে শাসক ওয়াজিমোর প্রাসাদের সামনে এল। দেউড়ির কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী কাছে এলে সেনাপতির অনুমতিপত্রটা দেখাল। প্রহরী অনুমতিপত্রটা নিয়ে আরেকজন প্রহরীর কাছে গেল। তার হাতে দিল। বোঝা গেল ঐ প্রহরীটিই এদের দলপতি।

প্রহরীটি অনুমতিপত্রটি হাতে নিয়ে ফ্রেজারদের কাছে এল। বলল—সেনাপতি এক ঘণ্টার সময় দিয়েছেন। তোমরা কখন দেখতে যাবে?

—এখনই যাবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ। এই বলে সে একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরীটি এলে তাকে বলল—এই দুজনকে রাজবাড়িটা দেখিয়ে আনো। সময়—এক ঘণ্টা।

প্রহরীটি ফ্রেজারদের কাছে এল। বলল—চলুন। প্রহরীটির বয়েস কম। পোশাক টোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

প্রহরীটি চলল রাজবাড়ির দিকে। পেছনে ফ্রেজার আর ভেন। যেতে যেতে ফ্রেজার ভাবল—রাজবাড়ির মন্ত্রণাকক্ষটা কোথায় সেটা জানাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আগেই মন্ত্রণাকক্ষটা কোথায় জানতে চাই এ সব বলা যাবে না। সময় বুঝে বলবো।

মূল রাজবাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। প্রহরীটি বলল—আগে পশ্চিমটা দেখে আসি। সেইদিকে চলল। পেছনে ফ্রেজার আর ভেন।

একটা বড় ঘরের কাছে প্রহরী বলল—এটা হচ্ছে পড়াশুনোর জন্যে ঘর। বড় বড় পণ্ডিতরা থাকে। আর একটা লম্বাটে ঘর দেখিয়ে বলল—এখানে ছাত্ররা থাকে। তারই পাশে একটা মাঠমত। এখানে খেলাধূলো হয়।

কিছু পরে—রাজবাড়ির মধ্যেই একটা বড় ঘর দেখিয়ে প্রহরীটি বলল—এটা হচ্ছে অস্ত্রাগার। দেখা গেল চারজন প্রহরী ঘরটা পাহারা দিচ্ছে। হাতে খোলা তরোয়াল।

রাজবাড়িটার দক্ষিণ কোণায় একটা ছোট ঘর দেখিয়ে বলল—এটা মন্ত্রণাকক্ষ। ফ্রেজার এই ঘরটাই খুঁজছিল।

—এখানে তো কোন প্রহরী নেই। ফ্রেজার বলল।

—থাকে যখন এই কক্ষে রাজা মন্ত্রী সেনাপতি দুজন অমাত্য এসে বসেন। এখানে দেশ শাসন যুদ্ধ আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রহরী বলল।

—এই মন্ত্রণাসভা কখন বসে। ফ্রেজার জানতে চাইল।

—সাধারণত সন্ধ্যের পরে। প্রহরীটি বলল।

— প্রত্যেকদিনই কি বসেন সবাই। ফ্রেজার বলল।

—প্রায় প্রত্যেকদিন। তবে প্রতি সোমবার আলোচনা সভা বসবেই। সেদিন বেশ রাত পর্যন্ত সভা চলে। প্রহরীটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—আপনি এত কথা জানতে চাইছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেজার সতর্ক হল। বলল—দেখুন— এখানকার কয়েকটি দেশ নিয়ে আমি পড়াশুনো করেছি। এবার দেখতে বেরিয়েছি। রানি ঈশিতা আর সেভ্তার শাসক মিনের রাজত্বে গেছি। সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি। এবার এখানে এসেছি। এইসব এলাকার আর্থিক অবস্থা কেমন সেটা লিখতে গিয়ে আরো তথ্য চাই। আমি এসব নিয়েই পড়াশুনো করি লিখি।

—ও। তাই বলুন। এখানে আর বিশেষ কিছু দেখার নেই। প্রহরীটি বলল।

—সৈন্যাবাসটা কোথায়? ভেন বলল।

—সেটা দক্ষিণ দিক দেখিয়ে বলল—রাজবাড়ির দেয়ালের ওপাশে বিরাট মাঠ রয়েছে—সেখানেই সৈন্যদের আসন।

—ঠিক আছে—ফ্রেজার বলল—তাহলে আর কিছু দেখার নেই।

—একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে। প্রহরীটি বলল।

—না—না। অনেক দেখা হয়েছে। ফ্রেজার বলল—চলো ভেন।

দুজনে সদর দেউড়িতে এল। প্রহরীটিকে ধন্যবাদ দিয়ে দরজার গায়ে হাত রাখল। প্রহরীটি এসে ঠেলে দরজাটা খুলে দিল।

দুজনে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ফ্রেজাররা যখন সরাইখানায় ফিরল তখন বেশ বেলা হয়েছে। সরাই মালিক একটু দ্রুতই ওদের কাছে এল। বলল—কোথায় গিয়েছিলেন?

—রাজবাড়িটা দেখে এলাম। ভেন বলল। তারপর বলল—সেনাপতি অনুমতি দিল।

—বোধহয় আমাদের বিদেশি দেখে সেনাপতির দয়া হয়েছিল। এক ঘণ্টার জন্যে রাজবাড়ি দেখতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফ্রেজার বলল।

সরাই মালিক সজোরে বলে উঠল—আরে—আমাকে তো বললেন।

—কেন বলুন তো? ভেন বলল।

—রাজবাড়ির এক পাহারাদার ইগর আমার খদ্দের। আমার দোকানে সপ্তাহে দু'তিনদিন আসবেই। খেয়ে যাবেই। মালিক বলল।

—ও। ফ্রেজার বলল—তাহলে উনি তো ভালোভাবে —

মালিক ফ্রেজারকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—আপনাদের সব দেখাতো।

—যাক গে—দেখা তো হয়েছে। ভেন বলল।

ফ্রেজার তখন চিন্তামগ্ন। দ্রুত ভাবছে ঐ প্রহরীর মারফৎই গোপন সংবাদ বের করা যাবে। তাই বলল—আচ্ছা ইগর কি আজকে খেতে আসবেন?

—আসবেন বই কি। ইগরের স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। ইগরের রান্নার বালাই নেই। দুবেলা আমার এখানেই খাচ্ছে। মালিক বলল।

—রাতে কখন খেতে আসে? ফ্রেজার বলল।

—তার ঠিক নেই। মালিক বলল।

—এলে আমাদের কথা একটু বলবেন। বলবেন যে আমরা ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই বলবো। মালিক বলল। মালিক চলে গেল।

দুজনে পেছনের ঘরটায় এল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্রেজার আর ভেন বিছানার ওপর এসে বসল। ফ্রেজার শুয়ে পড়ল। ভেন বসে রইল। একটু পরে ভেন বলল—ফ্রেজার পারবে ইগরের সঙ্গে কথা বলে গোপন সংবাদ বের করতে?

—চেষ্টা তো করি। দেখা যাক। ফ্রেজার বলল।

বিকেলের দিকে দুজনে জায়গাটা দেখতে বেরুলো। ছোট নগর। জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে রাস্তাঘাট দোকান বাজার বেশ পরিচ্ছন্ন।

ফ্রেজার প্রায় কিছুই দেখছে না। নানা চিন্তা মাথায়? ফ্রান্সিসরা কোথায়? ওরা লড়াইটড়াইয়ে নেমে পড়েছে কিনা। তবে ভরসা ঐ ফ্রান্সিস। বোকার মত কোন কাজ ফ্রান্সিস করবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্রেজার। আবার কবে আমাদের সবাইর সঙ্গে সবাইর দেখা হবে। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মনে পড়ল রাজবাড়িতে শাসক ওয়াজিমোর স্থাপিত স্কুল, ছেলেদের বাড়ি এসবের কথা। সরাইখানার মালিক যা বলেছিল। তার সঙ্গে শাসক ওয়াজিমোর কাজের কোন মিল নেই। সরাইওয়ালা অসৎ। সে মানুষের সদ্‌গুণ দেখতে পায় না। মানুষের নামে কুৎসা রটাতে সে ভালোবাসে। যাক গে—তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকা খাওয়া। চলে গেলেই তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ।

ফ্রেজাররা সন্ধ্যের কিছু পরেই খেয়ে নিল। নিজেদের জায়গায় শুয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

তখন একটু বেশি রাত হয়েছে। হঠাৎ ফ্রেজাররা শুনল চড়া গলায় হাসি। সেইসঙ্গে সরাইওয়ালার বিগলিত সুরে বলা—আসুন —আসুন ইগর।

—খেতে দাও। চড়া গলা ইগরের।

ভেন কাঠের বিছানা থেকে নামল। দোকানঘরের পেছন দিককার দরজার কাছে এল। দেখল ইগরকে। বেশ স্বাস্থ্যবান লম্বা চওড়া চেহারা। ভেন চলে এল। বিছানায় বসতে বসতে বলল—প্রহরীর যেমন চেহারা হওয়া উচিত তেমনি চেহারা।

—এখন আমাদের প্রস্তাব শুনে কী বলে দেখি। ফ্রেজার বলল।

ফ্রেজাররা অপেক্ষা করতে লাগল।

ইগরের খাওয়া হল। ইগর বারপাঁচেক মাংস রুটি চাইল। সরাইমালিক ফ্রেজার আর ভেন-এর কাছে এল। বলল—আপনাদের কথা বলেছি। ইগর আসছে এখানে। কথাবার্তা বলবেন।

কিছু পরে ইগর এসে ফ্রেজারদের বিছানার সামনে দাঁড়াল। বেশ ভারি গলায় বলল—কী ব্যাপার বলুন তো?

—একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে। আপনি বসুন। ভেন বলল।

—বসলে কাঠের পাটাতন ভেঙে যাবে। দাঁড়িয়েই কথা বলবো। ইগর বলল।

—আমি আগেই বলেছি আমার বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যেই একটি প্রস্তাব আপনার কাছে রাখবো। ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে বলুন। ইগর বলল।

ফ্রেজার বলতে লাগল—আমরা ভাইকিং বিদেশি। আমরা একটা জাহাজে চড়ে দেশ দ্বীপ ঘুরে ঘুরে বেড়াই। গুপ্তধনের খবর পেলে আমরা খুঁজে বের করি। যার বা যাদের সেটা প্রাপ্য তাদের নিয়ে আমরা জাহাজ ভাসাই। অন্য দেশে অন্য দ্বীপে যাই।

—বলেন কি! গুপ্তধন আবিষ্কার করেন তার ভাগও নেন না—এ কখনও হয় নাকি। আপনারা তো বোকা। ইগর বলল।

হ্যাঁ লোকে তাই ভাবে। যাকগে—এখানে আমরা জাহাজে চড়ে এসেছি। অনেকদিন আগে এখানকার এক রাজা ওভিড্রো সাত হাত লম্বা একটা খাঁটি সোনার তরবারি তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুর আগে কাউকে বলে যান নি সেই সোনার তরবারি তিনি কোথায় রেখে গেছেন। ফ্রেজার বলল।

—বলুন। ইগর বলল।

—একটা নকশা আমরা পেয়েছিলাম। হঠাৎই। সেটা দেখে দেখে আমরা গুপ্ত তরবারির হদিশ পাবো বলে আশা করছি। এখন আমার বন্ধুরা রাজা মিনের কয়েদঘরে বন্দী রানি ঈশিতা আমাদের ও আমাদের বন্ধুদের কারারুদ্ধ করেছে।

—হুঁ। বলে যান। ইগর বলল।

—এখন রানি ঈশিতা আমাকে আর এই বন্ধুকে একটি শর্তে মুক্তি দিয়েছে। শর্তটি হল—শাসক মিনএর যুদ্ধ পরিকল্পনার ব্যবস্থা জেনে রানিকে বলতে হবে। অর্থাৎ গুপ্তচরের নীচ কাজ।

—তারপর? ইগর বলল।

—আমরা দুজনে বেরিয়েছিলাম শাসক মিনের দেশে যাবো বলে। কিন্তু আমরা পথ ভুলে এই দেশে চলে এসেছি। ফ্রেজার বলল।

—এখন কী করতে চান? ইগর বলল।

—আপনাদের শাসক ওয়াজিমোও রানি ঈশিতার সঙ্গে যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু করেছেন। আপনি কি এটা জানেন? ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই জানি। প্রহরী হলেও আমাদের যুদ্ধ করতে হয়। যাকগে—এখন আপনারা আমার সঙ্গে কী কথা বলতে চান? ইগর বলল।

—দুভাবে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এক—আপনার প্রহরীর পোশাকটা আমাকে ধার দিতে পারেন—একরাতের জন্যে। দুই—আপনি নিজে কাজটা করতে পারেন।

—ঠিক বুঝলাম না। ইগর বলল।

—আপনার পোশাক পরে আমি শাসক ওয়াজিমোর গোপন আলোচনা শুনতে পারি। অন্যপথ—আপনি নিজে শাসক ওয়াজিমোর যুদ্ধ পরিকল্পনা শুনতে পাবেন পরে আমাদের সেটা জানাতে পারেন। দুটি দেশের যুদ্ধ পরিকল্পনা জানতে পারলে রানি ঈশিতা খুশি হয়ে আমাদের মুক্তি দেবে। ফ্রেজার বলল।

—সেটা হতে পারে। যাহোক—আমার কাছে আপনারা কী চান? ইগর বলল।

—একটু আগেই তো বললাম আপনি আমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারেন। ফ্রেজার বলল।

—পোশাক পরে কাজ করার বিপদ অনেক। আমিও জড়িয়ে যাবো। মনে হয় মন্ত্রণাকক্ষের কথাবার্তা সিদ্ধান্ত সবই আমি আড়াল থেকে শুনে জানতে পারি। পরে আপনাদের বলতেও পারি। ইগর বলল।

—দেখুন—গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত নিম্নস্তরের কাজ। এটা আমরা জানি। কিন্তু আমি আর আমাদের বন্ধুদের চিরজীবন কাটবে কয়েদঘরে এটা ভাবলে আমি কষ্টে চোখের জল ফেলি। ফ্রেজার বলল।

—হুঁ। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের বেদনার। ইগর বলল।

—আরো একটা সম্ভাবনার কথা বলি। রানি ঈশিতা আমাদের বলেছে যে কিছুদিনের মধ্যে ওখানকার সমুদ্রতীরে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। আমরা যদি শাসক মিনের যুদ্ধের পরিকল্পনা ঐ হাটবসার আগে রানিকে বলতে না পারি তবে আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে দেবে। শাসক মিন আর রানি ঈশিতার দয়ামায়া বলে কিছু নেই। এই মৃত্যু আর ক্রীতদাস হওয়া থেকে আপনিই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। ফ্রেজার বলল। কিন্তু কোনদিন শাসক ওয়াজিমো এসব নিয়ে কথা বলবেন তাতো আগে থেকে জানতে পারবোনা। ইগর বলল।

—আমি শুনেছি প্রতি সোমবার মন্ত্রণাকক্ষে শাসক ওয়াজিমো আর মন্ত্রী সেনাপতিরা বসে। দু'একজন অমাত্যও থাকেন। আপনাকে শুধু সোমবারের পাহারার কাজ করতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে—দেখছি। কালকেই তো সোমবার। ইগর বলল।

—আপনি একটু চেষ্টা করলেই এই কাজটা করতে পারবেন। ফ্রেজার বলল।

ইগর আস্তে আস্তে চলে গেল।

ফ্রেজার বলে উঠল—এখন যদি ফ্রান্সিস থাকতো আমরা কত নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

—ওসব ভেবে কী হবে। দায়িত্ব আমাদের ওপর পড়েছে সেটা পালন করার দায়িত্বও আমাদের। ভেন বলল।

পরের দিনটা শুধু কী হয় কী হয় ভেবেই ফ্রেজারের আর ভেন-এর সময় কাটল।

সন্ধ্যে পর্যন্ত সরাইখানাতেই থাকল। একটু রাত হতেই দুজনে বেরোল। হাঁটতে হাঁটতে রাজবাড়ির সামনে এল। একটা গাছের নিচে দুজনে দাঁড়াল।

বেশ রাত হল। সেনাপতি মন্ত্রী অমাত্যরা ঘোড়ার গাড়ি চেপে চলে গেল।

এবার ইগর বেরোবে।

দুজনে সদর দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। রাত বাড়তে লাগল।

ইগর আর অন্য প্রহরীরা সাধারণ পোশাকে বেরিয়ে এল।

—চলো। বলি এবার। ভেন বলল।

—না ভেন। এখন নয়। ওর সহকর্মীদের সামনে কোন কথা নয়। ফ্রেজার বলল।

দুজনে ইগরদের পেছনে পেছনে চলল।

একজন দুজন করে ইগরের সহকর্মীরা চলে গেল। রইল একজন সহকর্মী।

—এখন কী করবে? ভেন বলল।

—ইগর একা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ওর কাছে যাবনা। ফ্রেজার বলল।

সরাইখানার কাছাকাছি এসে একজন সহকর্মী চলে গেল। একা ইগরের সঙ্গে কথা বলা যায়। ভেন বলল—এখুনি কথা বলা যায়।

—না ভেন। অত অধৈর্য হয়ো না। ফ্রেজার বলল।

ইগর সরাইখানায় ঢুকল। মালিক ছুটে এল। ঘাড় কাত করে বলতে লাগল—আসুন—আসুন। একটু দেরি হল আসতে।

—হুঁ। সেই দুজন লোক কোথায়? ইগর বলল।

—ওঁরা তো বেরিয়ে গেছেন। মালিক বলল।

—বেরিয়ে গেছেন? ইগর কথাটা বলে দরজার দিকে তাকাল। দেখল দুজন দাঁড়িয়ে আছে।

ইগর কোন কথা না বলে ভেতরে ঢুকল। ফ্রেজারদের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল।

দুজনে এসে ইগরের সামনে দাঁড়াল।

ইগর একবার দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—শাসক ওয়াজিমো সেনাপতি মন্ত্রীরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে—সেটা আমি একটা কাগজে লিখে নিয়ে এসেছি। ইগর বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। ফ্রেজারকে দিল।

ফ্রেজার কাগজটা মোমবাতির কাছে নিয়ে গেল। পড়তে লাগল—

প্রথমে আমরা রানি ঈশিতার দেশ আক্রমণ করবো। ঈশিতার সৈন্যবল কম। আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করবো। রানিকে সৈন্য সাজাবার সময়ই দেব না। কিন্তু আমরা সামনাসামনি আক্রমণ করবো না। চোরাগোপ্তা আক্রমণ করবো। রানির আবাসে গিয়ে রানিকেই বন্দী করবো। তাহলেই সৈন্যদল হতাশ হবে। তখন তাদের বন্দী করা হবে। এই আক্রমণে প্রথমেই সেনাপতি যাবে কিনা সেটা পরে আলোচনা করে স্থির করতে হবে।

ফ্রেজার হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে ইগরকে জড়িয়ে ধরল। বলল—আমার প্রায় পনেরোজন বন্ধুকে আপনি বাঁচালেন।

—দেখুন গিয়ে রানি ঈশিতা কী বলে দেখুন। ইগর বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রেজার আনন্দে ভেন-এর হাত জড়িয়ে ধরল। বলল—ভেন—আর এক মুহূর্তও নয়। আমরা এক্ষুণি রওনা দেব। থর্ন বনের মধ্যে দিয়ে যাবো। চলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে পোশাক কাপড়টাপর সব গুছিয়ে নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরোবে বলে দরজার কাছে এল। সরাইওয়ালা এগিয়ে এল। দরজার তালা খুলে দিল।

দুজনে বেরিয়ে এল। ভেন কোমর থেকে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করে সরাইওয়ালাকে দিল। সরাইওয়ালা খুশির হাসি হাসল।

থর্নবনের মধ্যে দিয়ে দুজন আস্তে আস্তে যেতে লাগল। অনেকটা এসেছে দুজনে।

তখনই গাছপালার ফাঁক দিয়ে ফ্রেজারের নজর পড়ল একটা ছোট কুঁড়েঘর।

তখনই গাছপালার ফাঁক দিয়ে ফ্রেজারের নজরে পড়ল একটা ছোট কুঁড়েঘর। ওরা কুঁড়েঘরটার কাছে এল। ফালি কাঠের দরজা। দেখল দরজা বন্ধ। ফ্রেজার দরজার কাছে গেল। আঙ্গুল ঠুকে শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। দুজনে দেখল—এক পাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ।

বেশ শান্ত সৌম্য চেহারা। বৃদ্ধ জিগ্যেস করল—কে তোমরা? কী চাও।

আমরা ভাইকিং বিদেশী। জাহাজে চড়ে আমরা এসেছি। কিছু বন্ধু জাহাজ থেকে এখানে এসেছিল। খাদ্য আর জল নিয়ে যেতে। কিন্তু তারা আজও জাহাজে ফেরেনি। এখন কোথায় আছে অথবা অন্য কোথাও চলে গেছে কিনা সেই খোঁজেই আমরা এসেছি।

—তোমরা এখন কোথায় যাবে? বৃদ্ধ জানতে চাইল।

—শাসক মিনের রাজ্যে। ফ্রেজার বলল।

—সে তো এই থর্ন বনভূমির মধ্যে ওপাশে কিনারা দিয়ে যেতে পার তো। বৃদ্ধ বলল।

—না। আমরা বনভূমির মধ্যে দিয়েই যাবো। লুকিয়ে যাবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ যাও। কিন্তু নিশানা হারিও না। যদি নিশানা হারাও তবে এই বনভূমিতেই ঘুরে বেড়াতে হবে। বন থেকে বেরোবার পথ পাবে না। বৃদ্ধটি বলল।

—না—না। আমরা নিশানা ঠিক রাখবো। ফ্রেজার বলল।

বৃদ্ধটি বলল—এই দুই রাজ্যের মধ্যে লড়াই আর থামল না। রানি ঈশিকার পিতা যখন রাজা ছিলেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন দুই রাজ্যের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু এই শাসক মিনের পূর্বেকার রাজা রাজি হয়নি। বরং বিনা কারণে লড়াই বাঁধিয়ে বসল। এরকম লড়াই-এ শুধু সৈন্যদের সাধারণ মানুষদের প্রাণ যায়। এইসব লড়াইয়ের সময় সবচেয়ে বিপদ হয় আমার। দুই রাজ্যেরই সীমা হল এই থর্ন বনভূমি। দুপক্ষের সৈন্যরা বনের মধ্যে ঢোকে। দুই দলে লড়াই চলে এই বনভূমিতে। যে দল জেতে তারা অন্য রাজ্যের মালিকানা পায়। লড়াই থামে। কিন্তু সে আর কতদিন। আবার লড়াই শুরু হয়। রাজ্য ফিরে পাবার লড়াই। এভাবেই এখানকার দুই রাজ্যের মধ্যে লড়াই চলছে দীর্ঘদিন ধরে। আমি লড়াইয়ের সময় শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি আমার কত কষ্টে রোয়া ফুলফলের গাছ সৈন্যদের দাপাদাপিতে গোড়া থেকে উপড়ে যায় । কিছুই বলার নেই। রাজাদের রাজ্য বাড়াবার লিপ্সা নির্দয় মানসিকতা শুধু মৃত্যুই ডেকে আনে। রাজারা অক্ষত থাকেন। মরে সাধারণ সৈন্যরা। এত হত্যা এত রক্তপাত তবু কারো চৈতন্য হয় না।

—ঠিকই বলেছেন। এমন সব রাজাদের অভাব নেই যারা দাম্ভিক নির্মম স্বার্থান্ধ। প্রজাদের মঙ্গলসাধনের কথা তারা কখনো ভাবেই না। আরবীয় শাসক মিনকে এখনো দেখিনি কিন্তু রানি ঈশিকার পরিচয় পেয়েছি। অত্যন্ত ঘৃণ্য তার মনোভাব। এখানের জাহাজঘাটায় নাকি ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসে। সেসময় তিনি কয়েদঘরে আটক করা বন্দীদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করেন। তাঁর বিবেকে বাঁধে না। ভেন বলল।

—রানি ঈশিকার নির্মমতার অনেক খবরই আমি জানি। কিন্তু তাঁকে সংযত করার উপায় আমি জানি না। অবশ্য উনি আমার মত বনবাসী এক বৃদ্ধের কথা শুনতে যাবেন কেন। বৃদ্ধ বলল।

—উনি বলেন এখন ওর নাকি খুব অর্থাভাব চলছে তাই ক্রীতদাস হিসেবে বন্দীদের বিক্রি করবেন। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ। নিষ্ঠুর নির্মম কাজ যারা করেন তারা সবসময়ই যুক্তি দেখান। ইনিও তাই। বৃদ্ধ বলল।

বৃদ্ধ তারপর বলল—তাহলে আরবীয় শাসক মিনের রাজত্বে যাবে?

—হ্যাঁ। বন্ধুদের যদি বন্দীশালায় পাই তাহলে আর কোথাও যাবো না। না পেলে যে করে হোক বন্ধুদের খবর পেতেই হবে। খবর পাবোই। তারপর বন্ধুদের নিয়ে পালাবো। জাহাজঘাটায় যাবো। জাহাজ উঠে দেশের দিকে যাত্রা করবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ। তোমাদের সাফল্য কামনা করছি। যীশু তোমাদের রক্ষা করুন। বৃদ্ধ বলল।

দু'জনে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল মিনের রাজ্যের দিকে। বনের মধ্যে কিছুটা যেতেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। গাছ গাছালির ডালপাতার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে আকাশ যেটুকু দেখল তাতে ফ্রেজার বুঝল ঝড় আসবে।

ফ্রেজার বলল—ভেন—ছোটো। দুজনে গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে ছুটল। সশব্দে বাজ পড়তে লাগল। ঝড়ের হাওয়ায় গাছগুলো মাথা ঝাঁকাতে লাগল। শুকনো ডালপাতা ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে ধূলোবালি উড়ল। দু'জন চোখ কুঁচকে ছুটলো। একটু পরেই নামল বৃষ্টি। গাছের ডালপাতায় বৃষ্টি পড়ার চট্‌চট শব্দ। তার মধ্যে দিয়েই দুজনে ছুটল। কিন্তু জোরে ছুটতে পারছে না। নিচুগাছের বৃষ্টি ভেজা কাণ্ডে পা পিছলে যাচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রেজার বলল—বুঝলে ভেন—ঝড় আমাদের উপকারই করল। ভেনও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—

—ও কথা বলছো কেন?

—এই ঝড় জলের মধ্যে শাসক মিনের সৈন্যরা বনভূমি ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত থাকবে। আমরাও নির্বিঘ্নে শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে পৌঁছতে পারবো। ফ্রেজার বলল।

—রানি ঈশিকার সৈন্যরাও আর এদিকে আসবে না ভেন বলল।

—ঠিক তাই। সুতরাং আমরা নিরাপদ। ফ্রেজার বলল।

—তাই তো মনে হচ্ছে। ভেন বলল।

হঠাৎই বন শেষ। সামনে বিস্তৃত ঘাসে ঢাকা প্রান্তর।

তখন বেশ রাত হয়েছে। প্রান্তরের পরেই রাজপথ। দুজনে প্রান্তরে নামল। আকাশের মেঘলা ভাবটা তখনও যায়নি। চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে মেঘে।

বেশ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দুজনে রাজপথে উঠল। এবার কয়েদঘরটা খুঁজে বের করা। দুজনে রাজপথ ধরে সমুদ্রের দিকে জাহাজঘাটের দিকে আসতে লাগল। বুড়োটা বলেছিল একটা রূপালি গাছের বাঁ পাশের রাস্তা ধরে গেলে কয়েদখানা পাওয়া যাবে।

তখন হাওয়ার জোর থাকলেও বৃষ্টি কমে গেছে। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে।

হঠাৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ওরা দেখল একদল মিনের সৈন্য পুবমুখো যাচ্ছে। ফ্রেজার দ্রুত ভেন-এর হাত ধরে পথের পাশের মোটা গাছটার পেছনে গিয়ে লুকোল।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ভালো দেখা যাচ্ছে না। ওর মধ্যেই পুবদিকে খুব আবছা তিন-চারটে লম্বাটে ঘর দেখা গেল। সৈন্যরা সেই ঘরগুলোর একটাতে ঢুকে গেল।

ফ্রেজার বলল—ভেন—ঐ ঘরে নিশ্চয়ই কিছু হবে। হয় সভাটভা হবে নয়তো শাসক মিনের কোন নির্দেশ সৈন্যদের জানানো হবে।

—বলো কি! এতো বাঘের গুহায় ঢোকা। ভেন বলল।

—আমরা গুপ্তচর হয়েই এসেছি। কাজেই ভয়ে পিছোলো চলবে না। খবর সংগ্রহ করতেই হবে। চলো। ফ্রেজার বলল।

মাটিতে বুক পা ঘেষে ঘেষে দুজনে চলল সৈন্যাবাসের দিকে। আকাশে চাঁদ ঢাকা মেঘ। খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারদিকে। সৈন্যরা যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল সেই ঘরটার পেছনে এসে ওরা দাঁড়াল। জানালা মাত্র একটা। তারই নিচে দুজনে বসল। ঘরের ভেতরে সৈন্যরা চুপচাপ।

হঠাৎ সৈন্যরা বোধহয় বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শব্দ হল। বসল। সেনাপতির উঁচু গলা শোনা গেল—যে কারণে তোমাদের ডাকা হয়েছে সেটা বলছি। রানি ঈশিকার সৈন্যসংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি। তাই তিউনোশিয়া থেকে আরও সৈন্য আনার ব্যবস্থা করেছি। সেই সৈন্যদল এলেই আমরা একটু গুছিয়ে নিয়ে রানি ঈশাকার দেশ আক্রমণ করবো। সেই সৈন্যদল এখানে আশা পর্যন্ত তোমরা খাওদাও বিশ্রাম কর। তারপরেই যুদ্ধ। এবার তোমরা যাও। বিশ্রাম কর গে।

সৈন্যরা উঠে দাঁড়াল। তারপর নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সৈন্যদের কথাবার্তা থেমে গেল। সবাই শুয়ে পড়ল : চারিদিক নিস্তব্ধ হল। শুধু গাছের পাতা কাঁপিয়ে হাওয়া চলার শব্দ।

সেই ঘরের পেছন থেকে ওরা আস্তে আস্তে সরে এল। তারপর প্রান্তরে বুক পেতে শুয়ে পড়ল। বুক হাঁটু ঘষতে ঘষতে চলল রাস্তার দিকে। এভাবে বেশ কিছুদূর এসে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। পোশাকে জলকাদা লেগেছে।

—এখন কী করবে? ভেন বলল।

—সেই বৃদ্ধের ঘরে আশ্রয় নেওয়া যায়। ভেন বলল।

—ঠিক আছে। তাই চলো। ফ্রেজার বলল।

দুজনে বৃষ্টিভেজা বনভূমি দিয়ে চলল। ফ্রেজার জাহাজ চালনায় দক্ষ। ও ঠিক দিক নির্ণয় করে চলল। বড় বড় গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে যতটা আকাশ দেখা যাচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করে আর আশেপাশের গাছপালা দেখে দেখে ফ্রেজাররা চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধের ঘরটা দেখতে পেল। ভেন পাথরের বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজায় টোকা দিল। একটু পরে দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ হেসে বলল—এসো এসো। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি কমেছে।

—হ্যাঁ। বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেন বলল।

—ভেতরে এসো। বৃদ্ধ বলল।

দুজনে অন্ধকার ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধ একটা মশাল জ্বালল। ফ্রেজারদের চেহারা-

মাথা পোশাক দেখে বলল—তোমরা কি আছাড় টাছার খেয়েছিলে।

—হ্যাঁ। ফ্রেজার বলল—বুঝলেন—একেবারে কাদার মধ্যে।

দুজনে ওপরের এদেশীয় পোশাক খুলল। নিজেদের দেশীয় পোশাক আর খুলল না। ঘরে একটা কাঠের পাটাতন পাতা। তাতে মোটা সুতোয় কাজ করা মোটা কাপড় পাতা। বৃদ্ধ বলল—কোথায় যে তোমাদের শুতে দি।

—পাথরের মেঝেতেই শোব। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে। ফ্রেজার বলল।

—ঘরে কিছু ফলমূল আছে। খাও। বৃদ্ধ বলল।

—বলছিলাম আর কিছু নেই? ভেন বলল।

—হ্যাঁ। আটা চিনি এসব আছে। কিন্তু—

—ব্যস্। আমি উনুন পাতছি। কাঠকুটো আছে তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। বৃদ্ধ বলল।

—তাহলে তিনটে বড় পাথর নিয়ে আসছি। কথাটা বলে ভেন ঘরের বাইরে চলে গেল।

বৃদ্ধ বলল—তোমরা পরিশ্রান্ত। এই কাঠের পাটাতনে বসে বিশ্রাম কর।

—মেঝেতেই বসছি। এসবে আমরা অভ্যস্ত। ফ্রেজার মেঝেতে বসে পড়ল।

ভেন পাথর নিয়ে ফিরে এল। তিনটে পাথর বসিয়ে উনুন মত বানাল। মশালের আগুন দিয়ে কাঠকুটো জ্বেলে উনুনে দিল। বৃদ্ধ গিয়ে পাটাতনে বসল।

—কিছু মনে করবেন না—আপনার ঘুম ভাঙ্গালাম। ফ্রেজার বলল।

—কী যে বলো। তোমরা আমার অতিথি। আমার এই ভাঙ্গা ঘরে তোমরা যে আতিথ্য গ্রহণ করেছো এতেই আমি ধন্য। বৃদ্ধ বলল।

ফ্রেজার মেঝেয় শুয়ে পড়ল। একটু তন্দ্রামত এল। ভেন-এর রান্নাও চলল।

ভেনএর রান্না হল। দুজনে হাপুস হুপুস করে চিনিমাখা রুটি খেল।

তারপর দুজনে মেঝেয় শুয়ে পড়ল।

সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গল দুজনের। হাত মুখ ধুয়ে ওরা গত রাতের বাড়তি রুটি খেল।

এবার ফ্রেজার সমস্যায় পড়ল কী করবে এখন? বলল—ভেন—এখন কী করবে?

—দেখ ফ্রেজার—ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে গেলে গভীর রাতে যেতে হবে। অত রাতে কোথায় খুঁজবো? তার চাইতে আমি যেটা ভাবছি বলছি। একটু থেমে ভেন বলল—ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে কিনা এটা বুঝতে হলে একটা কথা ভাবছি। রাজকুমারীকে ফ্রান্সিস কয়েদঘরে রাখতে দেবে না। নিশ্চয়ই রাজকুমারীকে জাহাজে থাকার ব্যবস্থা করবে। ফ্রান্সিসের কথায় শাসক মিন নিশ্চয়ই রাজি হবে। এটা মিনের কাছেও সুবিধার মনে হবে। রাজকুমারী জাহাজে বন্দী হয়ে থাকলে ফ্রান্সিসরা আর পালাতে পারবে না। রাজকুমারীকে রেখে ওরা কখনও পালাতে চাইবে না।

—হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছো। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে ফ্রান্সিসদের খোঁজে এখনই না গিয়ে আমাদের জাহাজে চলো। ওখানে রাজকুমারীকে পাবো। সব জানতে পারবো। ফ্রান্সিসরা কেমন আছে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিনা পালাবার কী উপায় ভাবছে—এসব জানতে পারবো রাজকুমারীর কাছ থেকে। ভেন বলল।

—ঠিক আছে। চলো আমাদের জাহাজেই যাওয়া যাক। ফ্রেজার বলল।

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুজনে ওদের জাহাজ যেখানে নোঙর করে আছে সেই সমুদ্রে তীরভূমির দিকে চলল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুজনে সমুদ্রতীরে পৌঁছল। দেখল জাহাজ নোঙর করাই আছে। তীরভূমিতে ওদের দুটো নৌকো বেলভূমিতে তোলা আছে।

একটা নৌকোতে ওরা উঠে বসল। দাঁড় নৌকোর গলুই থেকে তুলে নিল ফ্রেজার। নৌকো চালাল জাহাজের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো গিয়ে জাহাজের গায়ে ভিড়ল। দুজনে জাহাজে উঠল। ওদের রাঁধুনি পিত্তান ছুটে এল। ফ্রেজারকে জড়িয়ে ধরল। বলল—আর সবাই কোথায়? রাজকুমারী কোথায়?

—সেই খোঁজেই তো এখানে এলাম। ফ্রেজার বলল।

—কেউ তো জাহাজে ফেরে নি। পিত্তান বলল।

—তাহলে রাজকুমারীকে জাহাজে রাখা হয়নি। তবে রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন? ভেন বলল।

—তা তো বলতে পারবো না। পিত্তান বলল।

—যাক গে—পিত্তান আমাদের খেতে দাও। ভেন বলল।

—ঠিক আছে। তোমরা বিশ্রাম কর। আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের খেতে দেব। পিত্তান বলল।

পিত্তান আধ ঘণ্টার মধ্যে রুটি মাংসের ঝোল রেঁধে দিল। ফ্রেজার আর ভেন খেতে শুরু করল। দুজনে কোন কথা না বলে খেতে লাগল। বারদুয়েক আরো রুটি মাংস চেয়ে খেল। খাওয়া শেষ।

এইবার দুজনে বুঝল—কী ক্লান্ত ওরা। ফ্রেজার কেবিনঘরে এসেই শুয়ে পড়ল। ভেন কিছুক্ষণ পিত্তানের সঙ্গে গল্পগুজব করল। তারপর কেবিনঘরে এসে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দুজনে সন্ধে পর্যন্ত ঘুমোল।

তারপর তিনজনেই ডেক-এ উঠে এল। তাকিয়ে রইল তীরভূমির দিকে। ফ্রান্সিসরা কেউ এলো কিনা। কিন্তু তীরভূমি জনশূন্য। তিনজনে কেবিনঘরে ...ল।

...লের খাবার খেয়ে তিনজনে ডেক-এ উঠে এল। তীরভূমির ...ন্সিস বা অন্য কোন বন্ধুদের দেখা গেল না। ফ্রেজার

ভেবে পেল না কোথায় ফ্রান্সিসদের খোঁজ করবে।

সন্ধেবেলায়ও ওরা ডেক-এ উঠে তাকিয়ে রইল সমুদ্রতীরের দিকে। কেউ এল না।

ভেন বলল—ফ্রেজার এখন কী করবে?

—আমাদের দুজনকে তো রানি ঈশিকার কয়েদঘরে ফিরে যেতেই হবে। যে খবরটা মিন-এর সৈন্যাবাসে পেয়েছি সে খবরটা রানি ঈশিকাকে তো দিতেই হবে। দেখা যাক সেই খবর পেয়ে রানি খুশি হয়ে আমাদের মুক্তি দেয় কিনা।

—অসম্ভব। রানি অর্থ পিশাচিনী। সেই অর্থ যে পথেই আসুক না। ভেন বলল।

—হুঁ। দেখা যাক। রানি মুক্তি না দিলে মুক্তির ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—রানির কয়েদখানা থেকে পালাতে পারবে? ভেন বলল।

—চেষ্টা তো করতে হবে? ফ্রেজার বলল।

—চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা না মারা যাই। ভেন বলল।

—আমরা যাতে না মরি অথচ মুক্তি পাই সেটাই করতে হবে। উপায় একটা হবেই। আর দেরি নয়। দুপুরে খেয়েই রানির রাজত্বের দিকে চলো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ। পিত্তানকে সঙ্গে নেবে? ভেন বলল।

—না না। পিত্তান জাহাজেই থাক। জাহাজ দেখাশুনোর জন্যে তো একজনকে থাকতেই হবে। ফ্রেজার বলল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে ফ্রেজার আর ভেন জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ভেন দু'তিনটে ওষুধের শিশি নিয়ে নিল। জাহাজ থেকে দড়ির মই দিয়ে নৌকোর ওপর নেমে এল। জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে পিত্তান হাত নাড়ল। ফ্রেজার নৌকো চালাচ্ছিল। ভেন হাত নাড়ল।

সমুদ্রতীর বেশি দূরে নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকো তীরে ভিড়ল। নৌকো তীরের অনেকটা উপরে টেনে তুলে রাখল। তারপর চলল। রানি ঈশিকার রাজত্বের দিকে।

বনভূমি পার হয়ে যখন ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ডুবে গেল। দুজনে রানি ঈশিকার বন্দীঘরের সামনে পৌঁছল।

দুজনে কয়েদঘরের দরজার কাছে পৌঁছল। প্রহরী দুজন এগিয়ে এল। বলল—রানির হুকুম তোমরা ফিরলেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা কর।

—তাহলে চলো রানির কাছে। ভেন বলল।

একজন প্রহরী বারান্দা থেকে মাটিতে নামল। চলল রানির মন্ত্রণাকক্ষের

দিকে। মন্ত্রণাকক্ষের সামনে এসে দুজনকে দাঁড়াতে বলে প্রহরীটি ঘরে ঢুকল।

কিছু পরে ফিরে এসে বলল—চলো। প্রহরীর সঙ্গে দুজনে মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকল।

ঘরে একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিল। টেবিলের চারপাশে বাঁকা পায়া ওককাঠের চেয়ার। তাতে গদীপাতা।

ফ্রেজার আর ভেন বসল। প্রহরী ভেতরে চলে গেল।

কিছু পরে প্রহরীটি ফিরে এল। বলল—রানিমা আসছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রানি ঘরে ঢুকল। দুজনে চেয়ার ছেড়ে উঠে সম্মান জানাল। রানি বসল। বসল দুজনে। বলল—তোমরাই তো ভাইকিং?

—হ্যাঁ। ভেন বলল।

—তোমাদের দুজনকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। রানি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রেজার বলল।

—কী গুপ্ত সংবাদ আনলে শুনি। রানি বলল।

ফ্রেজার সেই সৈন্যাবাসে সেনাপতির কথা জানাল।

—ও। তাহলে ওরা আরো সেনা সংগ্রহ করে আক্রমণ চালাবে। খুব ভালো খবর এনেছো। আমরা কিছু সময় পেলাম। আমরাও বিদেশ থেকে সৈন্য আনাবো। একটু থেমে রানি বলল—আর কোন সংবাদ?

—না। আর কোন সংবাদ জানতে পারিনি। ফ্রেজার বলল।

রানি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফ্রেজাররাও উঠে দাঁড়াল। ফ্রেজার বলল—মাননীয়া রানি—গোপন সংবাদ এনেছি। তাহলে এবার আমাদের মুক্তি দিন।

—না—না। তোমাদের তো হাটে বিক্রি করবো। রানি বলল।

—কিন্তু আমাদের তো কোন দোষ নেই। ভেন বলল।

—বিনা অনুমতিতে তোমরা আমার রাজত্বে ঢুকেছো। এটাই তোমাদের অপরাধ। রানি বলল।

রানি দরজার দিকে এগোল। বোঝা গেল রানি যা বলবার বলে দিয়েছে। তার অন্যথা হবে না। প্রেজার বুঝল মুক্তির আশা নেই।

ফ্রেজারের খুবই মন খারাপ হলো। তাদের মুক্তির আর কোন আশাই রহিল না। একমাত্র পথ বুদ্ধি করে পালানো। সেক্ষেত্রেও দু-একজন বন্ধুর হয়তো প্রাণ যাবে। ফ্রেজার এমন সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে প্রহরীর সঙ্গে কয়েদখানায় ফিরে এল।

দুজনে কয়েদখানায় ঢুকতেই বন্ধুরা এগিয়ে এল। তাদের চোখে মুখে একটা জিজ্ঞাসা আমরা মুক্তি পাবো তো? ফ্রেজার আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। সব শেষে বলল—যা বুঝলাম তাতে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া মুক্তির আশা নেই। ভেবেছিলাম মিন-এর রাজত্বে গিয়ে গোপন খবরটা রানিকে দিলেই রানি

আমাদের মুক্তি দেবে। এখন বুঝতে পারছি রানি আমাদের মুক্তি দেবে না। লড়াই শুরু হলে আমাদের জোর করে লড়াইয়ে নামাবে। রানির হয়ে আমাদের লড়তে হবে।

—আমরা লড়াইয়ে নামবো না। একজন ভাইকিং বলল।

—আমাদের বাধ্য করবে। ভেন বলল।

—ফ্রেজার এখন তাহলে আমরা কী করবো? একজন ভাইকিং বলল।

—অপেক্ষা করবো। তারপর সুযোগ পেলেই পালাবো। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে তো আমাদের এখন সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। পেড্রো বলল।

—হ্যাঁ, ফ্রেজার বলল।

ফ্রেজার মোটা কাপড়ের বিছানায় বসল। মাথায় চিন্তা—কী করে পালাবো। এমনভাবে পালাতে হবে যেন আমাদের কেউ মরে না যায়, আহত না হয়। ভেন বিছানায় শুয়ে পড়ল। এত ক্লান্ত ওর শরীর।

কয়েকদিন একঘেয়ে কাটল। ভাইকিং বন্দীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি নেই। এরকমই ভাবতে লাগল ওরা। ওরা ফ্রেজারকে বলে করে—আমাদের মুক্তির ব্যাপারটা ভেবো ফ্রেজার।

আমি শুধু মুক্তির কথাই ভাবছি। তার জন্যে প্রহরীদের কাজকর্মের দিকেও লক্ষ্য রাখছি। এখন সময় আর সুযোগ। ফ্রেজার বলে। বন্ধুরাও চুপ করে যায়।

বোঝে ফ্রেজার মুক্তির পরিকল্পনা করছে। ফ্রেজার নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করতে পারবে।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ আকাশে মেঘ করল। আকাশ যেন ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সন্ধের দিকে নামল বৃষ্টি। হাওয়ার তেজও বেড়ে গেল। শুরু হল ঝড় আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

প্রহরীরা খাবার নিয়ে কখন আসে ফ্রেজার তারই অপেক্ষা করতে লাগল। এবার ফ্রেজার সবাইকে কাছে ডাকল। ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রেজারকে ঘিরে বসল।

ফ্রেজার বলতে লাগল—মোট তিনজন প্রহরী আমাদের খাবার নিয়ে ভেতরে ঢোকে। আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে তিনজন এঁটো থালা বাটি নিয়ে চলে যায়। তিনজন যখন ঢোকে তখন দরজা খোলা থাকে। চারজন সৈন্য তখন দরজার সামনে থাকে। ফ্রেজার থামল। তারপর বলতে লাগল—আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করবো না। তিন প্রহরী যখনই খাবার নিয়ে ঢুকবে তখনই আমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। গরম ঝোল ওদের চোখে ছুঁড়ে ফেল। ওরা তখন চোখের জ্বালার অস্থির হয়ে যাবে। তখন দরজা খোলা। আমরা এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনের ঐ বনভূমির দিকে ছুটবো।

বাইরের চারজন প্রহরী কিছু বোঝার আগেই দ্রুত বনের দিকে ছুটবো। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে ওরা প্রহরীরা আমাদের হদিশ করতে পারবে

না। ওর মধ্যেও যদি কোন প্রহরী আমাদের মধ্যে কাউকে ধরে ফেলে তাহলে আমি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে ছুটবো। এই হল পরিকল্পনা। এখন এই পরিকল্পনা মত কাজ করা। তোমাদের কারো কিছু বলার থাকলে বলো। কেউ কোন কথা বলল না।

রাত বাড়তে লাগল। ঝড়বৃষ্টি সমানে চলেছে।

একসময় প্রহরী তিনজন খাবার নিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন ভাইকিং প্রহরীদের মধ্যে যে ঝোলের মস্ত বড় কাঠের গামলটা নিয়ে ঢুকল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝোলের গামলাটা কেড়ে নিল। তারপর দ্রুত হাতে তিনজনের মুখে ঝোল ছিটিয়ে দিল। তিনজনই চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল। খাবার দাবার সব ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তিনজনের তখন চোখ জ্বলছে।

ফ্রেজার ছুটে দরজা পার হল। বাইরের প্রহরীরা কিছু বোঝার আগেই জড় বৃষ্টির মধ্যে ভাইকিংরা সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমেই ছুটল বনভূমির দিকে।

একজন ভাইকিং বৃষ্টিভেজা মাটিতে আছড়ে নেমে পড়ল। একজন প্রহরী কতকটা আন্দাজেই খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। দলের সামনে পেছনে ছিল ফ্রেজার। অন্ধকার অস্পষ্ট দেখল ভাইকিং বন্ধুকে। ফিরে দাঁড়িয়ে ফ্রেজার ছুটে এসে বন্ধুকে তুলল। তারপর দুজনেই ছুটল। তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। একজন প্রহরী ফ্রেজার আর ফ্রেজারের বন্ধুকে দেখল। খোলা তরোয়াল হাতে জোরে আসতে লাগল। ফ্রেজার হঠাৎ ওর সামনে হামা দিয়ে বসে পড়ল। অন্ধকারে প্রহরীটি ফ্রেজারের গায়ে পা বেঁধে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়ালও ছিটকে গেল।

ফ্রেজার বন্ধুকে নিয়ে প্রাণপণে ছুটল। একটু পরেই বনভূমির শুরু। বন্ধুরা আগেই বনে ঢুকে পড়েছে। ফ্রেজার আর ওর বন্ধু বনভূমিতে ঢুকে পড়ল।

বনভূমিতে একটানা বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

কিছু পরে ফ্রেজার বলল— ভাইসব—এখন আর ছুটে চলার দরকার নেই। সাবধানে চলো। সবাই আমার পেছনে পেছনে এসো।

ঐ বৃষ্টি আর বনের অন্ধকারের মধ্যে ফ্রেজার সেই বৃদ্ধের বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে ফ্রেজারকে চিনতে পারল না। ফ্রেজার বলল—কিছুদিন আগে আমি আর আমার বন্ধু আপনার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আপনার মনে আছে বোধহয়।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে আছে বৈকি। তোমরা ভাইকিং। তাই না। বৃদ্ধ বলল।

—হ্যাঁ। আমি বন্ধুদের নিয়ে এসেছি। এখানে রাতটা থাকবো। ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই। এসো । বৃদ্ধা বলল।

ভাইকিংরা বৃদ্ধের ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। তারপর গায়ের পোশাক খুলে গা মাথা মুছতে লাগল।

বৃদ্ধা চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালাল। এতক্ষণ পরে আলো দেখে ভাইকিংরা খুশি হল। অন্ধকার থেকে আলোয়। ভাইকিংরা ঐ ছোট্ট ঘরের মেঝেতে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। তখনও কেউ কেউ ওরা হাঁপাচ্ছে।

ফ্রেজার বৃদ্ধের কাছে এল। বলল—যে কোন কারণেই হোক আমাদের আজকের রাতের খাওয়া জোটেনি। আমাদের খেতে দেবার মত কিছু আছে?

—এই বনভূমির বাইরে শহরে গ্রামে যারা থাকে তারা আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে করে। তারা খাবার জিনিসটিনিস দিয়ে যায়। আজ সকালেই এক ধনী ব্যবসায়ী এসেছিলেন। দু'বস্তা আটা চিনি আনাজপাতি ফলটল দিয়ে গেছেন। এনেছেন ফেরাতে তো পারি না। আমার আর কতটুকু লাগে।

—যদি দয়া করে ওখান থেকে কিছু দেন তাহলে আমাদের ক্ষুধা মেটে। ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই। রান্নার উনুন আছে। আপনাদের কেউ রান্নার লোক আছে। বৃদ্ধ বলল।

—হ্যাঁ আছে। আপনার শুকনো কাঠ আছে?

—হ্যাঁ। পেছনের চিলতে ঘরটায় আছে।

—ঠিক আছে। আপনি দেখিয়ে দিন।

—যে রাঁধবে তাকে আসতে বল।

ফ্রেজার ভেনকে ডাকল। বলল সব। ভেন বলল—আগের বার তো আমিই রেঁধেছিলাম।

ভেন সব দেখেটেখে এল। ফ্রেজারকে বলল—খাবার কী আছে আমি জানি। কম কম করে খেলে আমাদের হয়ে যাবে।

—তুমি রান্না শুরু কর। যেটুকু খেতে পারি তাতেই হবে। ফ্রেজার বলল।

ভেন দেখল ওর হাতের মশালটা ছাড়া আর একটা মশাল দরজার ওপরে রয়েছে।

ভাইকিংরা সারা ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ল। ঘুমও এল।

একটা দুটো পাখির ডাক শোনা গেল।

রাত শেষ।

ভোর হল।

তখনও কেউ কেউ ওঠেনি।

সকাল হতে সবাই উঠল।

ফ্রেজার বলল—ভাইসব। আমাদের এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমরা বন্দর শহর সিউতাতে আরবীয় শাসক মিন-এর রাজত্বে যাবো। ওখানে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে হবে।

এবার ফ্রেজাররা নিঃশব্দে চলল ওই ঝুপসি পাতার গাছটার দিকে। গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। বাঁ দিকে আবার চলল। ঢিলতে রাস্তাটা ধরে কিছুটা উঁচু-নিচু জমি পার হয়েই কয়েদঘরটা দেখা গেল। কয়েদঘরের লোহার দরজায় দুটো মশাল জ্বলছে। আলোয় দেখা গেল সাত-আটজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে বসে আছে। ডানপাশে ঘাসে ঢাকা একটা মাটির ঢিবি। ফ্রেজার ফিসফিস বরে বলল, "সবাই ঢিবিটার পেছনে বোসো।" সবাই ঢিবিটার পেছনে গিয়ে বসল। এবার ফ্রেজার ভাবতে লাগল কিভাবে ওই পাহারাদারদের কাবু করা যায়, ছুটে গিয়ে ওদের সামনাসামনি আক্রমণ করা যায়। কিন্তু ওদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম। সামনা সামনি আক্রান্ত হলে ওরা লড়াইয়ের জন্যে নিজেদের তৈরি করার সময় পাবে। ফ্রেজার বুঝল, এই সময়টুকু ওদের দেওয়া চলবে না। আক্রমণ করতে হবে অতর্কিতে, হঠাৎ যাতে ওরা তৈরি হওয়াব সময় না পা পায়।

ফ্রেজার দেখল, কয়েদঘরের পেছনে কিছুটা পরেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। ওইদিক দিয়েই কয়েদঘরের পেছনে চলে যেতে হবে। ওখান দিয়েই আক্রমণ করতে হবে।

ফ্রেজার ডানদিকে বনজঙ্গলের দিকে সবাইকে যেতে ইঙ্গিত করল। সবাই সেদিকে চলল। ওদিক দিয়ে ঘুরে ওরা কয়েদঘরের ঠিক পেছনে চলে এল। সবাই অল্প হাঁফাচ্ছে তখন। ফ্রেজার সবাইকে একসঙ্গে জড়ো হতে বলল। সবাই একত্র হল গোল হয়ে। ফ্রেজার মৃদুস্বরে বলল, "হঠাৎ আক্রমণ করেই সৈন্যদের ডান বাহু জখম করতে হবে। তা হলেই ওরা তরোয়াল চালাতে পারবে না। বিদ্যুৎগতিতে এই কাজ সারতে হবে। তবেই ওরা হার স্বীকার করতে বাধ্য হবে। শিরস্ত্রাণ আর বর্ম কোনও কাজেই লাগবে না।" পেড্রোকে ডেকে ফ্রেজার বলল, "পেড্রো তোর কাজ হল ছুটে গিয়ে মশাল দুটো মাটিতে ফেলে দিবি। পা দিয়ে চেপে আগুন নিভিয়ে দিবি। বারান্দা অন্ধকার হয়ে যাবে।" অন্ধকারে আমাদেরই সুবিধে হবে। একটু থেমে ফ্রেজার বলল, "সবাই তরোয়াল খোলো। কিন্তু শব্দ না হয়।"

এবার সবাই আস্তে আস্তে তরোয়াল খুলে তৈরি হল। একজন ভাইকিং বন্ধু বলল, "ফ্রেজার, যদি এই কয়েদঘরে ফ্রান্সিসরা না থাকে, সেটা আগে না জেনে জীবনের ঝুঁকি নেব কেন?"

ফ্রেজার বলল, "ফ্রান্সিসদের খোঁজে যেখানেই যাবে সেখানেই জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। এবারে কথা নয়, কাজ। একসঙ্গে সবাই পাহারাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। ওরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় কম।"

কয়েদঘরের অন্ধকার পেছন দিক দিয়ে দ্রুত এসে ভাইকিংরা প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেড্রো ছুটে এসে মশাল দুটো পাথরের খাঁজ থেকে তরোয়ালের খোঁচায় নামিয়ে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার হয়ে গেল

বারান্দাটা। আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় প্রহরীরা হকচকিয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ততক্ষণে পাঁচজন প্রহরী বাহুতে তরোয়ালের ঘা খেয়ে খাপ থেকে তরোয়াল খুলতেই পারল না। খোলা তরোয়াল ছিল মাত্র দু'জন প্রহরীর হাতে। এদের দু'জনের ওপর প্রায় অন্ধকারে তিন-চারজন ভাইকিং ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন প্রহরীই মেঝের ওপর চিত হয়ে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। লড়াই শেষ। প্রহারীরা অনেকেই গোঙাতে লাগল। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল, "ও—হো—হো।" যুদ্ধজয়ের চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদঘর থেকেও চিৎকার উঠল, "ও—হো—হো।" তা হলে ফ্রান্সিসরা এই কয়েদঘরেই বন্দি হয়ে আছে। ভাইকিংরা হইহই করে উঠল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারদের আক্রমণের সময় থেকেই দরজার লোহার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন পেড্রো মশাল নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছিল না আক্রমণকারী কারা। চাঁদের অস্পষ্ট যেটুকু আলো আসছিল তাতেই ফ্রান্সিস বুঝল, আক্রমণ করেছে ভাইকিং বন্ধুরা। ততক্ষণে মারিয়া, হ্যারিরা সবাই এসে জড়ো হয়েছে দরজার কাছে।

লড়াই শেষ হতেই ভাইকিংদের যুদ্ধজয়ের ধ্বনি উঠল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল। "ফ্রেজার।" ফ্রেজার কয়েদঘরের দরজার কাছে ছুটে এল। ফ্রান্সিস পাহারাদারদের একজনকে দেখিয়ে বলল, "ওকে ধরো। ওর কোমরে চাবির গোছা আছে। ওকে দরজা খুলে দিতে বলো। তাড়াতাড়ি করো। মিনের বাড়ি থেকে, সেনা ছাউনি থেকে সৈন্যরা হইচই, গোলমাল নিশ্চয়ই শুনেছে। এক্ষুনি ছুটে আসবে। তাড়াতাড়ি।"

ফ্রেজার ছুটে গিয়ে চাবিওয়ালা প্রহরীটিকে ধরল। বলল, "তালা খুলে দাও।" "আমি তালা খুলব না।" প্রহরীটি বলল।

"ঠিক আছে, চাবিটা দাও।" ফ্রেজার বলল।

"আমাকে না মেরে চাবি পাবে না।" প্রহরীটি বলল।

"তা হলে মরো।" কথাটা বলে ফ্রেজার প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি ফ্রেজারের প্রথম আক্রমণটা ঠেকাল। এবার দু'জনের তরোয়ালের লড়াই চলল। এগিয়ে-পিছিয়ে ফ্রেজার নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। প্রহরীটির তখন দম ফুরিয়ে এসেছে। ও মুখ হাঁ করে হাঁফাতে লাগল। তেমন জোরে আর তরোয়াল চালাতে পারছে না।"

ফ্রেজার হঠাৎই প্রহরীটির মার এড়িয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত তরোয়ালের কোপ মারল ওর কাঁধ লক্ষ্য করে। প্রহরীটি সেই মার ঠেকাতে পারল না। ফ্রেজারের তরোয়াল পাহারাদারটির ডান কাঁধে বিঁধে গেল। তরোয়াল তুলে নিল ফ্রেজার। পাহারাদারটির কাঁধ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। পাহারাদারটি ক্ষতস্থানে হাত চেপে ধরে বসে পড়ল। ফ্রেজার ওর কোমর থেকে চাবির থোকাটা খুলে নিল। দরজার কাছে এগিয়ে এল। দরজার কাছে

তখন ভাইকিং বন্ধুদের ভিড়। ফ্রেজার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। ঘোরাল। তালা খুলল না। ফ্রান্সিস বলল, "সবচেয়ে বড় চাবিটা লাগবে।" ফ্রেজার দরজা খুলে ধরল। ফ্রান্সিসরা সবাই দ্রুত বেরিয়ে এল। কিছু বার্বার সৈন্যও বেরিয়ে এসে পালিয়ে গেল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ভাইসব, এখনও লড়াই শেষ হয়নি। ওই দেখো মিনের সৈন্যরা ছুটে আসছে।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল মিনের সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। পনেরো-কুড়িজন সৈন্য।

মারিয়া, শাঙ্কো ছাড়া সকলে প্রহরীদের হাতে থেকে কেড়ে নেওয়া তরোয়াল নিয়ে তৈরি হল। অনেকে মিনের পরাজিত সৈন্যদের শিরস্ত্রাণ, বর্ম খুলে নিয়ে নিজেরা পরেছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব,—আমরা এগিয়ে যাব না। ওরা প্রান্তরটা পার হয়ে আসুক। এতে ওরা ক্লান্ত হবে। তাতে আমাদেরই সুবিধে হবে।"

সৈন্যরা বলল, "ফ্রান্সিস,। আমি বন্ধুদের বলেছি ওই শিরস্ত্রাণ আর বর্ম সৈন্যদের সুযোগ বুঝে বাহুতে তরোয়াল চালাতে।"

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তুমি ঠিক বলেছ। কথাটা বন্ধুদের আর একবার মনে করিয়ে দাও।" কথাটা ফ্রেজার আবার গলা চড়িয়ে বলল।

সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসতে লাগল। সবচেয়ে আগে সেই সেনাপতি। বিস্তৃত ঘাসের প্রান্তরটা পার হয়ে আসতে সত্যিই ওরা বেশ পরিশ্রান্ত হল। হাঁফাতে হাঁফাতে ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শুরু হল লড়াই। বেশিরভাগ ভাইকিং শিরস্ত্রাণ বর্ম পরেছিল। কাজেই সৈন্যরা ওদের সহজে কাবু করতে পারল না। প্রচণ্ড লড়াই চলল। ফ্রান্সিস একা চারজন সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। সৈন্যদের তরোয়ালের ঘায়ে ফ্রান্সিসের জামা অনেক জায়গায় কেটে গেল। শরীরেও লাগল। রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল, সৈন্যদের মাথায় তরোয়াল চালিয়ে লাভ নেই। কাজেই ও একটু সুযোগ পেলেই সৈন্যরা বাহু হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাতে লাগল। এতে সৈন্যরা আহত হতে লাগল। আহত হাত থেকে তরোয়াল ফেলে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস তখন অন্য সৈন্যদের দিকে ধেয়ে গেল। লড়াই চালাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিনের সৈন্যরা হার স্বীকার করতে লাগল। হঠাৎ সেই সময় সেনাপতি ফ্রান্সিসের একেবারে সামনে এসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতিকে আক্রমণ করল। দু'জনের তরোয়ালের লড়াই জমে উঠল। দু'জনেই নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। ততক্ষণে আহত সৈন্যরা পালাতে শুরু করেছে। ভাইকিংরা লড়াই থামিয়ে দু'জনের তরোয়ালের লড়াই দেখতে লাগল। লড়াই চালাতে চালাতে ফ্রান্সিস চাপা গলায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—বলেছিলাম সুযোগ পেলেই তোমাকে আমি হত্যা করবো। আজ সেই সুযোগ এসেছে। বুঝল বর্ম শিরস্ত্রাণ পরা সেনাপতিকে সহজে কাবু করা যাবে না। ঠিক করল

সেনাপতির মাথার শিরস্ত্রাণটিকে ফেলে দিতে হবে। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে তক্কে তক্কে রইল। সুযোগ এসে গেল। সেনাপতি একটু অন্যমনস্ক হয়েছে তখন। ফ্রান্সিস বিদ্যুৎগতিতে শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে সেনাপতির মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। শিরস্ত্রাণের বন্ধনি ছিঁড়ে গেল। শিরস্ত্রাণ ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল। ফ্রান্সিস আর সেনাপতিকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিল না। দ্রুত সেনাপতির মাথায় তরোয়ালের কোপ বসাল। সেনাপতির হাতের তরোয়াল ফেলে দিয়ে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। তারপর বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস সেনাপতির বুকে গলায় তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল।

লড়াই শেষ। ফ্রান্সিস হাঁফাতে হাঁফাতে জিতার কাছে এল। বলল, "জিতা, মিনের কি আরও সৈন্য এখানে আছে?"

"হ্যাঁ। রানি তুহিনার প্রাসাদের ধ্বংস্তূপ সারানোর কাজে তাদের লাগানো হয়েছে। দুই পণ্ডিতকে সাহায্য করছে তারা।"

"হুঁ—সেই সৈন্যরা আসার আগেই আমাদের প্রায় সবাইকে জাহাজে ফিরে যেতে হবে।" পরিশ্রান্ত ভাইকিংরা কেউ কেউ প্রান্তরের ঘাসে বসে পড়েছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল "ভাইসব, শুধু আমি শাঙ্কো হ্যারি আর জিতা এখানে থাকব। রানি তুহিনার দুর্গের সন্ধান করব। রানির গুপ্তভাণ্ডার উদ্ধার করব।"

যে ভাইকিংরা বসে পড়েছিল তারা উঠে দাঁড়াল। লড়াইয়ে আহতদের ওরা ধরে ধরে নিয়ে চলল। সবাই চলল জাহাজঘাটার দিকে।

তখন সূর্য উঠেছে। রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বনে, কয়েদঘরের মাথায়। বনজঙ্গলের মাথায়।

হ্যারিকে ডেকে ফ্রান্সিস বলল,"চলো, রানি তুহিনার দুর্গে যাই।"

চারজনে বনের মধ্যে দিয়ে চলল রানি তুহিনার দুর্গের দিকে। যখন দুর্গে এসে পৌঁছল তখন বেলা হয়েছে। দুর্গের প্রবেশ পথেই একটা মশাল রাখা ছিল। মশালটা ফ্রান্সিস তুলে নিল। গুহাপথে ঢুকল চারজন।

রানির শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল, যা কিছু ওরা রেখে গিয়েছিল, সবই আছে। জিতা উনুনের কাছে গিয়ে রান্নার উদ্যোগ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস মেঝেয় বসল। তারপর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। চিত হয়ে শুল। দেখল, ওপরে। পাথরের ছাদ। প্রকৃতির হাতে তৈবি ছাদ। পাশ ফিরে তাকাল। পাথরের দেওয়ালগুলো দেখল। তখনই উত্তরদিকের দেওয়ালটার দিকে চোখ পড়ল। সত্যিই আশ্চর্য! উত্তরদিকের দেওয়ালটা অনেকটা মসৃণ। এটাও প্রকৃতির আর-এক খেয়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তাও মাথায় খেলে গেল, এ ঘরের কোনও দেওয়ালেই তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা নেই। আবার ফ্রান্সিসের চোখ পড়ল উত্তরদিককার অনেকটা মসৃণ দেওয়ালের দিকে। প্রকৃতির হাতে এত মসৃণ একটা দেওয়াল তৈরি হতে পারে? যদি তা না হয় তবে এখানেই যারা

বাস করে গেছে তারা দেওয়ালটি ছেনি দিয়ে যতটা সম্ভব মসৃণ করেছে। কিন্তু তারা অন্য দেওয়ালগুলো মসৃণ করল না কেন?

ফ্রান্সিস এসব ভাবছে তখনই হ্যারি ওই মসৃণ দেওয়ালে ফ্রান্সিসের মইটা ঠেকা দিয়ে রাখছিল। বোধহয় ভাল করে ঠেকা দিতে পারেনি। তাই হ্যারি ঘুরে দাঁড়াতেই মইটা দেওয়ালে লেগে মেঝেয় পড়ে গেল। ফ্রান্সিস দেখল, দেওয়ালে মইয়ের ঘষায় একটা অস্পষ্ট দাগ হয়েছে। পাথরে দাগ?

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল দেওয়ালটার কাছে। মইয়ের ঘষায় দাগ লাগা জায়গাটা দেখল। চিৎকার করে বলে উঠল, "হ্যারি, শাঙ্কো, এই দেওয়ালে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। তাই এত মসৃণ।" ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে কুড়ুলটা নিয়ে নিয়ে এল। দেওয়ালটায় কুড়ুলের ঘা মারল। মাটির চাঙড়া উঠে এল। আবার ঘা মারল। বেশ কিছু গুঁড়ো মাটি ঝরে পড়ল।

সেই জায়গায় পাথরের দেওয়ালের অংশ দেখা গেল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, তবে কি রানি তুহিনার আমলেই এই মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল?"

"ঠিক তাই।" ফ্রান্সিস বলল।

"কিন্তু কেন দেওয়া হয়েছিল?" হ্যারি বলল।

'খুব সহজ—অন্য তিনটে দেওয়াল ছেড়ে দিয়ে এই উত্তরের দেওয়ালেই মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল কিছু জিনিস লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে।" ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি লাফিয়ে উঠল। বলল, "রানি তুহিনা চার পাপড়ির ফুলের নকশা গোপন রাখার জন্যই এটা করেছিলেন।"

"ঠিক বলেছ।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর দেওয়ালটার নিচের দিকে কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। মাটি ছিটকে পড়তে লাগল। পাথরের দেওয়াল দেখা যেতে লাগল। যতদূর হাত যায় ততদূর পর্যন্ত ফ্রান্সিস মাটির পলেস্তরা খসিয়ে দিল। কিন্তু পাথরের দেওয়ালে কিছুই দেখা গেল না। ফ্রান্সিস হাঁফাতে লাগল। এবার হ্যারিও কুড়ুল চালিয়ে অনেকটা মাটি খসাল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে এবার ফ্রান্সিস মইটা দেওয়ালে রাখল। অন্য সব ঘরে দেওয়ালের একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় তিন পাপড়ি ফুলের নকশা কুঁদে তোলা হয়েছে। এবার ফ্রান্সিস ওই নির্দিষ্ট উচ্চতা হিসেব করে কুড়ুল চালাতে লাগল। মাটি খসে পড়তে লাগল। হঠাৎই দেখা গেল, সেই ফুলের পাপড়ি। ফ্রান্সিস এবার সাবধানে মাটি খসাল। ফুটে উঠল চার পাপড়ির ফুলের নকশা।

মইয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁফাতে লাগল। মেঝেয় হ্যারি, শাঙ্কো আর জিতা গভীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু সময় গেল। এবার ফ্রান্সিস জোরে কুড়ুল চালাল ওই নকশাটার ওপর। নকশাটা খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। একটা প্রায় চৌকোনো ফোঁকর দেখা গেল। ফ্রান্সিস কুড়ুল ঠুকে ফোঁকরটা বড় করল। মশালের আলো এখানে

পৌঁছোয়নি। কাজেই ভেতরে কী আছে দেখা গেল না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ফোকরের ভেতরে হাত ঢোকাল। হাতে ঠেকল একটা লম্বামতো কাঠের বাক্স। ও বুঝল, ওটা অলঙ্কার রাখার পেটিকা।

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস পেটিকা বাইরে নিয়ে এল। হ্যারি আর শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল, "ও হো হো।" ওদের আনন্দের ধ্বনি।

ফ্রান্সিস মই রেখে আস্তে আস্তে নেমে এল। শাঙ্কো গিয়ে মশালটা নামিয়ে আনল।

মশালের আলোয় দেখা গেল পেটিকার গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস আস্তে আতে ঢাকনাটা খুলল। দেখা গেল পেটিকায় কত রকমের অলঙ্কার। প্রায় দুশো বছর আগেকার অলঙ্কার। ধুলো ময়লা লেগেছে। তাই মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল না অলঙ্কারগুলো। তবু কত মূল্যবান রানি তুহিনার অলঙ্কারগুলো। পেটিকাটাও কী সুন্দর! কালো কাঠের পেটিকা। তার গায়ে সোনা-রূপোর লতাপাতা, ফুলের নকশা।

হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস। এখন এই অলঙ্কারগুলো কী করবে?"

"জিতাকে দেব। ওদেরই দেশের এক রানির সম্পদ এসব। জিতাই পাবে।" ফ্রান্সিস বলল।

জিতা বলল, "এত সম্পদ পেলে আমার দুঃখদুর্দশার জীবন শেষ হবে, এটা ঠিক। কিন্তু ফ্রান্সিস যদি এই সম্পদ আবিষ্কার করত তবে তো আমি কিছুই পেতাম না। তাই বলছি ফ্রান্সিস, তুমি যতটা চাও ততটাই নাও, বাকিগুলো আমি নেব।"

হ্যারি বলল, "না। বরং সব অলঙ্কার দু'ভাগে ভাগ করে দু'জনে নাও।"

জিতা মাথা নেড়ে বলল, "বেশ।" তারপর কোমরের ফেট্টি খুলে মেঝেয় পাতল। পেটিকা থেকে সব অলঙ্কার ঢালা হল। হ্যারি, জিতাকেই ভাগ করতে বলল। সব দু'ভাগ হল।

ফ্রান্সিস বলল, "জিতা, এই গয়নাগুলোর ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আগের কয়েকটা অভিযানে আমি কিছুই আমার স্ত্রীকে এনে দিতে পারিনি। তাই আমার অংশ পেটিকায় ভরে তাকে দেব। খুব খুশি হবে সে।"

এবার নিজেদের জাহাজে ফেরা। ফ্রান্সিস জিতাকে বলল, "তুমি এই বনের বাইরে আমাদের নিয়ে চলো। বড় রাস্তায় গিয়ে একটা ফসল-টানা গাড়ি জোগাড় করে দেবে, যাতে আমরা জাহাজঘাটে যেতে পারি।"

জিতা মশাল হাতে গুহাপথ দিয়ে চলল, পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওরা যখন বাইরে এল, রাত হয়েছে। চাঁদের ম্লান আলোর মধ্যে দিয়ে সবাই চলল।

একসময় বড় রাস্তায় এল। জিতা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের গাড়ি আর একজন গাড়োয়ানকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিস জিতার ফেট্টির কাপড় কিছুটা নিল। পেটিকাটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখল।

জিতা হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। একটু কান্নাভেজা গলায় বলল,

"কোনওদিন ভাবিনি আমার দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচবে। ফ্রান্সিস তুমি আমাকে নতুন জীবন দিলে।" ফ্রান্সিস মৃদু হেসে জিতার হাতে চাপ দিয়ে হাত সরিয়ে নিল। ফ্রান্সিসদের গাড়ি চলল জাহাজঘাটার দিকে।

ফ্রান্সিস পথ দেখিয়ে গাড়িটা নিয়ে এল জাহাজঘাটা থেকে দূরে যেখানে ওরা নৌকোটা পারে তুলে রেখে গেছে, সেখানে। ফ্রান্সিস ভাবল, নৌকোটা তো পাওয়া যাবে না। মাছ-ধরিয়েদের পাড়া থেকে নৌকো আনতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, পারে এসে দেখল ওদের নৌকোটা রয়েছে।

ওরা চিৎকার করে উঠল, "ও হো—হো—।"

নৌকোয় উঠল ওরা। নৌকো চলল ওদের জাহাজের দিকে।

একসময় ওদের নৌকো ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ততক্ষণে ভাইকিং বন্ধুদের আনন্দের চিৎকার, হাসি শুরু হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে এল। সবাই ছুটে এল ওদের কাছে। মারিয়াও ছুটে এল হাসতে হাসতে। ফ্রান্সিস কাপড়ে প্যাঁচানো পেটিকাটা মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া আর ভাইকিং বন্ধুরা তখনও বুঝতে পারল না ওটা কী। মারিয়া প্যাঁচানো কাপড়টা খুলছিল না। ফ্রান্সিসই বলল, "কাপড়টা খুলে কী আছে দ্যাখো।"

মারিয়া প্যাঁচানো কাপড়টা খুলে পেটিকা দেখে হাঁ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, "পেটিকাটা খোলো।" মারিয়া খুলল সেটা। পেটিকায় অলঙ্কার, কত বিচিত্র আকার সে সবের। বাইরের ঝিকিয়ে উঠছে অলঙ্কারগুলো। অত অলঙ্কার দেখে মারিয়া হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস বলল, "মারিয়া, এবার কিন্তু আমার হাত শূন্য নয়।"

মারিয়া হেসে বলল, "তোমার হাত শূন্য থাকলেও আমার কোনও দুঃখ থাকত না। তোমরা অক্ষত ফিরে এসেছ, এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।" ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরা শাঙ্কোকে ঘিরে ধরেছে। শাঙ্কো হাত-পা নেড়ে তখন রানি তুহিনার অলঙ্কারের পেটিকা উদ্ধারের ঘটনাটা বলছে।

রাজা ওভিড্ডোর তরবারি

তখন সবে ভোর হয়েছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজের চারপাশে কুয়াশার আস্তরণ। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "ডাঙা দেখতে পাচ্ছি। কুয়াশা না কাটলে আর কিছু দেখা যাবে না।"

ঘুম-ভাঙা চোখে কয়েকজন ভাইকিং কেবিনঘর থেকে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। তখনই হঠাৎ একটা জোর হাওয়ায় সমুদ্রের ওপর ছড়ানো কুয়াশার আস্তরণ সরে গেল। পেড্রো চেঁচিয়ে বলল, "বন্দর, একটা ছোট বন্দর দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিসকে ডাকো।"

ভাইকিংদের কয়েকজন ছুটে সিঁড়ি বেয়ে একটা কেবিনঘরের দরজার সামনে এল। এই কেবিনঘরে ফ্রান্সিস আর মারিয়া থাকে। দরজায় আঙুল ঠুকে একজন ভাইকিং গলা চড়িয়ে বলল, "ফ্রান্সিস, একটা ছোট বন্দরের কাছে এসেছি আমরা। এবার কী করব?"

দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস বলল, "চলো। আগে সব দেখি।"

ফ্রান্সিসরা ডেকে উঠে এল। ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে এল। বলল, "ফ্লেজার, জাহাজ এখনই ওই বন্দরে ভিড়িও না। সবকিছু দেখেশুনে তারপর এগোব।" ফ্লেজার জাহাজ ঘোরাল।

মারিয়া আর হ্যারি এল। হ্যারি রেলিঙে ঝুঁকে বন্দরটা দেখল। বলল, "ফ্রান্সিস, একটু ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। লক্ষ্য করো যে দুটো জাহাজ বন্দরে ভেড়ানো, সেই দুটো জাহাজই যুদ্ধজাহাজ। ব্যবসায়ীদের জাহাজ নয়। তার মানে এই এলাকায় বোধ হয় যুদ্ধের আয়োজন চলছে। কাজেই জাহাজ এখানেই থামালে ভাল হয়।"

"কথাটা ঠিকই বলেছ।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্লেজারকে বলল, "জাহাজ এখানেই থামাও।" তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, "শাঙ্কো, এখানেই নোঙর ফেলো। আমরা আর এগোব না।"

ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হল। জাহাজ দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো আর বিস্কো তৈরি হল। ফ্রান্সিস তলোয়ার সঙ্গে নিতে নিষেধ করলে। শাঙ্কো আর বিস্কো দড়িতে বেঁধে দুটো পিপে ছোট নৌকোটায় নামাল। তারপর নিজেরাই নামল। নৌকো চালাল তীরভূমির দিকে। জাহাজঘাটার দিকে গেল না।

নির্বিঘ্নেই তীরে পৌঁছল। তারপর নৌকো থেকে পিপে দুটো নিয়ে চলল খাওয়ার জলের সন্ধানে। প্রথমে জানতে হবে খাওয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে। যাচ্ছে ওরা যখন তখন দেখতে পেল একটা বিরাট প্রান্তরের মধ্যে মাত্র একটা বাড়ি। ধারেকাছে আর কোনও বাড়ি নেই।

দু'জনে বাড়িটার কাছে এল। বন্ধ দরজায় আঙুল ঠুকল। দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল, "এখানে জল কোথায় পাব বলতে পারেন?"

বৃদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আপনারা বিদেশি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু বিদেশি বলে কি আমাদের জলতেষ্টা পায় না?" শাঙ্কো বলল।

বৃদ্ধ বললেন, "সে-কথা নয়। এটা পোর্তুগালের মধ্যে। এখানকার রাজা অপর্তো। উত্তরে আছে লরুল্লা। রাজার নাম ভিলিয়ান। সেটা উত্তর স্পেনের মধ্যে। এই দুই রাজ্যে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এই সময় বিদেশি আপনাদের বিপদ হতে পারে।"

শাঙ্কো বুঝল জল জোগাড় করা বেশ কষ্ট হবে। বৃদ্ধটি আঙুল তুলে উত্তর দিকটা দেখিয়ে বললেন, "ওইদিকেই বন্দর এলাকা। ওই এলাকা পার হয়ে দেখবেন একটা উঁচু টিলা। তার নীচে আছে ঝরনা। সেই ঝরনার জলই আমরা খাই।

"ঠিক আছে। দেখি জল আনতে পারি কি না।" শাঙ্কো বলল।

দু'জনে চলল বন্দর এলাকার দিকে। যেতে যেতে শাঙ্কো বলল, "এই বন্দর এলাকাটাই এড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হল না। এখান দিয়েই যেতে হবে ঝরনাটায়।"

বন্দর এলাকায় এল। দেখল, বেশ ব্যস্ত এলাকা। দোকানপাট। বাড়িঘর। রাস্তায় বেশ লোকজন। একজন লোক বাজার টাজার করে যাচ্ছিল। শাঙ্কো তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা এখানে ঝরনাটা কোথায়?" লোকটি আঙুল তুলে টিলাটা দেখাল।

দু'জনে টিলার দিকে চলল। টিলাটার নীচে পৌঁছবার আগেই চারজন সৈন্য ওদের দিকে ছুটে এল। দু'জনকে ঘিরে দাঁড়াল। দাড়ি গোঁফওয়ালা সৈন্যটি বলল, "দাঁড়াও।" শাঙ্কোরা দাঁড়িয়ে পড়ল। সৈন্যটি বলল, "তোমাদের পরিচয়?"

"আমরা ভাইকিং।" শাঙ্কো বলল।

"এখানে কী করে এলে?" সৈন্যটি বলল।

"জাহাজ চালিয়ে এসেছি।" বিস্কো বলল।

"তোমরা লরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের গুপ্তচর!"

"আমরা লরুল্লা, রাজা ভিলিয়ান, এসব নাম এই প্রথম শুনলাম।" শাঙ্কো বলল।

"সেসব বুঝি না। তোমাদের বন্দি করা হল।" সৈন্যটি বলল।

"আমাদের জাহাজে জলের অভাব হয়েছে। আমরা জল নিয়ে যেতে এসেছি। তাই পিপে এনেছি।" শাঙ্কো বলল।

"ওসব অজুহাত শুনব না। চলো।" সৈন্যটি বলল।

"পিপে দুটো?" বিস্কো বলল।

"এই দোকানে রেখে যাও।" সৈন্যটি বলল। তারপর কাছের দোকানটার

দোকানিকে ডাকল। দোকানি তো ভয়ে সারা। তাড়াতাড়ি ছুটে এল। সঙ্গে ওর কর্মচারী। সৈন্যটি বলল, "এই পিপে দুটো তোমাদের দোকানে রাখো।" দোকানদার আর তার কর্মচারী মিলে পিপে দুটো নিয়ে গেল।

সৈন্যটি বলল, "আমাদের সঙ্গে এসো। পালাবার চেষ্টা করবে না।" সৈন্যটি চলল।

একটু যেতেই সৈন্যটির সঙ্গী দু'জন বলল, "আমরা টিলার নীচে নজর রাখতে যাচ্ছি। তোমরা যাও।" দু'জন সৈন্য চলে গেল। গোঁফদাড়িওয়ালা সৈন্যটি আর তার সঙ্গীটি চলল।

যেতে যেতে শাঙ্কো মৃদুস্বরে ওদের দেশের ভাষায় বলল, "বিস্কো, দাড়িওয়ালা আমার। চিমসেটা তোমার।" কিছুটা যেতেই দেখা গেল একটা মোড়। শাঙ্কো আবার বলল, "ডান দিকের গলিটা দিয়ে।" গোঁফদাড়িওয়ালা সৈন্যটি গলা চড়িয়ে বলল, "কী বলছ তোমরা?"

"যিশুর নাম নিচ্ছি।" শাঙ্কো বলল।

গোঁফদাড়িওয়ালা খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। শাঙ্কো হঠাৎ পেট চেপে বসে পড়ল। গোঁফদাড়িওয়ালা এগিয়ে আসছে, তখনই শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালার পেটে মাথা দিয়ে লাগাল এক গুঁতো। দাড়িওয়ালা দু'হাত তুলে রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বিস্কো অন্যটির পায়ে এমনভাবে নিজের পা জড়িয়ে টান মারল যে, সেই সৈন্যটিও রাস্তায় পড়ে গেল। বিস্কো পা দিয়ে ল্যাং মারতে ওস্তাদ। বন্ধুদের এভাবে ফেলে দেয়। দুজনেরই হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল।

"জলদি।" শাঙ্কো কথাটা বলেই ডান দিকের গলিতে ঢুকে পড়ল। পেছনে বিস্কো। দু'জনে ছুটল।

সৈন্য দু'জন উঠে দাঁড়াল। তাদের সারা গায়ে ধুলোবালি লেগেছে। দাড়িওয়ালার দাড়িতেও ধুলো লেগেছে। দু'জনে গা থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল। তারপর গলিটায় ঢুকে শাঙ্কোদের ধরতে ছুটল। তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে।

শাঙ্কোরা ছুটছে তখন। একটু পরে বাঁ দিকে একটা পোড়ো বাড়ি দেখল। দরজা হাট করে খোলা। দু'জনেই খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। শাঙ্কো দরজা বন্ধ করে দিল। দরজার খিলটা আধ ভাঙা। শাঙ্কো ঐ খিলটা চেপে ধরে রইল। দু'জনে কিছুক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। হাঁফাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই দেখল, গোঁফদাড়িওয়ালা সৈন্যটি তার সঙ্গীকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে গেল। দুজনে নিশ্চিত। বাড়িটার ছাত ভেঙে পড়েছে। পাথরের দেওয়ালে, থামে বুনো গাছ জন্মেছে। সামনের আধ-ভাঙা ঘরটায় দু'জনে ঢুকল। দেখল ঘরটার দরজা-জানালার চিহ্ন নেই। শুধু একটা জানলা অর্ধেকটা ভাঙা। লোহার ফ্রেম সবটা ভেঙে পড়েনি। ঘরটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা খাট। খাটটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে একসময়ে খাটটা শৌখিন খাট ছিল। এখনও কাঠের গায়ে ফুল-লতাপাতার কাজ করা। খাটটার ওপরে জমা ধুলোটুলো ঝেড়ে নিয়ে দু'জনে বসল।

বেশ বেলা হয়েছে। খিদেয় পেট জ্বলছে। কিন্তু ওরা বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না। খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে।" শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল, "বিস্কো, আমি খাবার কিনে আনছি।"

"আবার ওই দাড়িওয়ালার পাল্লায় পড়বে।" বিস্কো বলল।

"না, না। দেখি চেষ্টা করে।" শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো ভাঙা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। চলল সদর রাস্তার দিকে। সদর রাস্তায় এসে হাঁটতে লাগল পুবমুখে। কিছুটা যায় আর চারপাশের লোকজন দেখে। সৈন্য দেখলেই কোনও দোকানে ঢুকে পড়ছে। সৈন্যরা চলে গেলেই বেরিয়ে আসছে। কপাল ভাল বলতে হবে, একটা ছোট সরাইখানা দেখল। ও ঢুকে পড়ল। একটা লোক রুটি তৈরি করছে। দোকানের মালিক একটা কাঠের বাক্স সামনে নিয়ে বসে আছে। শাঙ্কো রুটি, আলু আর নানা শাকের তৈরি তরকারি চাইল। যে-লোকটা রুটি তৈরি করছিল সে এগিয়ে এল। দুটো গোল পাতায় ভরে দিল রুটি-তরকারি। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি আলগা করে ভাঙানি মুদ্রা দিল মালিককে। খাবার নিয়ে চলে এল ভাঙা বাড়িটায়। দু'জনে রুটি-তরকারি খেল। যা খিদে পেয়েছিল! কিন্তু জল নেই। জল খাওয়া হল না।

শাঙ্কো ভাঙ্গা খাটে শুয়ে পড়ল। রাত না হলে এখন আর কিছু করার নেই। রাত একটু বাড়লেই পালাবে। শাঙ্কো চোখ বুজে শুয়ে রইল। মাঝে মাঝে চোখ খুলছে। মাথার ওপর ভাঙ্গা ছাত দেখছে। আকাশ দেখছে। দেওয়াল দেখছে। কবেকার বাড়ি কে জানে! কারা থাকত এই বাড়িতে? পায়া ভাঙা খাটটা দেখে মনে হয় কোনও অবস্থাপন্ন পরিবারই এই বাড়িতে থাকত।

ঘরের এদিক ওদিক দেখতে দেখতে শাঙ্কো হঠাৎই দেখল—পূবদিকের একটা জানালা প্রায় অটুট। অন্য জানলাগুলোর অস্তিত্বই নেই। জানালার জায়গাগুলোয় ফোকর। ভাঙা পাথর। সবগুলো জানলা ভাঙা। একটা জানলার ফ্রেম কী করে এতটা অটুট রইল। শাঙ্কো খাট থেকে উঠল।

জানালাটার কাছে এল। জানালার কাছে এসে দেখল জানালার ফ্রেমটা লোহা দিয়ে তৈরি। শাঙ্কো দুহাতে জানলাটা ধরে টান দিল। ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু জানালার ফ্রেম ভাঙা গেল না। শাঙ্কো হাল ছাড়ল না। অন্যসব জানালা নিশ্চয়ই কাঠের তৈরি ছিল। শুধু এটাই কেন লোহার ফ্রেমের? নিশ্চয়ই এর কোন কারণ আছে।

শাঙ্কো এবার শক্ত হাতে জানালার ফ্রেমটা ঝাঁকাতে লাগল। হঠাৎই জানলার নিচের দিকে ফ্রেমের অংশটা ভেঙে বেরিয়ে এল। ঝর ঝর ক'রে পাথরের কুচি পড়ল। শাঙ্কো তখন হাঁপাচ্ছে। ফ্রেমের ভাঙা অংশটা ফেলে দিল। দেখল সেখানে একটা টানা গর্তমত। তার মধ্যে একটা পার্চমেন্ট কাগজ। শাঙ্কো একটু অবাকই হল। কীসের কাগজ এটা? কাগজটা হলদে হয়ে গেছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে গোটানো কাগজটা ওর ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনল। গোল করে পাকানো কাগজটা আস্তে আস্তে খুলল। দেখল কাগজটার ওপর দিকে কী যেন লেখা। এক নজর দেখেই বুঝল লেখাটা পুরোনো স্পেনীয় ভাষায় লেখা।

লেখাটার মাথায় লেখা রাজা ওভিড্ডোর তরবারি। শাঙ্কো কাগজটা ওল্টাল। দেখল একটা নকশা।

শাঙ্কো কাগজটা নিয়ে খাটে এসে বসল। বিস্কো বলল—কী ব্যাপার? কাগজটা কী?

—কাগজটার একপিঠে একটা বিবৃতিমত লেখা। অন্যপিঠে একটা নকশা আঁকা।

—কীরকম নক্‌শা?

শাঙ্কো বিস্কোকে কাগজটা দেখাল। বিস্কো কিছুই বুঝল না।

—গুপ্তধনের সন্ধান টন্ধান এই নকশায় আঁকা হয়েছে—এটাই আমার বিশ্বাস।

—ঠিক আছে। আগে বিবৃতিটা পড়ি। এটা পড়লে অনেক কিছু জানা যাবে। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো থেমে থেমে পড়তে লাগল—

লিসবনের শহরতলিতে আমাদের বাড়ি। দারিদ্র্য আর অভাব ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমি তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না। ভাগ্যান্বেষণে বহির্বিশ্বে বাহির হইয়া পড়িলাম। নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তারপর এই ভিগোনগরে আসিলাম। আশ্রয় পাইলাম। তখনই শুনিলাম রাজা ওভিড্ডোর লুক্কায়িত সাত হাত লম্বা নিরেট সোনায় তৈয়ারি তরবারির কথা। লোকমুখে শুনিলাম, সাত হাত লম্বা সেই তরবারির কোষে নাকি মহামূল্যবান হীরামুক্তা চুনিপান্না বসানো। সম্পূর্ণ কোষটি মিনে করা। লোকমুখে আরও শুনিলাম যে, সেই তরবারি এখানকার টিলায় নাকি গুপ্তভাবে রাখা হইয়াছে। আমি সেই তরবারির সন্ধানে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া আজ আমি বৃদ্ধ অথর্ব। আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। একবার ভাবিলাম নকশাটি ছিঁড়িয়া ফেলি, পুড়াইয়া ফেলি। কিন্তু রাখিলাম এই আশায়,যদি কেহ রাজা ওভিড্ডোর তরবারি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে।

নকশা সম্পর্কে বলি, উহা আমি টিলার পশ্চিমদিককার গুহায় পাইয়াছিলাম। ইহাতে সেই গুহা, টিলা এবং টিলার নীচে চেস্টনাটগাছের জঙ্গল অঙ্কিত আছে। একটি মৃত গাছের শুষ্ক কাণ্ডও অঙ্কিত আছে। ইহার অর্থ বুঝি নাই।

পড়া শেষ হল। শাঙ্কো কাগজটা বিস্কোকে পড়তে দিল। বিস্কো মনোযোগ দিয়ে নকশাটা দেখতে লাগল।

দু'জনে খাটে বসে রইল।

রাত হল। রাত বাড়তে লাগল। এবার কিছু খেতে হয়। শাঙ্কো আবার সেই সরাইখানা থেকে খাবার নিয়ে এল। দু'জনে খেল।

দু'জনে খাটে শুল। শাঙ্কো ভাবতে লাগল এখন কী করে জাহাজে ফেরা যায়। ফ্রান্সিসকে এই লেখা আর নকশাটা দিতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতে শাঙ্কো ঘুমিয়ে পড়ল। বিস্কো তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওদিকে শাঙ্কো আর বিস্কো জাহাজে না ফেরায় ভাইকিংরা বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারল না। মাঝে-মাঝেই ডেকে উঠে আসতে লাগল। কিন্তু ওরা দু'জন ফিরল না। মারিয়া বলল, "ফ্রান্সিস, অত দুশ্চিন্তা করছ কেন? শাঙ্কোদের কোনও বিপদ হয়নি। বড়জোর এখানকার কয়েদখানায় বন্দি হয়ে আছে। তুমি কাল সকালে যাও। কয়েদখানা খুঁজে বের করে ওদের কোনও হদিস পাও কিনা দ্যাখো।

"হ্যাঁ, কাল সকালে তো যেতেই হবে। খোঁজ করতেই হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে বন্ধুরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। শাঙ্কো আর বিস্কো সম্বন্ধে তাদের আশঙ্কার কথা জানাল। ফ্রান্সিস সকালের খাবার খেতে খেতে বলল, "কিছু ভেবো না। আমি এক্ষুণি বেরোচ্ছি। ওদের ঠিক খুঁজে বের কর।" বন্ধুরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মারিয়া, লিসবনে যে এ-দেশের পোশাকটা কিনেছিলাম ওটা বের করে দাও।"

"ওই পোশাক দিয়ে কী হবে?" মারিয়া বলল।

"হবে, হবে। তুমি দাও পোশাকটা।" ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস ওই পোশাকটা পরে নিল। তারপর ডেকে উঠে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "ভাইসব, আমি শাঙ্কো আর বিস্কোর খোঁজে যাচ্ছি। তোমরা কেউ তীরভূমিতে যাবে না।"

ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে ওদের ছোট নৌকোটায় নামল। জাহাজে বাঁধা দড়ি খুলে নৌকো ছেড়ে দিল। দেখল শাঙ্কোরা যে নৌকো চড়ে এসেছিল সেটা তীরে ভেড়ানো রয়েছে। কিন্তু নৌকোয় পিপে দুটো নেই।

ফ্রান্সিস এবার এক কাণ্ড করল। তীরভূমি থেকে ধুলোবালি নিজের মাথায়, মুখে, গায়ের পোশাকে ছিটিয়ে দিল। এক খ্যাপাটে মানুষের মতো চেহারা হল ওর।

প্রান্তর পার হয়ে জাহাজঘাটার কাছে বড় রাস্তাটায় এল। তারপরে দু' হাত তুলে বলতে লাগল, "হে শাঙ্কো, হে বিস্কো, দেখা দাও।" রাস্তায় একটু যায় আর দাঁড়িয়ে পড়ে গলা ছেড়ে বলে, "হে শাঙ্কো, হে বিস্কো দেখা দাও।" অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসের ওপর সকলের নজর পড়ল। রাস্তার পথচারীরা, দোকানটোকানে কেনাবেচায় ব্যস্ত মানুষেরা অবাক হয়ে ফ্রান্সিসকে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস সেইভাবে বলেই চলেছে, "হে শাঙ্কো, হে বিস্কো, দেখা দাও।"

ফ্রান্সিসের গায়ে এ-দেশের পোশাক দেখে ফ্রান্সিসকে কেউ বিদেশি বলে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস দু'হাত ওপরে তুলে বলে চলল, "হে শাঙ্কো-হে বিস্কো দেখা দাও।" এইভাবে যেতে যেতে ফ্রান্সিস ভাবল, গলিগুলোর মধ্যে ঢুকেও বলতে হবে। এবার ফ্রান্সিস গলিতে ঢুকল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল। একটা গলি শেষ করে ডান দিকের গলিতে ঢুকল। একটু এগিয়েই দু'হাত তুলে বলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে পোড়ো বাড়িটার কাছে এল। চিৎকার করে বলল, "হে

শাঙ্কো, হে বিস্কো, দেখা দাও।"

ঘরের মধ্যে শাঙ্কো আর বিস্কো চমকে উঠল। লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসের গলা। শাঙ্কো দরজার কাছে ছুটে এল। দরজা একটু ফাঁক করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস কাছাকাছি আসতেই শাঙ্কো দেশীয় ভাষায় বলে উঠল, "আমরা এখানে।" ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এল। তারপর এক ঝলক এদিক-ওদিক দেখে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় কোন খিল নেই। শাঙ্কো বিস্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। তিনজনই আনন্দে উদ্বেল। কিন্তু জোরে কথা বলতে পারছে না। দরজার পরেই রাস্তা। লোকজন যাচ্ছে আসছে।

তিনজনে বড় ঘরটায় এল। খাটে বসল। শাঙ্কো সৈন্যদের হাতে ধরা পড়া, পালানো, সব ঘটনাই বলল। তারপর বলল, "ফ্রান্সিস, এবার তো জাহাজে ফিরতে হয়। কী করবে?"

"এখন কিছু নয়। খাওদাও, বিশ্রাম করো। রাতে জাহাজে ফিরতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল। তারপরে মাথার চুল, পোশাক থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলতে লাগল। ফ্রান্সিসই এক সরাইখানা থেকে খাবার কিনে আনল। দুপুরের খাওয়া হল। ফ্রান্সিস আবার বেরোল। সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে এক হাঁড়ি জল নিয়ে এলো। শাঙ্কোরা এতক্ষণে জল খেতে পেল।

এবার শাঙ্কো সেই লেখাটা আর নকশাটার কাগজটা ফ্রান্সিসকে দিল। শাঙ্কো ওসব কীভাবে পেয়েছে তা বলল।

ফ্রান্সিস খাটে শুয়ে পড়ল। প্রথমে লেখাটা পড়ল। তারপর নকশাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। বলল, "শাঙ্কো, নকশায় দুটো জিনিস লক্ষ্য করো। এক, টিলার গায়ে গুহা; আর দুই, জঙ্গলের মধ্যে একটা শুকনো গাছ। ওই টিলার গুহাতেই লোকটি নকশাটা পেয়েছিল। এখন দেখতে হবে মরা শুকনো গাছটার কোনও গুরুত্ব আছে কি না।"

"তা হলে তো ওই বনে যেতে হয়।" বিস্কো বলল।

"তাই যেতে হবে। রাজা ওভিড্ডোর তরবারি ওখানেই কোথাও আছে, মানে রাজা ওভিড্ডো গোপনে রেখে গেছেন।" ফ্রান্সিস বলল।

"ওই জঙ্গলে এত খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব?" শাঙ্কো বলল।

"সেটা ওই জঙ্গলে না গিয়ে বলতে পারছি না।" ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধে হল। ফ্রান্সিস বলল, "এখন নয়। গভীর রাতে জাহাজে ফিরতে হবে।"

রাতের খাবার ফ্রান্সিসই নিয়ে এল। ওর পোশাক দেখে কেউ বিদেশি বলে ভাবতেই পারল না।

রাত গভীর হল। নিস্তব্ধ রাত।

একসময় ফ্রান্সিসরা খাট থেকে নামল। তৈরি হল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজা খুলে রাস্তায় উঠল। রাস্তা জনশূন্য। ফ্রান্সিস বলল, "রাস্তা দিয়ে যাওয়া চলবে না। ওখানে এখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সৈন্যরা সজাগ এখন। নিশ্চয়ই পাহারা জোরদার করা হয়েছে। আমরা ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব। ধরা

পড়ার সম্ভাবনা কম।''

রাস্তা পার হয়ে ফ্রান্সিসরা বুনো ঝোপজঙ্গলে ঢুকল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। ঝোপজঙ্গল মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনজনে চলল।

যখন জাহাজঘাটার কাছে এল, তিনজনেই হাঁপাচ্ছে। নিজেদের জাহাজ লক্ষ্য করে তীরভূমিতে হেঁটে হেঁটে আসতে দেখল ওদের নৌকো দুটো জলে ভাসছে। তিনজনেই নৌকোয় উঠল। দাঁড় টেনে চলল নিজেদের জাহাজের দিকে। নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে লাগল। ফ্রান্সিসরা হালের কাছে দড়িদড়া ধরে ডেকে উঠে এল। মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চেঁচিয়ে বলল, ''ফ্রান্সিসরা এসেছে, ফ্রান্সিসরা এসেছে।''

মারিয়া খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। তখনও ঘুমোতে পারেনি। পেড্রোর ডাক শুনে মারিয়া ছুটল সিঁড়ির দিকে। ডেক-এ উঠে এসে ফ্রান্সিসদের দেখল। ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরাও ছুটে এল। ফ্রান্সিসরা ফিরে এসেছে। সবাই খুশি।

পরদিন সকালে রাঁধুনি বন্ধু ফ্রান্সিসের কাছে এল। খাওয়ার জল খুব বেশি নেই। জল আনতে হবে। ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। শাঙ্কো আর বিস্কোকে বলল, ''তোমরা জল আনতে গিয়েছিলে। পিপে দুটো. কী হল।'' শাঙ্কো তখন সবই বলল।

''ওই দোকানটা চিনতে পারবে?'' ফ্রান্সিস বলল।

''হ্যাঁ, হ্যাঁ।'' শাঙ্কো বলল।

''তা হলে এখন চলো। তোমার সবচেয়ে ছেঁড়া যে জামাটা আছে সেটা পরে এসো।'' ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস এ-দেশের পোশাকটা পরল। শাঙ্কো ওর ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকটা পরে নিল।

দু'জনে নৌকো বেয়ে তীরে এল। সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, ''বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটো।'' শাঙ্কো সেভাবেই হাঁটতে লাগল। দোকানটার সামনে এল। শাঙ্কো দোকানদারকে দেখিয়ে দিল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল, ''একে চিনতে পারেন?''

দোকানদার একটুক্ষণ শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, সৈন্যরা ধরে এনেছিল।''

''ওর এক বন্ধুও ছিল?'' ফ্রান্সিস বলল।

''হ্যাঁ।'' দোকানি বলল।

''এরা দুটো জলের পিপে রেখে গেছে।''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ।'' দোকানদার দোকানের ভেতর থেকে পিপে দুটো বের করে দিল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পিপে দুটো নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, ''খাবার জল কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জেনেছিলে?''

''হ্যাঁ, ওই টিলাটার নীচে নাকি ঝরনা আছে।'' শাঙ্কো বলল।

"ঠিক আছে। চলো সেখানে।" ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে চলল টিলাটার দিকে। দুজনের হাতে দুটো পিপে। দূর থেকে দেখল টিলাটা। ন্যাড়া মাথা টিলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিলাটার নিচে পৌঁছল। দেখল টিলাটার নিচে কিছু গাছগাছালি আছে। তারই মধ্যে দিয়ে ঝরনার জল পড়ছে। জলধারাটা খুব বেশি জোরে পড়ছে না। মাটির হাঁড়ি কাঠের গামলা নিয়ে বেশ কিছু লোক জল নিতে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তারপর ফ্রান্সিসরা পিপে বসাল। জল ভরল। বেশ কিছু লোক ফ্রান্সিসদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। সহজেই বুঝল — ওরা বিদেশি। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খাবার জল নিয়ে জাহাজে ফিরে এল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, জলের সমস্যাটা তো মিটল। এবার জাহাজ চলুক দেশের দিকে।"

ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল, "আজকের রাতটা এখানেই থাকতে হবে।"

"ব্যাপার কী বলো তো?"

"রাজা ওভিড্ডোর তরবারি খুঁজে বের করতে হবে।"

হ্যারি দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "ব্যস, হয়ে গেল!"

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "আমার কেবিনঘরে এসো। সব বলছি। নকশাটাও দেখবে।"

দু'জনে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস লেখাটা দেখাল। নকশা দেখাল। সব বলল। শাঙ্কোরা কীভাবে নকশাটা পেয়েছে তাও বলল। হ্যারি বলল, "হুঁ। তা হলে কখন তরবারি খুঁজতে যাবে?"

"আজ রাতেই।" ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে পাঠাল। শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস বলল, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বিশ্রাম করো। তুমি আর আমি টিলার নীচের জঙ্গলে যাব। রাজা ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করব। তুমি দুটো মশাল, চকমকি পাথর নেবে।"

রাত বাড়ল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তৈরি হল। নকশাটা কোমরের ফেট্টিতে জড়িয়ে রাখল। তারপর দু'জনে জাহাজের ডেকে উঠে এল।

সময়টা বোধ হয় শুক্লপক্ষের কোনও রাত। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। দু'জনে নৌকোয় নামল। ফ্রান্সিস নৌকো বেয়ে চলল তীরভূমির দিকে। তীরে পৌঁছল। চলল টিলার দিকে।

কপাল ভাল। পাহারাদার সৈন্যদের হাতে ধরা পড়তে হল না। সদর রাস্তাটায় সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো তখন একটা বাড়ির পেছনে আড়াল নিল। সৈন্যরা কিছুক্ষণ ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করল। তারপর উত্তর দিকে চলে গেল। সেই সময় ফ্রান্সিসরা রাস্তা পার হল।

টিলার তলায় দাঁড়িয়ে দেখল, ওখানে বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গল।

ফ্রান্সিসরা জঙ্গলে ঢুকল। চেস্টনাট গাছগুলো ছাড়া-ছাড়া। তাই অনেক জায়গাতেই চাঁদের আলো পড়েছে। তবু ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে মশাল জ্বালতে বলল।

শাঙ্কো চকমকি ঠুকে দুটো মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিস বলল, "শাঙ্কো, লক্ষ্য রাখো কোনও শুকনো মরা গাছ পাও কিনা।"

দু'জনেই বুনো লতাগাছ আর ঝোপের মধ্যে দিয়ে খুঁজতে লাগল শুকনো মরা গাছটা। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখল একটা শুকনো গাছের কাণ্ড। চারপাশে সব সজীব গাছ। ওই গাছটাই শুধু মরা শুকনো।

ফ্রান্সিস হাতের মশালটা একটা গাছের নিচু ডালে আটকে সেই গাছটার কাছে এল। গাছটার কাণ্ডে হাত দিল। কিছুটা ছাল উঠে এল।

এইবার ফ্রান্সিসের চিন্তা হল, খুঁজে খুঁজে মরা গাছটা তো পাওয়া গেল। কিন্তু রাজা ওভিড্ডোর তরবারির সঙ্গে এই গাছটার সম্পর্ক কী? এই মরা গাছটার মধ্যেই কি তরবারিটা ঢোকানো আছে? গাছটার ভেতরটা কি ফাঁপা? তা হলে সেটা দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল, "শাঙ্কো, মশাল রেখে এসো। মরা কাণ্ডটায় ধাক্কা দিতে হবে।"

শাঙ্কোও হাতের মশালটা মাটিতে পুঁতে ফ্রান্সিসের কাছে এল। দু'জনে মিলে কাণ্ডটায় ধাক্কা দিতে লাগল। গাছটা নড়তে লাগল। কিন্তু ভেঙে পড়লো না।

শাঙ্কো বলল, "দাঁড়াও ফ্রান্সিস, আমি জাহাজ থেকে একটা বেলচা নিয়ে আসছি।"

"কিন্তু পাহারাদাররা যদি এখনও থাকে?" ফ্রান্সিস বলল।

"আমি সাবধানে যাব, সাবধানে আসব। তুমি ভেবো না।"

শাঙ্কো লতাপাতা, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল। চাঁদের আলোয় দেখল পাহারাদার সৈন্যরা বেশ দূরে, ওরা বোধ হয় সেনা-আবাসে ফিরে যাচ্ছে। আর একদল আসবে।

শাঙ্কো দ্রুত পায় হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা পার হল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল নৌকো রাখার জায়গার দিকে।

ফ্রান্সিস ঘাসের উপর বসে রইল। একটু পরেই মরা গাছটায় পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসল। বেলচা না আনলে এখন আর কিছু করার নেই। ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রামত এল। টি টি করে একটা রাতজাগা পাখি ডেকেই চলেছে।

হঠাৎ পট্‌পট্‌ শব্দে ফ্রান্সিসের তন্দ্রাভাবটা কেটে গেল। ও পেছন ফিরে তাকাল। দেখল—শাঙ্কোর রেখে যাওয়া মশালটা মাটিতে পড়ে গেছে। মশালের আগুন থেকে ঝরা পাতার মধ্যে আগুন লেগে গেছে। আগুন বাড়তে লাগল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। একটা নিচু গাছ থেকে পাতাশুদ্ধু ডাল ভাঙল। সেই ডালটা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আগুন বেড়েই চলল। সেইসঙ্গে ধোঁয়া উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল সে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা ধোঁয়া দেখতে পাবে। কী ব্যাপার? অবশ্য তার আগেই দেখতে ছুটে আসবে। পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস পেছন ফিরে পালাবার জন্যে ছুটল। কিন্তু কয়েকটা গাছ পেরোতেই দেখল—সামনে রাজা অপর্তোর সৈন্যরা দল বেঁধে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল—পালানো অসম্ভব। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দাড়িগোঁফওয়ালা একটা সৈন্য

ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল—তুমি পালাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ।

—পারবে এত সৈন্যদের বন্ধনী থেকে পালাতে? গোঁফদাড়ি বলল।

—চেষ্টা করতাম। ফ্রান্সিস বলল।

—মরতে। দাড়িগোঁফ হেসে বলল।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। দাড়িগোঁফ জিজ্ঞেস করল—

—এত রাতে তুমি এখানে কী করছিলে?

—চেস্টনাট গাছের ফল কুড়োচ্ছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কাল সকালে কুড়োতে পারতে। দাড়িগোঁফ বলল।

—দেরি হয়ে যেত। কাল সকালের মধ্যেই লোকে সব ফল কুড়িয়ে নিত। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—তুমি নিজেও জানো যে তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমাদের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। এটুকু বলে গলা চড়িয়ে বলল—চলো।

—কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—সৈন্যাবাসে—বাকি রাতটুকু ওখানেই থাকবে। কালকে সকালে রাজা অপর্তোর রাজসভায় যাবে। রাজা অপর্তো নিশ্চয়ই তোমাকে শাস্তি দেবেন। দাড়িগোঁফ বলল।

—আমার অপরাধ? ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলল।

—তুমি গভীর রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের রণকৌশল জানার চেষ্টা করো। দাড়িগোঁফ বলল।

—আমার লাভ? ফ্রান্সিস বলল।

—বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পাও লরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের কাছ থেকে। দাড়িগোঁফ বলল।

—রাজা ভিলিয়ান আমার মত এক নগণ্য বিদেশির কথা বিশ্বাস করবেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—ভিলিয়ানই তোমাকে পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেই পাঠিয়েছে। দাড়িগোঁফ বলল।

—আমি রাজা ভিলিয়ানের নাম এই প্রথম শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বাজে কথা। চলো। কালকে রাজা অপর্তোর রাজসভায় যা বলতে চাও বলো। বলা যায় না—রাজা অপর্তো তোমাকে মুক্তিও দিতে পারেন। গোঁফদাড়ি বলল।

দাড়িগোঁফ আর দাঁড়াল না। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—এটাকে নিয়ে আয়।

কয়েকজন ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল।

চেস্টনাটের বন শেষ হল। সবাই বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

দাড়িগোঁফ বলল—পাঁচজন ওটাকে নিয়ে যা। সৈন্য আবাসে রাখবি। দুজন নজরে রাখবি যেন পালাতে না পারে।

পাঁচজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। দাড়িগোঁফের নির্দেশমত ফ্রান্সিসকে

সৈন্যাবাসের দিকে নিয়ে চলল।

ওদিকে শাঙ্কো জাহাজ থেকে বেলচা নিয়ে এল। বড় রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, দেখল ফ্রান্সিসকে বন্দী করে কয়েকজন রাজা অপর্তোর সৈন্য চেস্টনাট গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। পেছনে পেছনে আরো সৈন্য জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। চলল জাহাজঘাটের দিকে।

পাঁচজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। উত্তরমুখো।

শাঙ্কো কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এখন ফ্রান্সিসকে উদ্ধার করতে লড়াইয়ে একা নেমে কিছুই করতে পারবে না। তার জন্যে বন্ধুদের সাহায্য দরকার। শাঙ্কো ভাবল আগে দেখি ফ্রান্সিসকে ওরা কোথায় বন্দী করে রাখে। সেই জেনে ওরা ফ্রান্সিসকে মুক্ত করতে চেষ্টা করবে।

আকাশে চাঁদের আলো উজ্জ্বল। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সবই দেখা যাচ্ছে। গাছগাছালির আড়ালে আড়ালে শাঙ্কো চলল বন্দী ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে। ফ্রান্সিসকে নিয়ে সৈন্যরা এল সৈন্য আবাসের সামনে। তারপর ফ্রান্সিসকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

দূর থেকে শাঙ্কো সবই দেখল। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে এখন। শাঙ্কো একটা গাছের নিচে বসল। পূবের আকাশে লালচে আলো ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ পরেই সূর্য উঠল। শাঙ্কো তাকিয়ে রইল সেই দিকে। এখন দিশেহারা। একদিকে ফ্রান্সিস বন্দী। অন্যদিকে জাহাজে মারিয়া, বন্ধুরা, তারাও উদ্বিগ্ন। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কোন খবর নেই।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। মারিয়া ও বন্ধুদের উৎকণ্ঠা দূর করতে হবে। তারপর ভাববে কী করবে।

বেলচাটা কাঁধে নিয়ে শাঙ্কো সদর রাস্তা এড়িয়ে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল। একে গায়ে বিদেশি পোশাক তার ওপর হাতে বেলচা। সহজেই রাজা অপর্তোর সৈন্যদের চোখে পড়ে যাবে। আমি যাই বলে বোঝাই না কেন ওরা আমাকে ছাড়বে না। আমার বন্দী জীবন। ফ্রান্সিস যে ঘরে বন্দী হয়ে আছে। ওকে যে সেই ঘরেই বন্দী করে রাখবে তার কোন মানে নেই। হয়তো অন্য ঘরে বন্দী করবে। ফ্রান্সিসের ঘরে বন্দী করে রাখলে তবু দুজনে মিলে পালাবার পরিকল্পনা করতে পারতো। কিন্তু একা বন্দী হলে পালাতে গিয়ে ধরাও পড়তে পারি। একবার ধরা পড়লে মুক্তির কোন আশা নেই। মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

জংলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কো হাঁটতে লাগল। গা হাত পা কাঁটা ঝোপের ঘষায় কেটে গেল। হাত পা জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু শাঙ্কো দমল না। কাঁটা ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই চলল।

বেলা বাড়ছে। শাঙ্কো ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে পৌঁছোতে হবে। শাঙ্কো দ্রুত চলল। এতে সারা গা হাত পা কাঁটাগাছে কেটে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। শাঙ্কো মুখ বুঁজে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল।

সমুদ্রতীরে যখন পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়েছে। শাঙ্কো বালিয়াড়িতে

নামল। দেখল নৌকোটা জলের কাছে ডাঙায় তোলা আছে। শাঙ্কো নৌকোটা টেনে টেনে জলের ওপর আনল। দেখল গলুইয়ে বৈঠেটা রয়েছে। শাঙ্কো বেলচাটা নৌকোয় রাখল। তারপর নৌকোটাকে এক ধাক্কায় সমুদ্রের জলে নামিয়ে বৈঠে বাইতে লাগল। নৌকো চলল জাহাজের দিকে।

জাহাজের কাছে আসতে ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। শাঙ্কো নৌকোটা জাহাজের গায়ে ভেড়াল। দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধল জাহাজের সঙ্গে। ঝোলানো দড়িদড়া ধরে ধরে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে শাঙ্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেরই এক প্রশ্ন—ফ্রান্সিস কোথায়? ও এলো না কেন?

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব ঘটনাই বলল। ফ্রান্সিস বন্দী শুনে বন্ধুদের মন খারাপ হল। একপাশে মারিয়া দাঁড়িয়েছিল। শুনল সব। কিন্তু কোন কথা বলল না। রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। তীরভূমির দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ ছলছল করছে।

হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—রাজকুমারী আপনি চিন্তা করবেন না—মন খারাপ করবেন না। আর কয়েকটা দিন যেতে দিন। ফ্রান্সিস ঠিক বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে আসবে। আমাদের বড় সান্ত্বনা যে ফ্রান্সিস একা। একা ফ্রান্সিসকে কেউ বন্দী করে রাখতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মারিয়া কিছু বলল না। তীরভূমির দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে পরদিন সকালে বন্দী ফ্রান্সিসকে খেতে দেওয়া হল দুটো পোড়া রুটি আর আনাজে তৈরি ঝোলমত। ফ্রান্সিস খেয়ে নিল। দাড়িগোঁফ ঢুকল। বলল—চলো—তোমাকে রাজা অপর্তোর রাজসভায় যেতে হবে।

—বেশ। চলুন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

দুজনে চলল রাজার রাজসভায়। এদিকে ওদিকে পাথরের ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে একটা বড় বাড়িতে ঢুকল দুজনে। বাড়ির দরজায় দুজন সশস্ত্র প্রহরী। দুজনে ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস দেখল—ঘরের দক্ষিণ দিকে রাজসিংহাসনে রাজা অপর্তো বসে আছে। সিংহাসনটা কাঠের। আসল পাখির পালকে তৈরি। নীলাভ সাটিন কাপড়ে ঢাকা। একপাশে বৃদ্ধ মন্ত্রী। অন্যপাশে সেনাপতি আর অমাত্যরা।

বিচার চলছিল। দাড়িগোঁফ বলল—তুমি আমার সঙ্গে এসো। সে কিছুদূর এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিসও পেছনে পেছনে এল।

আর একটা বিচার আরম্ভ হল। দাড়িগোঁফ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস রাজসভার চারদিক দেখতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচার শেষ হল। দাড়িগোঁফ একটু এগিয়ে গেল। রাজা অপর্তোর নজরে পড়ল। রাজা অপর্তো বলল—তোমার কিছু বলার আছে? দাড়িগোঁফ মাথা একবার একটু নুইয়ে মাথা তুলল। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে যা যা ঘটেছে সব বলল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা ভাইকিং—বিদেশি। আমার রাজ্যে এসেছ গুপ্তচর হয়ে।

—কাদের গুপ্তচর হয়ে এসেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—খুবই সহজ। লরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের হয়ে। রাজা বলল।

—আমি রাজা ভিলিয়ানের নাম এই প্রথম শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বুদ্ধিমান। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তুমি মিথ্যে বলছো। রাজা বলল।

—আমি যা সত্য তাই বলছি। খুব দৃঢ়স্বরে ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু। কিছু লুকোবার চেষ্টা করছো। রাজা বলল।

—আমার লুকোনোর কিছু নেই। যা সত্য তাই বললাম। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি শুধু ফল কুড়োবার জন্যে চেস্টনাটের জঙ্গলে যাওনি। আমাদের যুদ্ধ আয়োজনের সংবাদ রাজা ভিলিয়ানকে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তুমি নিয়েছো। রাজা বলল।

—মিথ্যে অপবাদ। আমি কেন গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—অনেক অর্থ পাবে সেই লোভে। রাজা বলল।

—আমার সেই লোভ নেই। অনেক মূল্যবান গুপ্তধন আমি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু সেই কাজের জন্যে একটা স্বর্ণমুদ্রাও আমি নিই নি। আমি এখনও বলছি— আমি নির্দোষ। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা অপর্তো ক্রুদ্ধ হল। বলল—থামো—তুমি দোষী কি নির্দোষ তার বিচার পরে হবে। ততদিন তুমি সৈন্যাবাসে বন্দী থাকবে। বাইরের জগতের সঙ্গে তোমার কোন যোগ থাকবে না। রাজা বলল।

—আমাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রাখা হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে যে হত্যা করা হয়নি—এটাই যথেষ্ট। রাজা বলল।

—বিনা প্রমাণে? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রমাণের দরকার নেই। আমার হুকুমই প্রমাণ। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। বুঝল রাজা অপর্তোর কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া অসম্ভব। বিনা বিচারে বন্দীদের হত্যা করা রাজা অপর্তোর কাছে কোন অপরাধই নয়। এর কাছে প্রমাণ টমানের কথা বলা অর্থহীন। রাজা অপর্তো রগচটা লোক। বেশি কথা বললে হয়তো বিরক্ত হয়ে ফাঁসির হুকুমও দিয়ে বসতে পারে।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

রাজসভার কাজ শেষ হল। রাজা অপর্তো উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রী অমাত্য সেনাপতি আর প্রজারাও উঠে দাঁড়াল। রাজা অপর্তো সভা থেকে চলে গেল।

দাড়িগোঁফ ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এবার চলো। ফ্রান্সিস দেখল বৃদ্ধ মন্ত্রীমশাই বেরোবার দরজার দিকে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাড়িগোঁফকে বলল—আমি মন্ত্রীমশাইর সঙ্গে কথা বলবো।

—মন্ত্রীমশাই তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। দাড়িগোঁফ বলল।

—না—অন্য ব্যাপারে মন্ত্রীমশাইর সঙ্গে কথা বলবো।

—বেশ। যাও। পালাবার চেষ্টা করবে না। গোঁফদাড়ি বলল।

ফ্রান্সিস মন্ত্রীমশাইর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—মন্ত্রীমশাই? মন্ত্রীমশাই দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—কী ব্যাপার?

—কয়েকটা ঘটনা জানতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। মন্ত্রী বলল।

—আচ্ছা রাজা ওভিড্ডো কে ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রায় দেড়শো বছর আগে এখানকার রাজা ছিলেন। মন্ত্রী বলল।

—তিনি কি খুব ধনী ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। শুনেছি—খুব খেয়ালি রাজা ছিলেন। ধনী ছিলেন তো বটেই। একটা প্রায় সাত হাত লম্বা তরোয়াল তৈরি করিয়েছিলেন। নিরেট সোনায় তৈরি। রাজবাড়ির কর্মকারেরা ঐ তরোয়াল তৈরি করেছিল। তরোয়ালের কোষের গায়ে হীরে মুক্তো মণিমাণিক্য গাঁথা ছিল। মন্ত্রী বলল।

—এটা কী করে জানলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—খেয়ালি রাজা ছিলেন তো। তরোয়াল তৈরি হবার পর সেটা প্রজাসাধারণের দেখার জন্যে একটা লম্বা কাঠের আসনে তরোয়ালটা রেখে রাজবাড়ির চত্বরে রেখেছিলেন। তরোয়ালের সামনে প্রজাদের ভিড় লেগেই থাকতো। সন্ধ্যে হলে তরোয়ালটা প্রাসাদের ভেতরে অস্ত্রাগারে রেখে দেওয়া হত। মন্ত্রী বলল।

—সেই তরবারিটার কী হল? রাজা ওভিড্ডো মারা যাবার পর আর কেউ ঐ তরবারি চোখে দেখে নি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—মারা যাবার কিছুদিন আগে তরবারিটা অস্ত্রাগার থেকে বের করা বন্ধ হল। তারপর সেই তরবারি যে কোথায় কিভাবে ওভিড্ডো লুকিয়ে রাখলেন কেউ সেটা জানতে পারে নি। মন্ত্রী একটু থেমে বলল। রাজা ওভিড্ডোর পর তো আরো রাজা রাজত্ব করেছেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ খুঁজে পান নি।

ফ্রান্সিস আড়চোখে তাকিয়ে দেখল—দাড়িগোঁফ একটু দূরে দুই পাহারাদারের সঙ্গে গল্প করছে। এই সুযোগ। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করল। মন্ত্রীমশাইকে দেখাল শুধু নকশাটা। মন্ত্রীমশাই নকশাটা দেখে বলল—কীসের নকশা?

—রাজা ওভিড্ডো এই নকশাটা রেখে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—এতে দেখা যাচ্ছে পুরোনো নকশা। মন্ত্রী বলল।

—এটা দেখে আপনি কিছু বুঝতে পারছেন? ফ্রান্সিস বলল।

মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে বলল—উঁহু। কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ভালো করে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ দেখছি তো একটা টিলা একটা গুহামত গাছপালা।

—কী গাছ? ফ্রান্সিস বলল।

—বলতে পারবো না। মন্ত্রী বলল।

—আচ্ছা একটা মরা গাছ আছে লক্ষ্য করেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। মন্ত্রীমশাই নকশাটা ফ্রান্সিসকে ফেরৎ দিয়ে বলল—মা মেরিই জানেন এই নকশার অর্থ কী? ফ্রান্সিস নকশাটা কোমরের ফেট্টিতে রেখে দিল।

ফ্রান্সিস সিংহাসনের বেদী থেকে নেমে এল। দাড়িগোঁফ এগিয়ে এল। বলল—কী? ছাড়া পাবার কিছু উপায় দেখলে?

—না। আমি অন্য বিষয়ে কথা বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

দাড়িগোঁফ আর একজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস তখন ভাবছে মন্ত্রীমশাইও নকশার কিছু বুঝল না। বলতেও পারল না কিছু। শুধু জানা গেল বছর একশো দেড়শো আগে এখানে রাজত্ব করত ওভিড্ডো নামে এক খামখেয়ালি রাজা। নিরেট সোনা দিয়ে একটা তরবারি বানিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর থেকে আর সেই সোনার তরবারি খুঁজে পাওয়া যায়নি। খামখেয়ালি রাজা ওভিড্ডো কোথায় কীভাবে তরবারিটি গোপনে রেখে গেছে কেউ জানে না। তারপরে যারা রাজত্ব করেছে তাদের কেউ কেউ সোনার তরবারি খুঁজেছে। কিন্তু পায়নি।

ফ্রান্সিসকে পাহারা দিয়ে দাড়িগোঁফ আর অন্য সৈন্যটি সৈন্যাবাসে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে শাঙ্কো হ্যারির কেবিন ঘরে এল। বিছানায় বসল। বলল—হ্যারি আমি আজ রাতে সমুদ্রতীরে নামবো। বেলচাটাও সঙ্গে নেব। ঐ চেস্টনাটের জঙ্গলে যাবো। দেখি রাজা ওভিড্ডোর তরবারির কোন হদিশ করতে পারি কি না।

—কিন্তু ঐ জঙ্গলেই তো ফ্রান্সিস রাজা অপর্তোর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছে। এখনও বন্দী রয়েছে। হ্যারি বলল।

—ফ্রান্সিসকে নিয়ে ভেবো না। ও একা। অতি সহজেই পালাতে পারবে। আমি অতি সাবধানে যাবো। পাহারাদার সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে একবার চেস্টনাটের জঙ্গলে ঢুকতে পারলেই আর ভয় নেই। শাঙ্কো বলল।

—ফ্রান্সিস নেই তার ওপর তুমি যদি বন্দী হও? আমাদের দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না। তুমি যেও না। হ্যারি বলল।

—হ্যারি ঐ তরবারিটার খোঁজ করতেই হবে। কিচ্ছু ভেবো না। বিপদ দেখলেই এক ছুটে সমুদ্রের ধারে চলে যাবো। তারপর সমুদ্রে নেমে পড়বো। নিঃশব্দে সাঁতরে আমাদের এই জাহাজে চলে আসবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখ—যদি পারো। তবে তুমিও বন্দী হলে আমরা অসহায় হয়ে পড়বো। হ্যারি বলল।

—কিছ্ছু ভেবো না। শাঙ্কো বলল।

রাত একটু বাড়তেই শাঙ্কো বেলচাটা নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। দেখল হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো জাহাজের হালের দিকে গেল। দড়ির মইটা নামাল। বেলচাটা এক হাতে ঘাড়ে তুলে মইয়ের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। নৌকোয় উঠল। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় হ্যারির দিকে চেয়ে হাত নাড়ল। নৌকো ছেড়ে দিল।

জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়। সমুদ্রেও জলের ওপরে কুয়াশার নীলচে আস্তরন

মত। শাঙ্কো কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে নৌকো চালাল। একটু বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

শাঙ্কো বৈঠে চালাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো তীরভূমিতে পৌঁছল। নৌকো থেকে নেমে নৌকো থেকে বেলচা তুলে নিল। নৌকোটা ঠেলে বালিয়াড়িতে এনে রাখল।

বেলচাটা কাঁধে নিয়ে শাঙ্কো চলল বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গল লক্ষ্য করে। ঝোপঝাপের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কো চলল। সদর রাস্তার কাছে এল। সাবধানে ঝোপের আড়াল থেকে সদর রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল রাজা অপর্তোর একদল সৈন্য সারি বেঁধে জাহাজঘাটের দিকে চলেছে। কারো মুখে কথা নেই। ধুপ্ ধুপ্ পায়ের শব্দ হচ্ছে শুধু। সবার হাতে খোলা তরোয়াল। যুদ্ধের আবহাওয়া এখানে। তাই দিনরাত পাহারা চলেছে।

শাঙ্কো ভাবল এ সময়ে গোপনে কোন কাজ করা যাবে না। ভাবল—আমরা নকশা পেয়েছি। সোনার তরবারি কোথায় থাকতে পারে তারও একটা অনুমান করতে পেরেছি। এখন দরকার কাজে নামা।

একটু পরেই দেখল জাহাজঘাট থেকে একদল সৈন্য রাজবাড়ির দিকে চলেছে। ধুলোঢাকা পথে ওদের পায়ের শব্দ উঠছে ধুপ্ ধুপ্।

শাঙ্কো অপেক্ষা করতে লাগল। রাস্তার দুই দিকে তাকিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত দেখল। না। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শাঙ্কো রাস্তায় শুয়ে পড়ল। তারপর হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। পথ শেষ। শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েই এক ছুট দিল চেস্টনাট গাছের জঙ্গলের দিকে। কাঁধে বেলচা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চেস্টনাট গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে এবার আস্তে আস্তে চলল। অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না। তার ওপর জঙ্গল। জ্যোৎস্না পড়ছেও কম। ওর মধ্যেই সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলল।

জঙ্গলের এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেই মরা গাছটার কাছে এল। দূর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে গাছটার কাছে। গাছটাকে ধরে গাছের গোড়ায় যেন কিছু ঢালছে। শাঙ্কো এক ছুটে গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়াল। লোকটা চমকে উঠল। শাঙ্কো দেখল লোকটি বৃদ্ধ। গায়ে এইদেশীয় ঢোলাহাত জামা। হাতে একটা কাঠের পাত্র। বৃদ্ধটি কাঠের পাত্রটা সরিয়ে আনল। শাঙ্কো বৃদ্ধটির কাছে গিয়ে বলল—আপনি কে? ভাঙা ভাঙা গলায় বৃদ্ধটি বলল—আমি একজন বৈদ্য।

—এখানে মরা গাছটার গোড়ায় কী ঢালছিলেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ওষুধ। বৈদ্য বলল।

—কী ওষুধ? শাঙ্কো বলল।

—সেটা বললেও আপনি বুঝবেন না। তবু বলি ওষুধটার নাম উজিমা—গ্রীক শব্দ। অর্থ—জীবন। বৃদ্ধ বৈদ্য বলল।

—ঐ ওষুধ ঢাললেন কেন? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—যাতে গাছটা বেঁচে থাকে। বৃদ্ধ বলল।

—গাছটা তো মরে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—না। একেবারে মরে যায় নি। ওষুধ পেলে কোনদিন মরবে না। বৈদ্য বলল।

—কেন ওষুধ দিচ্ছিলেন? শাঙ্কো বলল।

—আমরা বংশপরম্পরায় এই কাজটা করে আসছি। অবশ্যই গভীর রাতে এসে ওষুধটা দি। বৃদ্ধ বৈদ্য বলল।

—ওষুধ কি প্রতিদিন দিয়ে থাকেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—না। মাসে একবার। বৃদ্ধ বলল।

—তাতে কি গাছটা বেঁচে যাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। বৈদ্য বলল।

—বেশ। কিন্তু গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—সে অনেক কথা। যখন রাজা ওভিড়ো এখানে রাজত্ব করতেন—তখন আমাদের পূর্বপুরুষ একজন রাজা ওভিড়োকে কঠিন ব্যাধি থেকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেছিলেন। রাজা সুস্থ হয়ে একদিন গভীর রাতে আমাদের পূর্বপুরুষ চিকিৎসককে একা এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন—আপনি কি এই গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন? আমাদের পূর্বপুরুষ বলেছিলেন—একটা ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি সেটা মাসে একবার করে এই গাছটার গোড়ায় দিলে গাছটি মরবে না। বৃদ্ধ বলল।

—তবে মানুষের ওপরও কি ওষুধটা প্রয়োগ করা যায় না? শাঙ্কো বলল।

—না। এটা শুধু গাছকেই চিরজীবী করতে পারে। বৃদ্ধ বলল।

—আচ্ছা—ওষুধ দিয়ে এই গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে কি রাজা ওভিড়োর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—বলতে পারবো না। বৃদ্ধ বলল।

—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছটা মরে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—না। মরে যায় নি। আপনার বেলচাটা দিয়ে গাছটার কাণ্ডে জোরে খোঁচা দিন। বৃদ্ধ বলল।

শাঙ্কো বেলচাটা দিয়ে গাছটায় জোরে খোঁচা দিল। একটু পরে শাঙ্কো খোঁচা দেওয়া জায়গাটায় আঙ্গুল দিয়ে ঘষল। দেখল ভেজা ভেজা। কী যেন লেগেছে। গাছের রস। তাহলে তো গাছটা বেঁচে আছে। এ তো অকল্পনীয়।

—দেখলেন তো গাছটা এখনও জীবিত। বৃদ্ধ বৈদ্য বলল।

—হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। শাঙ্কো বলল।

হঠাৎ নিস্তব্ধ বনটায় ঝরাপাতা ভাঙার শব্দ হল। শাঙ্কো আর বৃদ্ধটি চমকে উঠল। শাঙ্কো একটা ঝোপে বেলচাটা ছুঁড়ে ফেলে ছুটল পশ্চিমদিক লক্ষ্য করে। বৃদ্ধটি পালাতে গিয়ে আর পারল না। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা ওকে ঘিরে ধরল।

দাড়িগোঁফওয়ালা সেই দলনেতা এগিয়ে এল। বলল—তুমি কে?

—আমি একজন কবিরাজ। এখানেই থাকি। বৃদ্ধ বলল।

—এখানে কী করছো? দাড়িগোঁফ জিজ্ঞেস করল।

—আমার এক বন্ধু আমাকে গভীর রাতে এখানে আসতে বলেছিল। বৃদ্ধ বলল।

—কেন?

—তা জানি না। বৃদ্ধ বলল।

—বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? দাড়িগোঁফ জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা এসে পড়ায় বন্ধুটি পালিয়েছে। বৃদ্ধটি বলল।

—ঠিক আছে। আপনাকে বন্দী করা হল। দাড়িগোঁফ বলল।

—কিন্তু আমি তো কোন অপরাধ করি নি। বৃদ্ধ কবিরাজ বলল।

—এখন আমরা লড়াইয়ের মুখে। এসময় গভীর রাত—আপনার বন্ধু এই জঙ্গলে এসব সন্দেহজনক ব্যাপার। কে জানে। হয়তো শত্রুপক্ষকে নির্দেশ দিতে এসেছিলেন। দাড়িগোঁফ বলল।

—দোহাই—আমি গুপ্তচর নই। বৃদ্ধ কবিরাজ বলল।

—সে সব পরে দেখা যাবে। চলুন। দাড়িগোঁফ বলল।

দাড়িগোঁফ দলনেতা বলল—চলো সব। সৈন্যরা ওর পেছনে পেছনে চলল।

ওদিকে শাঙ্কো চেস্টনাট গাছের জঙ্গলের মধ্যে যথাসাধ্য দ্রুত ছুটল সমুদ্রের দিকে।

শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে দূরবিস্তৃত সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল। দেখল চাঁদের আলো অস্পষ্ট। সমুদ্রে ঢেউও তেমন নেই। খুবই শান্ত সমুদ্র। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। বন্দরের দিকে তাকাল। দেখল দুটো জাহাজ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সমুদ্রে নামল। তারপর ছোট জলের ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কেটে চলল।

দূর দিয়ে রাজা অপর্তোর যুদ্ধ জাহাজ পার হল। এবার ওদের জাহাজটা দেখা গেল।

শাঙ্কো সাঁতরে চলল। সাঁতরে এসে নিজেদের জাহাজের হালটা ধরল। হাঁপাতে লাগল। মুখ হাঁ করে। পূব আকাশে তখন সূর্য উঠছে।

শাঙ্কো হালের খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজে উঠল।

জাহাজের ডেক-এ চারপাঁচজন বন্ধু ঘুমিয়েছিল। তাদের মধ্যে দুতিনজন শাঙ্কোকে দেখে এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার শাঙ্কো। একজন বলল—তুমি কি স্নান করলে?

—মুণ্ডু। শোন্—হ্যারিকে এখানে আসতে বল্। একজন চলে গেল হ্যারিকে ডাকতে। একটু পরেই হ্যারি এল। শাঙ্কোর ঐ অবস্থা দেখে বলল—

—কী ব্যাপার শাঙ্কো? জলে নেমেছিলে কেন?

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব বলল। হ্যারি বলল—খুব বেঁচে গেছো। যাক গে—বোঝা যাচ্ছে—ঐ মরা গাছটার গুরুত্ব আছে। এখন চাই ফ্রান্সিসের মুক্তি।

ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

হ্যারি—কয়েকটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। সব গাছ ছেড়ে মরা গাছটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? রাজা ওভিড্ডো কেন গাছটার গোড়ায় ওষুধ ঢালার ব্যবস্থা করেছিল। ঐ বৈদ্যরা বংশানুক্রমে ঐ মরা গাছটার গোড়ায় ওষুধ দিয়ে আসছে কেন? মরা গাছটা বেঁচে আছে এটাও একটা রহস্য। সত্যিই কি ওষুধে এখনও কাজ হচ্ছে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ শাঙ্কো — আমার মনেও এই প্রশ্নগুলো আসছে। হ্যারি বলল। এখন আর এসব ভেবে কী লাভ? ফ্রান্সিসকে মুক্ত করে এখন দেশের দিকে জাহাজ চালাতে হবে। এ ছাড়া এখন আর কিছুই করণীয় নেই। হ্যারি বলল।

দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিস এলো না। হয়তো পালাতে গিয়ে আবার ধরা পড়েছে। ভাইকিং বন্ধুরা দুশ্চিন্তায় পড়ল। বিস্কো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে হ্যারির কাছে এল। বলল—তুমি রাজি হলে আমরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের খোঁজে যেতে পারি।

—না না—হ্যারি বলল—শাঙ্কো অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছে। তোমরাও বন্দী হলে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। তার চেয়ে ফ্রান্সিসের জন্য আমরা অপেক্ষা করবো।

আরো একদিন কাটল। ফ্রান্সিস এল না।

সেদিন গভীর রাত। নজরদার পেড্রো গা এলিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে নজরদারের বসার আসনে বসেছিল। একটু তন্দ্রামতই এসেছিল। সমুদ্রের উত্তাল বাতাস সত্ত্বেও নিচে দুএকজনের গলার শব্দ শুনল। পেড্রোর তন্দ্রা ভেঙে গেল। ও নিচের দিকে তাকাল। সর্বনাশ! ও দেখল একটা যুদ্ধ জাহাজ ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ঐ জাহাজ থেকে যুদ্ধসাজ পরা সৈন্যরা ওদের জাহাজে উঠে আসছে।

পেড্রো সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুল বেয়ে নামতে গেল। দেখল একজন সৈন্য ওর আসন ধরে উঠে দাঁড়াল। হাতে খোলা তরোয়াল। সৈন্যটি বলল—নেমে এসো। একটা কথা জোরে বললে তুমি মরবে।

পেড্রো আস্তে আস্তে নেমে এল। দেখল—একদল সৈন্য ডেক-এ জড়ো হয়েছে। পেড্রোকে ডেক-এর একপাশে বসিয়ে রাখা হল।

সৈন্যরা সব প্রথমে অস্ত্রঘরে ছুটে গেল। দুজন ভাইকিং প্রহরীকে আহত করল। ওখানে চারজন সৈন্য অস্ত্রঘর পাহারা দিতে লাগল।

সৈন্যরা কেবিনঘরে ঢুকে ঢুকে নিদ্রিত ভাইকিংদের তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙাল। ভাইকিংরা চমকে জেগে উঠে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা। কিছু করার নেই। খালি হাতে লড়াই চলে না। একজন ভাইকিং ঘর থেকে পালাল। গেল অস্ত্রঘরের কাছে। দেখল চারজন সৈন্য অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে।

ওদিকে ভাইকিংরা ডেক-এ উঠে এলেই ডেক-এর একপাশে তাদের বসিয়ে

দেওয়া হতে লাগল। মারিয়াকেও বসিয়ে দেওয়া হল।

একজন সৈন্য ওদের জাহাজে সেনাপতিকে খবর দিতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি ভাইকিংদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। সেনাপতির দশাসই চেহারা। ইয়া গোঁফ। মাথার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। কানের নিচে তরোয়ালের কাটা দাগ।

সেনাপতি ডেক-এর এপার ওপার পায়চারি করল। হ্যারিদের কাছে এসে দাঁড়াল। তখন হ্যারি উঠে দাঁড়াল। সৈন্যরা ছুটে এল। সেনাপতি হাত তুলে ওদের থামাল। হ্যারি বলল—আমরা জানিনা। আপনারা কারা?

সেনাপতি দাঁত বের করে হাসল। বলল—আমরা নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের সৈন্য। আমি সেনাপতি। তোমাদের কাউকে একটু বেচাল দেখলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

একটু থেমে সেনাপতি বলল—তোমরা তো দেখছি বিদেশী। তোমরা কারা? এখানে এসেছো কেন?

—আমরা বিদেশী। আমরা ভাইকিং। দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই আর কোন গুপ্তধনের কথা শুনলে সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করি।

—এখানেও শুনেছি রাজা ওভিড্ডোর একটা সোনার তরবারি আর তার খাপ রাখা আছে। তোমরা খুঁজবে নাকি? কথাটা বলেই সেনাপতি হো হো করে হেসে উঠল। সৈন্যরাও কেউ কেউ হাসল।

—যাক গে ওসব গুপ্তধনটনের কথা। তোমাদের দলপতি কে? সেনাপতি বলল।

হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—এখন আমিই দলপতি। আসল দলপতি যে সে রাজা অপর্তোর হাতে বন্দী।

—শোন সেনাপতি বলতে লাগল—আমরা রাজা অপর্তোর এই দেশ দখল করতে এসেছি। কেউ কি নিজের সম্পত্তি ছাড়ে? ছাড়ে না। রাজা অপর্তোও ছাড়বে না। কাজেই যুদ্ধ হবে। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। সেনাপতি থামল।

—এ সবের সঙ্গে আমাদের কী যোগ? আমরা তো কারো পক্ষ হয়েই যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। হ্যারি বলল।

—কেন? আমাদের হয়ে তোমরা যুদ্ধ করতে পারো। সেনাপতি বলল।

—না। আমরা কোন দেশেই যাবো না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। সে সব পরে দেখা যাবে। এখন এই যুদ্ধের জন্যে আরো জাহাজের প্রয়োজন। মাত্র দুটো জাহাজ নিয়ে এসেছি। অনেক সৈন্যকে ভিগোতে রেখে আসতে হয়েছে। সেই সৈন্যদের নিয়ে আসবো। এখনই তোমাদের জাহাজটা আমরা নেব। জাহাজ চালিয়ে ভিগোতে যাবো। আরো সৈন্য নিয়ে ফিরে আসবো। সেনাপতি বলল।

—ঠিক বুঝলাম না। হ্যারি বলল।

—এ তো জলের মত সহজ। তোমাদের জাহাজ আরো সৈন্য আনতে ভিগো

যাবে। তোমরাই চালিয়ে যাবে। আমাদের এক দলপতি তোমাদের সঙ্গে যাবে। তারপর ভিগো থেকে সৈন্য নিয়ে এই জাহাজে ফিরে আসবে। ব্যস। সেনাপতি বলল।

—কিন্তু আমাদের দলপতি এখনো রাজা অপর্তোর সৈন্যাবাসে বন্দী। সে যেকোন মুহূর্তে এখানে আসতে পারে। হ্যারি বলল।

—পালিয়ে? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—অত সহজে পালাতে পারবে না। সেনাপতি বলল।

—সহজ কঠিন যে অবস্থাই হোক না—সে পালাবে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তাতে কী হল? সেনাপতি বলল।

—সে এসে আমাদের না দেখলে দুশ্চিন্তায় পড়বে। হ্যারি বলল।

· তার ব্যবস্থাও আমরা করবো। আমি তো রয়েইছি। জাহাজ ভর্তি সৈন্য রয়েছে। আমরাই তাকে তোমাদের কথা বলবো। তাহলেই সে নিশ্চিন্ত হবে। কী? ঠিক আছে? হ্যারি কিছুক্ষণ ভাবলো। শাঙ্কোকে বলল—কী করবে?

—এ ছাড়া তো কোন পথ দেখছি না। শাঙ্কো বলল।

—ভেন তুমি কী বল? হ্যারি ভেন-এর মতামত চাইল।

—দ্যাখ হ্যারি এখানে যে কোন মুহূর্তে লড়াই লেগে যেতে পারে। এখন এখানে থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। ভিগোতে যেতে আসতে কত আর সময় লাগবে। ভেন বলল।

—বেশ। সেনাপতির দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল—ঠিক আছে। আমরা যাবো।

—এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। তাহলে দেরি না করে কালকে সকালেই তোমাদের জাহাজ ছাড়ো। আর একটা কথা। দূরত্ব আর কুয়াশার জন্যে রাজা অপর্তোর সৈন্যরা আমাদের অবস্থান কিছু বুঝতে পারছে না। কুয়াশা কেটে গেলেই আমাদের দেখতে পাবে। আমাদের আর তোমাদের জাহাজ এখনই বেশ দূরে নিয়ে যেতে হবে। রাজা অপর্তোর সৈন্যদের নজরের বাইরে তোমরা নোঙর ফেলো। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি নিজেদের জাহাজে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেনাপতির জাহাজ দুটো গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। হ্যারি ফ্রেজারকে বলল—ওদের পেছনে পেছনে চলো। ফ্রেজার সেই হিসেবেই জাহাজ চালাতে লাগল।

অনেকটা দূরে গিয়ে সেনাপতির জাহাজ দুটো থামল। হ্যারিও জাহাজ দুটোর পাশে নিজেদের জাহাজ লাগাতে বলল। ফ্রেজার জাহাজ লাগাল।

একটু পরেই ভোর হল। হ্যারি তখনও জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে চেয়ে দেখল—কুয়াশা সরে গেলেও তীরভূমি দেখা যাচ্ছে না।

হ্যারিরা সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই দলপতি মারফত সেনাপতি জানিয়ে

দিল যে দুপুরের খাওয়া খেয়ে হ্যারিদের জাহাজ ছাড়তে হবে।

দুপুরের খাওয়া হলে দলপতি এসে বলল—এখন তোমাদের জাহাজ ছাড়ো। মারিয়া হ্যারির কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিসের কোন বিপদ হবে না তো? হ্যারি বলল—চিন্তা করবেন না রাজকুমারী আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। তাছাড়া আপনি যাতে এখানেই সেনাপতির জাহাজে থাকতে পারেন তাঁর ব্যবস্থা করছি।

হ্যারি দলপতির কাছে এল। বলল—আমি সেনাপতির সঙ্গে একটা জরুরী কথা বলবো।

—কী জরুরী কথা?

—সেটা তাকেই বলবো?

—বেশ। খোঁজ নিচ্ছি। দলপতি কথাটা বলে ওদের জাহাজের একজন সৈন্যকে বলল—দেখতো সেনাপতি কী করছেন। সৈন্যটা চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল—সেনাপতি বিছানায় বসে আছেন।

—তার মানে তাঁর বিশ্রাম করা হয়ে গেছে। দলপতি বলল। তারপর হ্যারিকে আসতে বলল।

দুজনে সেনাপতির জাহাজে গেল। সেনাপতির কেবিন ঘরের সামনে এসে আস্তে দরজায় টোকা দিল। সেনাপতির গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল—কে?

—আমি দলপতি।

—এসো। সেনাপতি বলল।

দুজনে কেবিনঘরে ঢুকল। সেনাপতি দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার।

হ্যারিকে দেখিয়ে দলপতি বলল—এই ভাইকিং আপনাকে কিছু বলতে চায়।

—বলো। সেনাপতি হ্যারির দিকে তাকাল।

—বলছিলাম আমাদের সঙ্গে দেশের রাজকুমারী রয়েছেন। তাঁকে ভিগোতে নিয়ে যাবো না। তিনি আপনাদের জাহাজেই এখানে থাকবেন। আপনি এই অনুমতিটা দিন। হ্যারি বলল।

—বেশ। থাকবে। সেনাপতি বলল।

—আপনাকে যে কী বলে—হ্যারি বলতে গেল। সেনাপতি থামিয়ে দিয়ে বলল—যাও—তাকে আমাদের জাহাজে নিয়ে এসো। মারিয়াকে সেনাপতির জাহাজে নিয়ে আসতে সমস্যা হল। প্রথমে মারিয়া নিজেদের জাহাজ ছেড়ে আসতে চাইল না। হ্যারি আর ভেন অনেক করে বলেও মারিয়াকে রাজি করাতে পারছিল না। তখন ভেন বলল—এখানে জাহাজে থাকলে ফ্রান্সিস প্রথমে আপনাকেই দেখবে। ও কত খুশি হবে। এবার মারিয়া রাজি হল। দুটো জাহাজের মাঝখানে দুটো পাটাতন ফেলা হল। শাঙ্কো মারিয়াকে পাঁজকোলা করে পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেনাপতির জাহাজে এল। মারিয়াকে নামিয়ে দিল। সেনাপতির জাহাজ এল। জাহাজ ছাড়ার উদ্যোগ আয়োজন চলল। পাল

দড়িদড়া সব দেখে নেওয়া হল। দলপতির সঙ্গে চারজন সশস্ত্র সৈন্য হ্যারিদের জাহাজে এল।

জাহাজ ছাড়া হল। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠল। এখন আর দাঁড় বাইতে হবে না। আকাশও নির্মেঘ। জাহাজ বেশ জোরেই সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল। হ্যারি জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় যাচ্ছি। বিপদ হবে না তো, এসব ভাবতে লাগল।

একদিন দুপুর নাগাদ জাহাজ ভিগো নগরের জাহাজঘাটায় পৌঁছল। দূর থেকে শহরটা দেখে হ্যারিরা খুব খুশি। কতদিন পরে মাটিতে হাঁটবে। লোকজন দোকানপাট দেখবে। শহরের ভিড়ে ঘুরে বেড়াবে। রাতে আলোর রোশনাই দেখবে।

জাহাজ ঘাটে ভিড়ল। দলপতি এগিয়ে এল। বলল—সবাই নামো।

সবাই জাহাজ থেকে নামল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল। দলপতি এগিয়ে এল। বলল—তোমরা সার বেঁধে চলো। হঠাৎ আরো জনাদশেক সশস্ত্র সৈন্য কোথা থেকে এল। হ্যারিদের ঘিরে দাঁড়াল। ভেন ইশারায় হ্যারিকে কাছে ডাকল। হ্যারি ভেন-এর কাছে এল। ভেন বলল—হ্যারি আমরা বোধহয় বিপদে পড়লাম।

—তা কেন। আমরা তো বন্দী। এভাবেই তো নিয়ে যাবে। হ্যারি বলল। মাথা নেড়ে ভেন বলল—আমাদের পাহারা দেবার জন্যে এত সৈন্যের কি প্রয়োজন আছে?

—ঠিক বুঝতে পারছিনা—এত সৈন্য কেন? হ্যারি বলল।

—তার মানে কিছু একটা ঘটবে যার জন্যে আমরা বিদ্রোহী হতে পারি। তাই এত সৈন্য। ভেন বলল।

হ্যারি ভাবল। বলল—ভেন—আমি যেন এখন বুঝতে পারছি ঐ দলপতির কথা না শুনলেই হত।

—তারও তো উপায় ছিল না হ্যারি। ভেন বলল।

—না। উপায় ছিল। আমরা বলতে পারতাম যে আমরা যাব না। আপনারা জাহাজ নিয়ে যান। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ এটাই করা উচিত ছিল। যাক গে—দেখি এরা আমাদের নিয়ে কী করে। ভেন বলল।

হ্যারিরা চলেছে। এই ভর দুপুরেও রাস্তায় বেশ লোকজন। হ্যারিরা যেমন রাস্তার লোকজন দেখছে তেমনি রাস্তার লোকজনও হ্যারিদের দেখছে। লোকেরা ভাবছে কারা এই বিদেশী। সৈন্যরা ঘিরে এদের নিয়ে যাচ্ছে কেন? কোথায় যাচ্ছে?

একটা বেশ বড় পাথরের বাড়ির সামনে হ্যারিদের থামতে বলা হল। বাড়িটার তুলনায় প্রবেশ দ্বার খুবই ছোট। একজন একজন করে ঢোকা যায়। প্রবেশ দ্বারের দুপাশে চার পাঁচজন প্রহরী। হাতে বর্শা। কোমরে তরোয়াল গোঁজা।

হ্যারি ঘুরে দাঁড়াল। দলপতির কাছে গেল। বলল—এটা কয়েদখানা। আমরা

এখানে এসে কয়েদখানায় থাকবো সেনাপতির সঙ্গে তো তেমনি কথা হয় নি।

—আমি নিরুপায়। এটা সেনাপতির হুকুম। দলপতি বলল। হ্যারি দুহাত তুলে চিৎকার করে বলল—আমরা এই কয়েদখানায় ঢুকবো না। আমাদের সরাইখানায় রাখা হোক। ভাইকিং বন্ধুরাও ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পারলো। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ভাইকিংদের ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে দলপতি একটু ঘাবড়ে গেল। হ্যারি উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। বন্ধুরাও ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। বিস্কো চিৎকার করে বলে উঠল—এই বাড়িতে আমরা ঢুকবো না। আমাদের কোন সরাইখানায় নিয়ে যেতে হবে। শুরু হল হৈ হল্লা। হ্যারিরা তখন সারি ভেঙে ফেলেছে। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—সবাইকে ঘিরে রাখো। সৈন্যরা পরস্পর হাত ধরে হ্যারিদের আটকে রাখল। দলপতি দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বলল—তোমরা শোন। এটা সেনাপতির হুকুম। আমাকে মানতেই হবে। যদি না মানি তাহলে আমাকে মরতে হবে। তোমরা কি চাও আমার মৃত্যু হোক। আমি তো তোমাদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করি নি।

হৈ হল্লা কমল। হ্যারি ভেনকে বলল—ফ্রান্সিস নেই। আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

—বাধা দিয়ে লাভ নেই। ওরা সংখ্যায় বেশি। তার ওপর আমরা নিরস্ত্র। ওরা যদি তরোয়াল চালায় আমরা কেউ বাঁচবো না। বন্দী জীবন মেনে নাও। এখন এটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হ্যারিও সেটা বুঝতে পারছিল। জাহাজঘাটা থেকে আরো যে সৈন্য ওদের সঙ্গে এলো এটাও সেনাপতির ধূর্তামি।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব। এখন এভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমরাই বিপদে পড়বো। আমরা নিরস্ত্র নিরুপায়। এখন বন্দীদশা মেনে নাও। আমার অনুরোধ শান্ত হও। সময় ও সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে। তার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে। সশস্ত্র সৈন্যরা যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা কেউ বাঁচবো না। হৈ হট্টগোল থেমে গেল।

ভাইকিংরা আস্তে আস্তে লোহার দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগল। ঢোকার আগে শাঙ্কো জোর গলায় বলে উঠল—সেনাপতি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। হ্যারি জোরে বলে উঠল—শাঙ্কো—শান্ত হও। মাথা গরম করো না।

সবাই ভেতরে ঢোকার পর হ্যারি ঢুকল। একটা চত্বরমত পার হয়ে সারি সারি ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সম্মুখে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরটি ছেড়ে তৃতীয় ঘরটার সামনে এল সবাই। দলপতি দাঁড়াতে হুকুম দিল। ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রহরী চাবি দিয়ে দরজা খুলল। বেশ শব্দ করে দরজাটা খুলল। ভাইকিংরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরটা বেশ বড়। কাঠ পাথর আর ঘাস দিয়ে তৈরি ছাতের কাছাকাছি দুদিকে দুটো জানালা। জানালা দুটোতে গরাদ নেই। মেঝেয় একটা মোটা কাপড় পাতা। কাপড়টায় সুতোর কাজ করা। দুদিকের দুটো পাথুরে দেয়ালে দুটো আংটায় লাগানো আছে দুটো মশাল। তার একটা এই

দিনের বেলাতেও জ্বলছে।

মেঝেয় শুয়ে ছিল তিনজন বন্দী। হ্যারিদের দেখে দুজন উঠে বসল। হ্যারিরা ততক্ষণে বসে পড়েছে। পুরোনো বন্দীদের একজন বলল—তোমরা কারা? দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা বিদেশি।

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো। আমরা ভাইকিং, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। কথাটা বলে হ্যারি মোটা কাপড়টায় শুয়ে পড়ল, মাথার পেছনে দুহাতের তেলো রাখল। তারপর চোখ বুঁজল। অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস এখনও মুক্তি পেল না। পালাতেও পারল না। রাজকুমারী রইলেন সেনাপতির জাহাজে। ওরা নিজেরা এখানে বন্দী হয়ে রইল। এটা অপ্রত্যাশিত। এখান থেকে মুক্তি পাবো কবে। হয় তো এখানেই সবাই এক এক করে মরবো। ফ্রান্সিস, রাজকুমারীর সঙ্গে হয়তো আর দেখাই হবে না।

হ্যারি চোখ খুলল। তাকিয়ে রইল ছাতের দিকে। কাঠ পাথর আর শুকনো লম্বা লম্বা ঘাসে তৈরি ছাতটা। তারপর তাকালো জানালা দুটোর দিকে। জানালা পর্যন্ত উঠতে পারলে গরাদহীন জানালা দিয়ে পালানো সম্ভব। সেটা কীভাবে সম্ভব?

শাঙ্কো এসে হ্যারির কাছে বসল। ওপরের দুটো খোঁদল দেখিয়ে বলল—হ্যারি যদি ঐ খোঁদলটার কাছে কোনরকমে পৌঁছানো যায় তবে আমরা মুক্ত হতে পারবো। হ্যারি খোঁদল দুটো ভালো করে দেখল মেঝে থেকে খোঁদল দুটোর উচ্চতা হিসেব করল। বলল—হ্যাঁ এটা সম্ভব। কিন্তু অত উঁচুতে পৌঁছোতে পারলে তবে তো।

—হুঁ—অত উঁচুতে পৌঁছোনোটাই আসল সমস্যা। শাঙ্কো বলল।

—আগে সেটাই ভাবো। হ্যারি বলল।

—হুঁ ভাবছি। শাঙ্কো থামল। তারপর বলল—হ্যারি, প্রথমেই চাই একগাছা দড়ি।

—এখানে দড়ি পাবে কি করে? হ্যারি বলল।

—পাবো। শোন হ্যারি—আমরা নিজেদের মধ্যে মারপিট শুরু করব। গোলমাল থামাতে প্রহরীরা নিশ্চই ঘরের মধ্যে ঢুকবে। আমরা তবু মারপিট চালিয়ে যাবো। প্রহরী থামাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা থামবো না। ওরা দলপতিকে খবর দেবে। দলপতি আসবে। জানতে চাইবে এরকম মারামারির কারণ কী? তুমি দলপতিকে বলবে এরা সবাই গুণ্ডা খুনে। সবাইকে দড়ি দিয়ে বাঁধুন। আবার মারপিট শুরু করবে। দলপতি প্রহরীদের দড়ি এনে বাঁধতে বলবে। প্রহরী দড়ি কেটে ছোট করে হাত বাঁধবে। এইবার হল বুদ্ধির খেলা। তুমি প্রহরীদের বলবে বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা দড়ি ঢুকিয়ে দাও। সবাই একসঙ্গে বন্দী হয়ে থাকবে। আর মারপিট করতে পারবে না। ঐ দড়ির সঙ্গে একটা পাথরের টুকরো বেঁধে কড়িকাঠের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দড়ি নিয়ে আসবো। এবার দড়ি বেয়ে উঠে ঐ খোঁদল দিয়ে বাইরে যাওয়া আর পালানো। হ্যারি

শাঙ্কোর পরিকল্পনা ভেবে দেখল। হাসল। বলল—সাবাস শাঙ্কো। তুমি ফ্রান্সিসের মতই সমস্যার সমাধান করতে শিখেছো। দেখ চেষ্টা করে।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল—ভাইসব—কাছে এসো। সবাই শাঙ্কোর কাছে এল।

আমি এখান থেকে পালাবার জন্যে একটা পরিকল্পনা করেছি। হ্যারিকে বলেছি। সেই পরিকল্পনা তোমাদের বলি। একমাত্র এই ভাবেই পালানো সম্ভব। শাঙ্কো থামল। তার পর হ্যারিকে যেমন বলেছিল তেমন করে চাপা গলায় সব বলে গেল। শাঙ্কোর কথা শেষ হলে ভাইকিং বন্ধুরা মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

শাঙ্কো বসল। বলল—হ্যারি, এবার সময়টা ঠিক করো। হ্যারি বলল—দিনে তো পারা যাবেই না। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর।

—আজকেই, বলল শাঙ্কো।

—বেশ আজকেই পালাবো। হ্যারি বলল।

দিন শেষ হল। রাতে হ্যারিদের খেতে দেওয়া হল। খাওয়া শেষ করে সবাই শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বাদে। শাঙ্কো তখনও ঐ পরিকল্পনাটা ভাবছে। সম্ভাব্য ঘটনাও ভাবছে। মোট কথা শাঙ্কো সবদিক ভেবে স্থির সঙ্কল্পে এল।

তখন বেশ রাত। হঠাৎ কয়েদঘরে হৈ চৈ শুরু হল। প্রথমেই শাঙ্কোরা রাজা অপর্তোর যে ক'জন সৈন্য বন্দী ছিল তাদের ওপর চড়াও হল। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা অবাক। শুরু হল ধাক্কাধাক্কি। ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যেও মারপিট শুরু করল।

তিনজন প্রহরী ছুটে এল। দরজার কাছে দাঁড়াল। মারামারি দেখল। গলা চড়িয়ে বলল প্রহরীরা—মারামারি থামাও নইলে আমি দলপতিকে খবর দিতে যাচ্ছি। হ্যারি চাপা গলায় বলল—চালাও। ভাইকিংরা চিৎকার করতে করতে পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল।

তিন প্রহরী সমস্যায় পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। একজন ছুটল দলপতির বাড়ির দিকে। মারামারি গোলমাল কিছুটা থামল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দলপতি এল। আবার চিৎকার চ্যাঁচামেচি জোরে শুরু হল। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল—এসব মারপিট এখানে চলবে না। থামো সব। কে কার কথা শোনে। হ্যারি বন্ধুদের কাছে এসে আস্তে বলে গেল—কয়েকজন মেঝেয় পড়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তিন জন ভাইকিং পর পর মেঝেয় পড়ে গেল। দলপতি প্রহরীদের দরজা খুলতে বলল। দরজা খোলা হল। দলপতি এগিয়ে গেল। চীৎকার করে বলে উঠল—এ সব গুণ্ডামি বন্ধ কর। নইলে চাবুকের মার খাবে।

মারামারি হৈহল্লা আরও বেড়ে গেল। হ্যারি দলপতির কাছে গেল। বলল—যদি আমার কথা শোনেন তো বলি।

—বলো। দলপতি বলল।

—এরা সবাই গুণ্ডা খুনে। এদের হাত বেঁধে দিন। তাহলে আর মারামারি করতে পারবে না।

—ঠিক আছে। তাই করছি। সেনাপতি বলল। তারপর প্রহরীদের ডাকল। প্রহরীরা দলপতির কাছে এগিয়ে গেল। দলপতি বলল—সব কটার হাত বাঁধ। যদি তার পরেও মারামারি করে সবকটাকে চাবুক মার। কেউ যেন বাদ না যায়।

দলপতি চলে গেল।

এবার হ্যারি প্রহরীদের বলল—শক্ত দড়ি এনে বাঁধো সবকটাকে।

দুজন প্রহরী দড়ি আনতে ছুটল। একটু পরে লম্বা দড়ি আনল। দড়ি দিয়ে হ্যারি ভাইকিং বন্দীদের দুহাত বাঁধতে লাগল। রাজা অপর্তোর বন্দী সৈন্যরাও বাদ গেল না। দড়ি বাঁধা হলে হ্যারির হাতও প্রহরীরা দড়ি দিয়ে বাঁধল। হ্যারি দেশীয় ভাষায় বলল—গণ্ডগোল কমাও। ভাইকিংরা চুপচাপ মেঝেয় পাতা কাপড়ে বসে পড়ল।

হ্যারি প্রহরীদের বলল—ভাই একটা কাজ কর। প্রত্যেক দড়ি বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা শক্ত দড়ি ঢুকিয়ে দাও। সবাই বাঁধা পড়ে যাবে। গণ্ডগোল কমবে।

প্রহরীরা তাই করল। এবার সব চুপ।

প্রহরীরা বেরিয়ে গেল। বাইরের বারান্দায় গিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

রাতের খাওয়া দাওয়া মিটল। প্রহরীরা এঁটো কাঠের বাসন গ্লাশ নিয়ে চলে গেল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। গলার ঢোলা ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকাল। ছোরাটা বের করল। তারপর সবাইর হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিল। রাত বেশি হতে লাগল। ভাইকিংরা সবাই চুপচাপ শুয়ে রইল।

গভীর রাত তখন। শাঙ্কো আবার উঠে বসল তারপর লম্বা দড়িটা একমাথা থেকে টেনে টেনে সবটা খুলে নিল। লম্বা দড়ির একটা মাথায় পাথরের টুকরো বাঁধল। তারপর দড়িটা দোলাতে লাগল। একবার বেশি করে দুলিয়ে নিয়ে পরের দিকে কড়িকাঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। মাথাটা কড়িকাঠের আর ছাদের মধ্যে দিয়ে দিয়ে পাথর বাঁধা মুখটা নিচে পড়ে গেল। শাঙ্কো দড়ির মুখটা এবার কোমরে বেঁধে নিল। বন্ধুরা দড়ির অন্য মুখটা টেনে ধরল। শাঙ্কো এবার দড়ি ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠে কড়িকাঠটা ধরল। তারপর ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে চলল খোঁদলটার দিকে। তখনই হঠাৎ কড়িকাঠের কাঠটায় মচ্ করে শব্দ হল। শাঙ্কো সাবধান হল। খুব আস্তে আস্তে ঝুলতে ঝুলতে খোঁদলটার কাছে এল। তারপর মাথাটা খোঁদলে ঢুকিয়ে দিয়ে পার হল। ওধারে গিয়ে এবার থামতে লাগল। ঘরে তখন কয়েকজন বন্ধু দড়িটা টেনে ধরে রাখল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। একবার দাঁড়িয়ে চারদিক দেখল। একটা মাঠমত জায়গা পরে পাথরের বাড়িঘর। কোন বাড়িঘরেই আলো নেই। শাঙ্কো কোমরের বাঁধা দড়ি খুলল।

এবার প্রথমে দড়ি ধরে উঠতে লাগল ভেন। বেশ কসরৎ করেই ভেন

খোঁদলে গিয়ে পৌঁছল। তারপর মাথা ঢুকিয়ে খোঁদলের বাইরে চলে এল। শাঙ্কো দড়িটা টেনে ধরে রইল। ভেন আস্তে আস্তে নেমে এল। ভেন তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। রাজা অপর্তোর বন্দী সৈন্যরা একে একে বেরিয়ে এল কয়েদঘর থেকে। একইভাবে সবাই কয়েদঘরের বাইরে চলে এল। শাঙ্কো বলল—জাহাজঘাটে যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে বুঝতে পারছি না।

—আমাদের দক্ষিণমুখে যেতে হবে। হ্যারি বলল। তারপর সেদিকে হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলো খুব বেশি উজ্জ্বল নয়। সেই অনুজ্জ্বল আলোতে হ্যারিরা এগিয়ে চলল। মিনিট দশ পনেরো হাঁটার পরই বাঁ দিকে দেখল বড় রাস্তা। চলেছে দক্ষিণমুখো। হ্যারি ঐ দিকেই চলল।

হ্যারিদের ভাগ্য ভালো। পথে কোন সৈন্যের সঙ্গে দেখা হল না। দেখা হলে ভাগ্যে ভোগান্তি ছিল।

হ্যারিরা যখন জনশূন্য পথ দিয়ে এসে জাহাজঘাটে পৌঁছল তখন পূব আকাশে লাল ছোপ ধরেছে। কিছু পরেই সূর্য উঠল।

হ্যারি যে ভয়টা পেয়েছিল তাই হল। জাহাজঘাটায় এসে ওরা দেখল ওদের জাহাজটা নেই। আট দশটা জাহাজ রয়েছে এই বন্দর শহরে। কিন্তু ওদের জাহাজটা নেই।

হ্যারিরা সমস্ত জাহাজঘাটা এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখল। কিন্তু কোথায় ওদের জাহাজ? হ্যারি জাহাজঘাটার পাথরের ঘাটে বসে পড়ল। বন্ধুরাও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইল কেউ কেউ বসল। হ্যারি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল—উপায় নেই। এখানেই একটা জাহাজ কিনতে হবে।

—কিন্তু বিক্রি করবে এমন জাহাজ কি এখানে পাওয়া যাবে? শাঙ্কো বলল।

—চেষ্টা তো করতে হবে। তারপর দেখা যাক। হ্যারি বলল। বন্ধুরাও এই প্রস্তাবে সম্মত হল। তখন হ্যারি শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো তোমার কাছে ক'টা সোনার চাকতি আছে বলো। শাঙ্কো একবার আড় চোখে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর ফেট্টি থেকে সোনার চাকতিগুলো বার করে গুনল। বলল—একশ চল্লিশটা স্বর্ণমুদ্রা আছে।

—দেখা যাক যারা বিক্রি করবে তারা কত চায়। হ্যারি বলল। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—সবাই দল বেঁধে বেরুলে সহজেই রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যদের চোখে পড়ে যাবো। তা ছাড়া এতক্ষণে পাহারাদাররা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমরা পালিয়েছি। কাজেই সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়। আমি আর শাঙ্কো একসঙ্গে থাকবো। জাহাজ কেনার জন্যে ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করবো। তারপর জাহাজ পাই বা না পাই সবাই এখানে আসবো। ঠিক এক ঘণ্টা পরে তোমরাও একে একে এই ঘাটে আসবে। একসঙ্গে নয়। এইভাবে দল বেঁধেও থাকবো না। তোমরা এলে শাঙ্কো তোমাদের কাছাকাছি এসে জাহাজ কেনা হয়েছে কিনা সেটা ফিস ফিস করে বলবে। না কেনা হলে এখন কী করবো সেটাও শাঙ্কো বলে দেবে।

সবাই ছড়িয়ে পড়ল। হ্যারি তীরে বাঁধা জাহাজগুলোয় উঠতে লাগল। বলতে

লাগল—জাহাজটা বিক্রি করবেন কিনা। জাহাজের ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বলল—না। অন্য জাহাজ দেখুন। প্রায় সব কটা জাহাজেই হ্যারি গেল। কিনতে চাইল। কেউ রাজি হল না।

একটা জায়গায় দেখল সমুদ্রের জল খাঁড়ির মত একটা জায়গায় ঢুকে গেছে। সেখানে জলে ভাসছে একটা ছোট জাহাজ।

—চলো শাঙ্কো—এই ছোট জাহাজটাও দেখা যাক। হ্যারি বলল।

দুজনে তীরে রাখা পাটাতনটা দিয়ে জাহাজে উঠল। তিনজন নাবিক ডেকটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছিল। ওদের একজনকে হ্যারি বলল—এই জাহাজের মালিকের সঙ্গে দেখা করবো।

—মালিক কে আমরা জানি না। আমাদের ক্যাপ্টেনই সব। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

হ্যারিরা কথা বলছে তখনই ক্যাপ্টেন ওদের দেখল। ক্যাপ্টেন কাছে এল। বেশ ভারি গলায় বলল—আপনাদের পরিচয়?

—আমরা ভাইকিং। দেশে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। হ্যারি বলল।

—ও। ক্যাপ্টেন চিবুকের কাঁচাপাকা দাড়ি চুলকে বলল—আপনারা এই দেশে এসেছেন কেন।

—অল্প কথায় তা বলা যাবে না আসার কারণ—আপনারা যদি এই জাহাজটা বিক্রি করেন আমরা কিনতে পারি। শাঙ্কো বলল।

—দেখুন—ক্যাপ্টেন বলল—এই জাহাজটা আমরা বিক্রি করবো। তারপর লিসবনে চলে যাবো। ক্যাপ্টেন বলল।

—তাহলে আপনারা বিক্রি করবেন? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। অনেক ভেবেই স্থির করেছি জাহাজটা বিক্রী করে দেব। ক্যাপ্টেন বলল।

—কটা সোনার চাকতি লাগবে? হ্যারি বলল।

—সেটা পরে বলছি। আগে জাহাজটা ঘুরে দেখুন। ক্যাপ্টেন বলল।

—ঠিক আছে। হ্যারি বলল।

হ্যারি শাঙ্কোকে নিয়ে জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখল। খুব দামি জাহাজ নয়। তবে মোটামুটি সব ব্যবস্থাই আছে। জাহাজের ডেক কেবিনঘর স্নানঘর খুবই নিকৃষ্টমানের। ভাইকিংদের ছেলেবেলা থেকেই দুটো জিনিস দেখে শেখে—এক সমুদ্র দুই জাহাজ নৌকো। ওদের অর্থ বেশি নেই। কাজেই উচ্চমানের জাহাজের দাম দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই ছোট জাহাজটা কেনার চেষ্টা করল। এসব ভেবে হ্যারি স্থির করল এই জাহাজটাই কিনবে।

দুজনে জাহাজ দেখে ক্যাপ্টেনের কাছে এল। ক্যাপ্টেন বলল—কেমন দেখলেন জাহাজটা?

—ভালো। এখন আসল কথা কত সোনার চাকতিতে বিক্রি করবেন? হ্যারি বলল।

—আপনারা কীসে দাম দেবেন? ক্যাপ্টেন বলল,

—আমাদের কাছে স্থানীয় মুদ্রা নেই। এই সোনার চাকতিগুলো আছে। কথাটা বলে শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো ফেট্টির ভাঁজ খুলে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করল। সোনার চাকতি দেখে ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো লোভে চিক্‌চিক্ করে উঠল।

—ঠিক আছে। দশটা চাকতি দেবেন। ক্যাপ্টেন বলল।

—অত পারবো না। আটটা সোনার চাকতি দেব। শাঙ্কো বলল।

—এত কমে কি হয়? ক্যাপ্টেন হেসে বলল।

—এর বেশি আমরা দিতে পারবো না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে—একটা সোনার চাকতি কম দিন। মানে—নটা সোনার চাকতি দিন। ক্যাপ্টেন বলল।

হ্যারি আর কথা বাড়াল না। শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো গুনে গুনে ন'টা সোনার চাকতি ক্যাপ্টেনকে দিল।

—আপনারা কবে এই জাহাজে আসবেন? ক্যাপ্টেন বলল।

—আমরা বলতে গেলে এসেই গেছি। হ্যারি বলল।

তার মানে? ক্যাপ্টেন বলল।

এখন আমরা এই জাহাজেই থাকবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। আমরা নেমে যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন বলল।

ক্যাপ্টেন ওর কেবিনঘরে ঢুকল। সব গুছিয়ে গাছিয়ে একটু পরেই বাক্স প্যাঁটরা হাতে বেরিয়ে এল। তিনজন নাবিককে ডাকল। প্রত্যেককে কিছু মুদ্রা দিল। তারপর পাটাতন দিয়ে নেমে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সদর রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল।

হ্যারি বলল—শাঙ্কো এবার বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসো। শাঙ্কো জাহাজঘাটের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে দেখল মাত্র কয়েকজন বন্ধু বসে আছে।

শাঙ্কো বন্ধুদের বলল—জাহাজ কেনা হয়ে গেছে। আঙ্গুল দিয়ে খাঁড়িমত জায়গাটা দেখাল। বলল—ওখানেই জাহাজটা দেখতে পাবেন। যে ক'জন এসেছিল তারা চলে গেল।

শাঙ্কো বসল। অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর পর ভাইকিং বন্ধুরা আসতে লাগল। শাঙ্কো তাদের জাহাজকেনার কথা জানাল। জাহাজটা কোথায় রয়েছে তাও আঙুল দিয়ে দেখাল। শাঙ্কো আরো বলল—একসঙ্গে যেও না। এক এক করে যাও।

শাঙ্কো হিসেব করে দেখল—আর দুজন বাকি। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই দু'জনও এল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল—একসঙ্গে না। ছাড়া ছাড়া এসো। শাঙ্কো জাহাজের দিকে চলল।

সব ভাইকিংরা জাহাজে এসে উঠল এক এক করে। হোক ছোট তবু জাহাজ দেখে সবাই খুশি। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজটায় বেশি খাবার জল নেই। আটা ময়দা চিনিও আনতে হবে। শাঙ্কো, আর একজনকে নিয়ে খাবার

জিনিসগুলো কিনে আনো। অন্য দুজন যাও, জলের পিপে নিয়ে যাও। জল ভরে আনো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন খাবার জল নিয়ে ফিরে এল। শাঙ্কোরা আটা ময়দা এসব কিনে আনল। সব মজুত করা হল। রাঁধুনি রান্না সারল। দুপুর নাগাদ সবাই খেল। খাওয়া শেষ হতে বিকেল হয়ে গেল।

সবাই কেবিনঘরে জাহাজের ডেক-এ শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে তখনই হঠাৎ দুজন রাজা ভিলিয়নের সৈন্য তীরে এসে দাঁড়াল। তারপর জাহাজের পাতা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠে এল। দু'জন সৈন্য জাহাজে উঠে আসছে তখনই হ্যারি নিজেদের দেশীয় ভাষায় বলে উঠল—জাহাজ ছাড়ো—পালাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিংরা জাহাজের পালগুলো খুলে দিল। পালগুলো বেগবান বাতাস পেয়ে ফুলে উঠল। সৈন্য দু'জন তরোয়াল খুলে এগিয়ে এল। চিৎকার করে বলল—তোমাদের দলনেতা কে? হ্যারি এগিয়ে এল।

—তুমিই দলনেতা? একজন সৈন্য বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—তোমরা আমাদের কয়েদঘরে বন্দী ছিলে? সৈন্যটি বলল।

—ঠিক মনে করতে পারছি না। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা কয়েদঘর থেকে ঘুলঘুলি দিয়ে পালিয়েছো। সৈন্যটি বলল।

শাঙ্কো গলা চড়িয়ে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল—নোঙর তোল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাবো। একজন সৈন্য বলল—কী? তোমরা পাহারাদারদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছো। তাই কিনা?

ততক্ষণে জাহাজটা তীরভূমি থেকে অনেকটা চলে এসেছে। একজন সৈন্য এতক্ষণে সেটা দেখতে পেয়ে বলে উঠল—জাহাজ থামাও। ভাইকিংরা কেউ কিছু বলল না। জাহাজ আরো দূরে চলে এল। হ্যারিরা চুপ। হঠাৎ সৈন্যটি হ্যারির সামনে এসে দাঁড়াল। হাতের খোলা তরোয়ালটা হ্যারির গলায় ঠেকিয়ে বলল—জাহাজ থামাও নইলে মরবে। শাঙ্কো বলে উঠল—ভাই—এদিকে এসো।

—কেন? হ্যারির গলা থেকে তরোয়াল না সরিয়ে বলল সৈন্যটি।

—একটা গোপন কথা আছে। শাঙ্কো বলল।

—ওখান থেকেই বলো। সৈন্যটি বলল।

—তা বলা যাবে না। জাহাজের এদিকটায় এসে দেখ। সৈন্যটি শাঙ্কোর কাছে এল। শাঙ্কো বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে সৈন্যটিকে ল্যাঙ মারল। সৈন্যটি পাক খেয়ে ডেক-এর ওপর গড়িয়ে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। শাঙ্কো দ্রুতহাতে তরোয়ালটা তুলে নিল। সৈন্যটি আস্তে আস্তে উঠে বসল। উঠে দাঁড়াল। অন্য সৈন্যটি এবার শাঙ্কোর দিকে খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল।

শাঙ্কো বলল—এখন আমার হাতেও তরোয়াল।

—বেশ তো। লড়াই হবে। সৈন্যটি আক্রমণোদ্যত হল। শাঙ্কো বলল—

—আক্রমণ করার আগেই তুমি খতম হয়ে যাবে। ভালো কথা বলছি শোন—জাহাজ এখনও তীরের কাছেই আছে। প্রাণে বাঁচতে চাও তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সাঁতরে তীরে গিয়ে ওঠো।

—না। আমরা লড়বো। সৈন্যটি বলল।

—তাহলে দেখো। লড়াই হোক। শাঙ্কো বলল।

সৈন্যটি তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। শাঙ্কো দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। তরোয়াল চালাল। সৈন্যটির ডান বাহু লম্বালম্বি কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। সৈন্যটি বসে পড়ল। কিন্তু হার মানল না। উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। শাঙ্কো এক লাফে এগিয়ে এসে ওর তরোয়ালে নিজের তরোয়াল দিয়ে এত জোরে ঘা মারল যে সৈন্যটির হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। শাঙ্কো এবার এসে সৈন্যটির পেট জড়িয়ে ধরল। তারপর ওকে এক ধাক্কায় রেলিঙের গায়ে ফেলল। তারপর কোমর ধরে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিল। সৈন্যটি কাটা হাত নিয়ে কোনরকমে সাঁতরে চলল জাহাজঘাটের দিকে। শাঙ্কো ঘুরে দাঁড়াল। অন্য সৈন্যটির দিকে তাকাল। সৈন্যটি তখন ভয়ে কাঁপছে। শাঙ্কো বলল—এবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সৈন্যটি আর কোনদিকে না তাকিয়ে রেলিঙ্ থেকে সোজা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজঘাটের দিকে সাঁতরে চলল দুজনেই।

হ্যারিদের জাহাজ চলল। ফ্রেজার জাহাজ চালাচ্ছিল। ওর মনের খুঁতখুঁতানি যায় না। এত ছোট জাহাজ চালিয়ে কোন আনন্দ নেই।

পরদিন দুপুর নাগাদ জাহাজ রাজা অপর্তোর রাজ্যের জাহাজঘাটের কাছে এল। দূর থেকে হ্যারিরা দেখল জাহাজঘাটে জোর লড়াই চলছে। হ্যারিরা দূর থেকেই অস্পষ্ট শুনতে পেল সৈন্যদের চীৎকার ধ্বনি হৈ হৈ। হ্যারি ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—আমরা বেশ দূরে থাকবো। এখানেই নোঙর ফেল। ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর ফেলা হল।

ওদিকে রাজা অপর্তোর সৈন্যদের আবাসে ফ্রান্সিসের একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল। ঘরটায় সৈন্যরা থাকে। তারা ফ্রান্সিসকে বলে—যুদ্ধ শেষ না হলে তোমার মুক্তির আশা নেই। তাই ফ্রান্সিসও দিন গোনে। কতদিন কেটেছে এখানে। ফ্রান্সিস সেই নকশা আর লেখার কাগজটা সাবধানে রাখে। সবসময় নকশার কাগজটা কোমরের ফেট্টির মধ্যে গুঁজে রাখে। দু-চারজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে আসে। ও নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে এইসব বলে। কিতান নামে একটা সৈন্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব ভাব হয়েছে। কিতানই ফ্রান্সিসকে সব খবর দেয়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই যে লড়াই হবে কিতান এ বিষয়ে নিশ্চিত।

কয়েকদিন পরে সকালবেলা। সমুদ্রতীরে ভেড়ানো জাহাজ থেকে রাজা অপর্তোর সৈন্যরা দেখল—দূর থেকে তিনটি জাহাজ আসছে। তারমধ্যে একটা সাধারণ জাহাজ। বাকি দুইটি যুদ্ধ জাহাজ। রাজার সৈন্যাবাসে সেই সংবাদ পৌঁছল। সেনাপতি ছুটে এল। বলল সবাই তৈরি হও। সেনানিবাসে সাজো

সাজো রব উঠল। সৈন্যরা তরোয়াল নিল। শিরস্ত্রাণ বর্ম পরে সৈন্যাবাস থেকে বেরিয়ে এসে সামনের বড় মাঠটায় একত্র হল। সার বেঁধে দাঁড়াল। সেনাপতি এল। সৈন্যরা সামনে দাঁড়াল। একটু পরেই রাজা অপর্তো এল। সেনাপতি চিৎকার করে বলল—

—আমাদের মহান রাজা অপর্তো এসেছেন। সবাই রাজার জয়ধ্বনি করো। সৈন্যরা চীৎকার করে ধ্বনি দিল—মহান রাজা অপর্তো দীর্ঘজীবী হোন।

এবার রাজা অপর্তো গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের বীর সৈন্যরা —নরুল্লার রাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। তোমরা শৌর্যে বীর্যে অন্য কোন দেশের চেয়ে কম নও। নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানকে পরাস্ত কর। ওদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। রাজা থামল। সৈন্যরা আবার ধ্বনি দিল—মহান রাজা অপর্তো দীর্ঘজীবী হোন।

রাজা অপর্তো দুজন অমাত্যর সঙ্গে চলে গেল। সেনাপতির নির্দেশে একদল সৈন্য তীরলগ্ন জাহাজে গিয়ে উঠল। সেই জাহাজ থেকে পরে অন্য জাহাজটায় উঠল। তখনই রাজা ভিলিয়ানের প্রথম জাহাজটা রাজা অপর্তোর জাহাজের গায়ে এসে লাগল। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা তৈরি হল। কিছু সৈন্য লাফিয়ে রাজা অপর্তোর জাহাজে উঠে এল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। চীৎকার আহতদের আর্তনাদ গোঙানিতে ভরে উঠল এলাকাটা।

জোর লড়াই শুরু হল। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা প্রথম ধাক্কায় হেরে গেল। আহত সৈন্যরা নিজেদের জাহাজে চলে গেল।

এবার রাজা অপর্তোর সেনাপতি সমুদ্রতীরের কাছে এসে চিৎকার করে হুকুম দিল—সবাই মাঠে নেমে এসো। এবার মাঠে লড়াই হবে।

রাজা অপর্তোর সৈন্যরা তাদের দুটো জাহাজ থেকেই পাতা পাটাতন দিয়ে সমুদ্রতীরে উঠে আসতে লাগল। উঠে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল।

রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা জাহাজ থেকে নেমে সেই মাঠে চলে এল। এবার লড়াই চলল বিস্তৃত প্রান্তরে।

ফ্রান্সিস যে ঘরে বন্দী ছিল সেই ঘরের সৈন্যরা সেনাপতির হুকুম শুনে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস একা। কিন্তু যে খবরটা দিয়ে চলে গেল সে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। সব সৈন্য বেরিয়ে গেলে ঘরটার দরজা তালা দিয়ে আটকে রেখে গেল।

ফ্রান্সিস চুপ করে বসেছিল। বুঝল এই সুযোগ। পালাবার এমন সুযোগ পরে নাও আসতে পারে।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। কান পাতল—রাজা অপর্তোর বক্তৃতা শুনল। বুঝল কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই শুরু হবে। ফ্রান্সিস বাইরে লাগানো তালাটা হাত বাড়িয়ে দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখল—তালাটা বেশ শক্ত তালা। তালা ভাঙা যাবে না। কড়াটা ভাঙতে হবে।

ফ্রান্সিস কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে ছুটে এসে তালাকড়ার জায়গাটায় লাথি মারল।

তালা ভাঙল না। কড়াও খুলল না। ফ্রান্সিস আবার লাথি মারল। তালা বা কড়া খুলল না। এবার ফ্রান্সিস গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় লাথি মেরে চলল।

হঠাৎ কড়া ভেঙে ছিটকে গেল। দরজা খুলে গেল।

ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ছুটে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই একজন রাঁধুনি এল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল—কী ব্যাপার? পালাচ্ছো নাকি?

—না—না। মরণপণ লড়াই করতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব ভালো কথা। রাঁধুনি চলে গেল।

এই সুযোগে বন্দীদশা থেকে তো পালাতে পারল। কিন্তু খাব কী? ফ্রান্সিস পায়ে পায়ে রসুই ঘরে এল। দেখল থরে থরে সাজানো সুস্বাদু গোল রুটি। ঘরে কোনো রাঁধুনি নেই। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে চারটে রুটি ঢোলা জামার গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। রুটিগুলো পেটের কাছে গিয়ে ফেট্টিতে আটকে রইল।

এবার ফ্রান্সিস্ এক ছুটে সৈন্যাবাসের বাইরে এল। একটা মোটা ওকগাছের পেছনে দাঁড়াল। গাছের আড়াল থেকে দেখল জাহাজগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যদের সঙ্গে রাজা অপর্তোর সৈন্যদের । সমস্ত এলাকা জুড়ে চলেছে মরণোন্মুখ সৈন্যদের আর্ত চিৎকার গোঙানি। দু'দলেরই সৈন্যরা চিৎকার করছে। তরোয়াল চালিয়ে উভয়পক্ষের সৈন্যরা লড়াই করতে লাগল। ফ্রান্সিসেরও ইচ্ছে হল একটা তরোয়াল পেলে লড়াইতে নামা যেত। কিন্তু কার হয়ে লড়বো —কথাটা ভেবে ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল।

ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। সমুদ্রের দিক থেকে জোর বাতাস ছুটছে। ধুলো বালি উড়ছে। ফ্রান্সিস চোখ কুঁচকে ছুটল।

সমুদ্রতীরে পৌঁছল। বালির ওপর বসল। দূর থেকে দেখল জাহাজঘাটে তখনও লড়াই চলছে। ও সমুদ্রের দিকে তাকাল। দেখল সবকটা জাহাজই সমুদ্রতীরে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস দূরে তাকাল। নাঃ, ওদের জাহাজটা নেই। অনেক দূরে ছোট্ট একটা জাহাজ আবছা দেখল। কিন্তু সেটা ওদের জাহাজ নয়।

জাহাজঘাটায় জাহাজগুলো পালা করে দেখতে গিয়ে ওদের জাহাজটা দেখল। ওদের জাহাজ লড়াইয়ে কেন? ফ্রান্সিস কিছুই বুঝতে পারল না। হ্যারিরা বোকার মত লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে।

কী করবে ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারিরা খুব বোকার মত কাজ করেছে। অথবা এও হতে পারে রাজা অপর্তোই ওদের বাধ্য করেছে লড়াইয়ে নামার জন্যে। ওরা মারিয়াকেই বা কোথায় রেখেছে। ওরা সবাই কি আমাদের জাহাজেই আছে? এরকম নানা চিন্তা ফ্রান্সিসের মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

ফ্রান্সিস সমুদ্রের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল। দূরের জাহাজটা যুদ্ধ জাহাজ নয়। ঐ ছোট্ট জাহাজে যারা রয়েছে তারা যুদ্ধে যোগ দেয় নি। কে জানে ওটা কাদের জাহাজ? ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল—এখন আমার প্রধান কর্তব্য মারিয়া আর বন্ধুদের সন্ধান করা। ওরা কোথায় থাকতে পারে। ভেবে

পাচ্ছিনা—ওরা কি যুদ্ধে কারো পক্ষ নিয়েছিল? আমাদের জাহাজটা তীরে ভেড়ানো আছে। হয়তো ওরা আমাদের জাহাজেই রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের এই ডামাডোলে নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজটাকেও কাজে লাগানো হয়েছে। তাহলে হয়তো মারিয়াকে বন্ধুদের জাহাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো ওদের তীরভূমির কোথাও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ওদের জাহাজে না যেতে পারলে কিছুই বোঝা যাবে না।

বিকেলের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে চিৎকার হৈ হৈ শোনা গেল না। তার মানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন কারা জয়লাভ করল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বিকেলের দিকেই বোঝা গেল। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যদের বন্দী করা হতে লাগল। ওরই মধ্যে এবার রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা একটা জাহাজে উঠে জাহাজ ছেড়ে দিল। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা বাধা দেবার আগেই জাহাজটা বেশ দূরে ভেসে গেল। জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হল। জাহাজ বেশ গতি পেল। বোধহয় ওরা দাঁড়ও বাইছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ গভীর সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছল। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা আর ওদের তাড়া করল না।

রাজা অপর্তোর সৈন্যরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে মেতে উঠল। খাওয়া দাওয়া হৈ হৈ চলল সৈন্যদের মধ্যে।

একটু রাত হতেই হৈ হৈ থেমে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র যেন শুনশান। নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার একটানা শব্দ।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বুকের কাছে জামার ভেতর থেকে একটা গোল করে কাটা রুটিটা বের করল। বসল। রুটি খেতে খেতে ভাবতে লাগল ও কী করবে এখন? প্রথমে আমাদের জাহাজে তো যাই, দেখি কিছু হদিশ পাই কিনা—মারিয়ার বন্ধুদের।

আজ গভীর রাত। রুটির শেষ টুকরোটা চিবুতে চিবুতে ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে নামল। গলা পর্যন্ত জলে এসে নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে লাগল। আকাশের চাঁদ অনুজ্জ্বল। তবু কিছুদূর পর্যন্ত সব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস সাঁতরে চলল জাহাজ ঘাটের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজঘাটের কাছে এলে জাহাজগুলো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস জলে শব্দ না করে ওদের জাহাজের কাছে এলো। হালটা ধরল। হাঁপাচ্ছিল। একটু থেমে দম নিল।

হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে জাহাজে উঠল। কিন্তু প্রথমেই ডেক-এ নামল না। হালের আড়াল থেকে ডেক-এর দিকে তাকাল। দেখল ডেক-এ দুজন সৈন্য শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস নিঃশব্দে ওদের কাছে এল। দেখল—দুজনই মারাত্মক আহত। জায়গাটায় শুকনো রক্ত ছড়িয়ে আছে। সৈন্যদের পোশাক দেখে বুঝল এরা নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের সৈন্য।

ফ্রান্সিস আস্তে সরে এল। সিঁড়িঘরের কাছে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এল। প্রথম কেবিনঘরটা দেখল। আস্তে দরজা খুলল। কেউ নেই। পরেরটাতেও কেউ নেই। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। তাহলে তো এই জাহাজে

বন্ধুরা কেউ নেই।

এবার নিজের কেবিনঘরের সামনে এল। দরজা বন্ধ। ফ্রান্সিস আশান্বিত হল। তাহলে মারিয়া নিশ্চয়ই এই ঘরে আছে। ফ্রান্সিস দরজা টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার গলা শুনল—কে? ফ্রান্সিস কিছু বলল না। এতক্ষণে যেন সহজে শ্বাস নিতে পারছে। দরজাটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অল্পক্ষণ। আবার মারিয়ার কিছুটা ভীত কণ্ঠস্বর—কে ওখানে? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমি ফ্রান্সিস।

মারিয়া চমকে উঠল। বলল—

—ত্—তুমি? মারিয়া ছুটে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ বুঁজল। দুই গালে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ঘরের মৃদু আলোয় দেখল সেটা। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাঁধে হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল—কেঁদোনা। এই তো আমি এসেছি।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার মাথার চুল উস্কোখুস্কো চোখমুখ শুকনো। মারিয়ার শরীরের এই অবস্থা দেখে ফ্রান্সিসের মন যেন কেঁদে উঠল। মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া তোমাকে এইসব দুঃসাহসিক কাজে না আনলেই বোধহয় ভালো হত। মারিয়া ম্লান হাসল। বলল—আমিই তো জোর করে তোমার সঙ্গে এসেছি। তোমার কোন দোষ নেই।

—তবু। মন মানে না। ফ্রান্সিস বলল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—এবার কাজের কথা বলো। হ্যারিরা কোথায়?

মারিয়া আস্তে আস্তে সব বলল। সবশেষে বলল হ্যারিরা আমাদের এই জাহাজ নিয়ে নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের রাজাধানী ভিগো গিয়েছিল। আমাকে এখানেই সেনাপতির জাহাজে রেখে গিয়েছিল। তারপর আমি আর কিছুই জানি না।

—ওরা বেঁচে আছে তো? ফ্রান্সিস কতকটা আপনমনেই বলল।

—না—না। বেঁচে আছে বৈকি। তুমি এই নিয়ে ভেবোনা। মারিয়া বলল।

—মারিয়া খাবার দাবার কিছু আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি প্রতিদিনই বেশি করে রাঁধছি। আশা যদি তুমি আসো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। খেতে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—

—ভেজা পোশাক ছাড়ো। আমি আসছি।

ভেজা পোশাকে এতক্ষণে শরীরটা শির্ শির্ করতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টাল। শুকনো পোশাক পরে শির্ শির ভাবটা কেটে গেল।

মারিয়া চিনে মাটির থালায় রুটি মাংসের ঝোল নিয়ে এল। তারপর কাঠের

গ্লাশে জল দিল। ফ্রান্সিস গ্লাশটা নিয়ে সবটুকু জল খেয়ে ফেলল। মারিয়া আরও এক গ্লাশ জল দিল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে খেতে লাগল। খাচ্ছে আর ভাবছে হ্যারিদের কথা। কোথায় আছে ওরা?

—এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—সেটাই তো ভাবনা। ওরা জাহাজে চড়ে রাজা ভিলিয়ানের রাজ্যে গিয়েছিল। তুমি তো এইটুকুই জানো।

—হ্যাঁ। কিন্তু —মারিয়া লাফিয়ে উঠল—মনে পড়েছে আমাদের জাহাজটা কদিন পরেই ফিরে এসেছিল এখানে।

—হ্যারিরা সেই জাহাজে ফেরে নি—এই তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তুমি কী করে বুঝলে? মারিয়া বলল।

—এইসব সেনাপতি-টতি অনেক দেখেছি। নিজেদের ভীষণ ক্ষমতাধর প্রমাণের জন্যে সব করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—রাজা ভিলিয়ানের রাজ্যের ভিগো নগরে যাবো। ফ্রাসিস বলল।

—সেকি! এই জাহাজ চালিয়ে যাবো মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা দুজন? মারিয়া বলল।

—না—আমরা চারজন। ফ্রান্সিস বলল।

—আর দুজন কোত্থেকে পাবে? মারিয়া জানতে চাইল।

—ওপরের ডেক-এ দুজন রাজা ভিলিয়ানের সৈন্য আহত অবস্থায় রয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তারা কি আমাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারবে? মারিয়া বলল।

—দু-একদিনের মধ্যে যতটা সাহায্য পাবো ততটাই নেবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কী করবো? মারিয়া বলল।

—রান্না করবে খেতে দেবে। আর সেলাই ফোঁড়াই করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না, প্রয়োজনে আমি তরোয়াল নিয়ে লড়াই করবো। মারিয়া বলল।

—দোহাই—লড়াইর ময়দানে তোমাকে আমি দেখতে চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি প্রায় প্রতিদিন তরোয়াল চালানো অভ্যেস করি। মারিয়া বলল।

—শিখেছো কার কাছে? ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো। মারিয়া বলল।

—শাঙ্কোটা তোমার মাথাটি খেয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিই শাঙ্কোকে বলেছি শেখাতে। মারিয়া বলল।

—ও প্রথমে আপত্তি করেছিল। আমি শুনি নি। ও তোমার কথাও বলেছিল। আমি বলেছি তোমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমিই তোমাকে বোঝাবো।

মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে বাবা,। তুমি তরোয়াল চালানো শেখ, লড়াই করো। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে আমি ত লড়তে পারবো। মারিয়া বলল।

—তা পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—ঐ আহত দুজন সৈন্যকে কে খেতে দেয়?

—আমিই খেতে দিই। তবে ওষুধ তো আর পড়ছে না। জানি না—কী করে শরীরের কাটাগুলো সারবে। মারিয়া বলল।

—ভেন থাকলে চিকিৎসা হত। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস। এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—রাজা ভিলিয়ানের রাজ্য ভিগোতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া চোখ বড় বড় করে বলল—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই ক'জন আমরা এত বড় একটা জাহাজ চালিয়ে ভিগো নগরে যেতে পারবো?

—পারবো। জাহাজের পালগুলো খাটিয়ে দেব। সবকটা পাল। জোর বাতাস পেলে জাহাজ দ্রুত চলবে। আমাদের কিছুই করার থাকবে না। জাহাজ আপনি চলবে। শুধু হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিকটা ঠিক রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া কী বলতে গেল। ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—ডেক-এ কাদের চলাফেরার শব্দ শুনছি। মারিয়া কান পাতল—হ্যাঁ জুতোর শব্দ।

হঠাৎ কার কান্না আর্তনাদ শোনা গেল। সেই সঙ্গে উচ্চ হাসি। তারপরে আরেকজনের গোঙানি শোনা গেল। সমুদ্রে কিছু পড়ার শব্দ শুনল ফ্রান্সিস। আবার হাসি শোনা গেল।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—আহত সৈন্য দুজনকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল। মারিয়া দু'হাতে বুক চেপে ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কেঁদো না। আমি যদি —মারিয়া ফ্রান্সিসের হাত চেপে ধরল—না—না। ওরা কতজন আছে ক জানে।

—যতজনই থাক আমি সবকটাকে নিকেশ করবে। মারাত্মকভাবে আহত দুই সৈন্যকে জলে ছুঁড়ে ফেলা। কী নির্মম।

—না—না। যেও না। মারিয়া গলা চেপে বলল।

—না মারিয়া। আমি যাবোই। দরকার একটা তরোয়াল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। মারিয়া বুঝল ফ্রান্সিসকে আটকানো যাবে না। ফ্রান্সিস চলল ওদের অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘরের দরজা খোলা। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে অন্ধকারে দেখেই বুঝল—খুব বেশি অস্ত্র নেই। ওরই মধ্যে বেছে নিল একটা তরোয়াল। তুলে আনল। চলল ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠল। সিঁড়ির শেষে সিঁড়িঘরে উঠে

দাঁড়াল। দেখল যুদ্ধজয়ী রাজা অপর্তোর দুজন সৈন্য ডেক-এ বসে আছে। হাত খালি। তরোয়াল কোমরবন্ধে খাপে রাখা।

ফ্রান্সিসকে দেখেই দুজন সৈন্য লাফিয়ে উঠল। তরোয়াল কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—আহত সৈন্য দুজন কোথায়?

—জলে ফেলে দিয়েছি। একজন কথাটা বলে হেসে উঠল। অন্যজন বলল, আমাদের আর লড়াইও করতে হয়নি হত্যা করতেও হয়নি।

—সোজা পথে ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল। দুজনেই জোরে হেসে উঠল।

—এবার আমার সঙ্গেও যে ঝামেলা মেটাতে হয়। ফ্রান্সিস খাপ থেকে তরোয়াল খুলল।

—তুমি কি আমাদের সঙ্গে লড়বে? একজন সৈন্য বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে গেল। একজন সৈন্য তরোয়াল তুলে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এক পা সরিয়ে নিল। তারপর দ্রুত তরোয়াল চালাল। সৈন্যটি কোন রকমে সেই মার ঠেকালো। সৈন্যটি এবার ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে গেল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যটির হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। ও ডেক-এ বসে পড়ল। মুখ হাঁ করে হাসতে লাগল। ফ্রান্সিস ঐ অবস্থাতেই তরোয়াল চালাল। সৈন্যটির গলায় লাগল তরোয়ালের কোপ। সৈন্যটি উপুড় হয়ে ডেক-এর ওপরে পড়ে গেল। আর উঠে দাঁড়াতে পারল না।

ফ্রান্সিস এবার অন্য সৈন্যটির দিকে তাকাল। ক্রুদ্ধস্বরে বলল—পারবে আমার সঙ্গে লড়ে। সৈন্যটি ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা দু'জন সৈন্যকে আহত দেখেও জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমার হাতে একজন মারা যায়। তুমিও রেহাই পাবে না। সৈন্যটি তরোয়াল ডেক-এর ওপর ফেলে দিয়ে সিঁড়িঘরের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস ওর চেয়ে দ্রুত দৌড়ে এসে সৈন্যটির সামনে এসে দাঁড়াল। মৃত্যুভয়ে সৈন্যটির তখন মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—আমি নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করি না। তুমি যাও তরোয়াল হাতে নাও। সৈন্যটি আস্তে আস্তে গিয়ে তরোয়াল তুলে হাতে নিল। ফ্রান্সিস সৈন্যটির সামনে এল। বলল—এবার আমার সঙ্গে লড়ো।

ফ্রান্সিস তরোয়াল তুলে এগিয়ে এল। তরোয়াল চালাল। সৈন্যটি মার ঠেকাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যটির দম ফুরিয়ে গেল। ও কোনরকমে ফ্রান্সিসের মার ঠেকাতে লাগল। ফ্রান্সিস প্রচণ্ড জোরে তরোয়াল চালাল। সৈন্যটি যে মার ঠেকাতে পারল না। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ও চিৎ হয়ে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মারাত্মক আহত দুজন সৈন্যকে দেখে তোমাদের মায়া হল না। বিনা দোষে ওদের জলে ছুঁড়ে ফেললে। ঠিক ঐভাবে আমিও তোমাদের দুজনকে

জলে ছুঁড়ে ফেলবো।

কথাটা বলে ফ্রান্সিস সৈন্যটির বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। সৈন্যটি মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। ফ্রান্সিস তরোয়াল বের করে নিয়ে কোমরে গুঁজল। তারপর সৈন্যটিকে কাঁধে তুলে নিল। সৈন্যটি অনুনয় করতে লাগল—জলে ফেলো না। জলে ফেলো না। ফ্রান্সিস সে কথা শুনল না। রেলিঙে উঠিয়ে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল। তারপর অন্য আহত সৈন্যটিকে একই ভাবে জলে ফেলে দিল।

ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়িঘরের দিকে চলল। দেখল মারিয়া সিঁড়িঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া সবই দেখেছে। কিন্তু কিছুই বলল না।

কেবিন ঘরে এল। মারিয়াও এল। বলল—এখন কী করবে?

—এখানে থাকা চলবে না। তুমি নোঙরটা তোলো। পারবে তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—তাহলে যাও। আমি পালগুলো খুলে দিচ্ছি। এখন যে জোরে বাতাস বইছে পাল ভালো হাওয়া পাবে। যাও।

মারিয়া নোঙরের কাছে এল। তারপর নোঙরের কাছি ধরে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। নোঙরটা উঠে আসতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারিয়া নোঙর তুলে ফেলল। হাঁপাতে লাগল।

ডেক-এ এসে দেখল ফ্রান্সিস এর মধ্যেই সব পাল খুলে দিয়েছে। বাতাসের তোড়ে পালগুলো ফুলে গেছে। জাহাজও গতি পেয়েছে। বেশ জোরেই চলছে।

ফ্রান্সিস গোল হুইল-এর কাছে এল। হুইল ঘোরাতে লাগল। জাহাজ চলল।

মারিয়া চলল রসুইঘরের দিকে। রান্না বসাল।

ফ্রান্সিস দিক ঠিক করে হুইলটা একটা কড়ার সঙ্গে আটকাল। তারপর ডেক-এ শুয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকাল। ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে সাদা মেঘ উড়ে আসছে। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজল। এখন আকাশ দেখার সময় নয়। বন্ধুদের যে কোথায় খুঁজবে বুঝে উঠতে পারছে না। তাই মাথায় চিন্তা।

রাজা ভিলিয়ানের সেনাপতি নিশ্চয়ই হ্যারিদের ভিগোতে বন্দী করে রেখেছিল। তা না হলে ওদের ফিরিয়ে আনল না কেন? হ্যারিরা বন্দী হয়ে ছিল। নিশ্চয়ই পালাতে পারে নি। তাহলে তো ভিগো নগরে গিয়ে কয়েদ খানায় খোঁজ করতে হয়। যদি সেখানে হ্যারি শাঙ্কোদের না পাই তাহলে বুঝবে যে ওরা অন্য কোথাও আছে।

মারিয়া এল। বলল—খাবে এসো। ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল জাহাজ বেশ দ্রুত গতিতেই চলেছে। হুইলের সঙ্গে কড়াটায় আটকানো। হাত দিয়ে দেখল ভালোভাবেই আটকানো আছে। ফ্রান্সিস সিঁড়িঘরের দিকে চলল। একবার সমুদ্রের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেক দূরে একটা ছোট্ট জাহাজ। যুদ্ধের সময় আমি কি ঐ জাহাজটাই দেখেছিলাম? এখন জাহাজটা আবার দেখা যাচ্ছে। ঐ জাহাজটা কি আমাদের জাহাজকেই অনুসরণ করছে?

কিন্তু বিনা কারণে আমাদের অনুসরণ করবে কেন? ফ্রান্সিস এবার সবদিকেই তাকিয়ে নিল। না আর কোন জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

খেতে বসে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

—কী ব্যাপার? মারিয়া বলল।

—ডেক-এ উঠে দেখে এসো একটা ছোট্ট জাহাজ আমাদের অনুসরণ করছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী যে বলো। ছোট্ট জাহাজটা আমাদের অনুসরণ করবে কেন? মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কারণ? মারিয়া বলল।

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি তো। মারিয়া বলল।

মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। চারদিকে তাকাল। দূরে দেখল—একটা ছোট্ট জাহাজ আসছে। এখান থেকে অবশ্য জাহাজের লোকজন দেখা যাচ্ছে না। শুধু ছোট্ট জাহাজটাই দেখা যাচ্ছে। জাহাজটায় কোন নিশানও উড়ছে না। কে জানে কোন দেশের জাহাজ।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ছোট্ট জাহাজটা দেখলাম। লোকজন দেখা গেল না। মনে হয় আমাদের অনুসরণ করছে। দূরত্বটা বেশ বেশি। কাছে গেলে অবশ্য ডেক-এ কারা আছে বোঝা যেত।

ওদিকে ভিগো নগরের জাহাজঘাট থেকে হ্যারিদের নতুন কেনা জাহাজটা ছাড়ল। চলল রাজা অপর্তোর দেশের দিকে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিশ্চয়ই ওখানে পাওয়া যাবে। এই জাহাজের ছোট্ট মাস্তুলটার মাথায় নজরদারির জন্যে কোন আসন রাখা নেই। নজরদার পেড্রোর মন খারাপ। ও মাস্তুলের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর নজরদারির কাজ করতে লাগল।

হ্যারিদের জাহাজ চলেছে। ছোট্ট জাহাজ। হুইলটাও ছোট। ফ্রেজারেরও মন খারাপ। এই ছোট্ট জাহাজ চালিয়ে যাওয়া। ফ্রেজারের মনে পড়ল ওদের বড় জাহাজটার কথা।

হ্যারিদের জাহাজ চলেছে। ভাইকিং বন্ধুদের মন খারাপ। এখনও ফ্রান্সিস রাজকুমারীর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

একদিন পরে হ্যারিদের জাহাজ রাজা অপর্তোর রাজ্যের বন্দরের কাছে পৌঁছল। হ্যারি ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—অনেক দূরে জাহাজ থামাও।

ফ্রেজার বেশ দূরে জাহাজ থামাল।

ভাইকিংরা জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। হ্যারিরা দেখল রাজা ভিলিয়ান আর রাজা অপর্তোর সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেছে। জাহাজগুলোর ডেক-এ দুপক্ষের সৈন্যদের লড়াই চলছে। উভয়পক্ষের সৈন্যদের চিৎকার রণধ্বনি

আর্তনাদ এত দূরেও শোনা যেতে লাগল।

ঐ জাহাজগুলোর মধ্যেই রয়েছে হ্যারিদের জাহাজ। সেই জাহাজেও এতক্ষণ লড়াই চলেছিল। এখন লড়াই ছড়িয়ে গেল জাহাজের বাইরে—সবুজ ঘাসের প্রান্তরে।

হ্যারি ভেবে পাচ্ছে না এখন কী করবে। একটা কথা বুঝল যে এখন এই যুদ্ধের ডামাডোলে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করা যাবে না। এখন শুধু অপেক্ষা করা।

পরদিন শাঙ্কোরা বুঝতে পারল যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সৈন্যদের পোশাক দেখে হ্যারি বুঝল রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা হেরে গেছে। ঐ সৈন্যদের প্রান্তরে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো হল। হাতে দড়ি বাঁধা হল। তার আগে রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা অনেকে পালিয়ে গেল। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে পালিয়ে গেল।

হ্যারি নজরদার পেড্রোকে বলল—ভাল করে নজর রাখবে চারদিকে। বিশেষ করে ঐ ঘাটে আমাদের জাহাজটা নোঙর করে আছে। আর দু' একটা দিন যাক। তারপর আমাদের জাহাজটা নিয়ে পালাবো।

পরদিন কাটল। রাত হল। চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। পেড্রো হঠাৎ দেখল ওদের জাহাজটা ঘাট থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। পেড্রো সঙ্গে সঙ্গে ছুটল হ্যারির কাছে। হ্যারির কেবিনঘর খোলা ছিল।

পেড্রো হ্যারির বিছানার কাছে চলে এল। ডাকল—হ্যারি—হ্যারি। হ্যারি চোখ খুলে উঠে বসল—কী ব্যাপার?

—আমাদের জাহাজটা তীরের কাছে ছিল। পেড্রো বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—জাহাজটা তীর থেকে বেশ দূরে আস্তে আস্তে ভেসে আসছে। পেড্রো বলল।

—তার মানে জাহাজে চড়ে সৈন্যটি পালাচ্ছে। হ্যারি বলল।

—তা হতে পারে। তুমি চলো। পেড্রো বলল।

—যাবো তো বটেই। আমরা ঐ জাহাজটার পিছু ছাড়বো না। চলো। হ্যারি বলল।

দুজনে ডেক-এ উঠে এল। একটু আবছা দেখা যাচ্ছে, জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হয়েছে। বেশ জোরে জাহাজ চলেছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে।

—পেড্রো—শিগগির যাও। শাঙ্কো বিস্কোদের ডাকো। আমরা এক্ষুনি জাহাজ ছাড়বো।

পেড্রো ছুটে চলল সিঁড়িঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো বিস্কো আর কিছু বন্ধু ডেক-এ উঠে এল।

হ্যারি আঙুলে দিয়ে দূরের চলন্ত জাহাজটা দেখাল।

হ্যারি বলল—আমাদের জাহাজটা কে বা কারা উত্তর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

—কী করবে এখন? শাঙ্কো বলল।

—জাহাজটাকে দূর থেকে অনুসরণ করব, হ্যারি বলল।

—তাহলে তো এখুনি আমাদের জাহাজ ছাড়তে হয়। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বিস্কো তোমরা এক্ষুনি জাহাজ ছাড়ো। সব পাল খুলে দাও। যত দ্রুত বেগে সম্ভব জাহাজ চালাও। ঐ জাহাজকে অনুসরণ করো—দূর থেকে।

ওদিকে সেদিন বিকেলে ফ্রান্সিস বলল—আজই চলো কয়েদখানায় যাবো। বন্ধুদের খোঁজ করবো। দেরি করবো না। দুজনেই এই দেশীয় পোশাক পরবো।

কিছু পরে তীরে নামল। রাস্তায় বেশ ভিড়। দোকানপাটে বেশ ভিড়। কেনাকাটা চলছে। মারিয়ার মন খুশিতে ভরে উঠল।

ফ্রান্সিস এসব দেখছে না। হ্যারি শাঙ্কোদের দেখা না হওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে ওরা কয়েদঘরের সামনে এল। দেখল ছোট সদর দরজায় তিনজন কারারক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। একজন কারারক্ষীকে বলল—এই কয়েদখানার যিনি অধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলবো। কারারক্ষী বলল—দাঁড়ান—আমি খবর দিয়ে আসছি।

—বলবেন যে একজন ভাইকিং কথা বলবেন।

—ঠিক আছে। কারারক্ষী চলে গেল।

—মারিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ফ্রান্সিস আমরা ভাইকিং, দেখা করতে এসেছি এটা বললে কেন?

—এটা তো বলতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

কারারক্ষী ফিরে এসে বলল—ভেতরে গিয়ে ডানদিকে একটা বড় ঘর দেখবে। সেখানেই অধ্যক্ষ বসেন। আপনারা যান।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া ঢুকল। ডানদিকের ঘরটার সামনে এল। ঘরে ঢুকল। দেখল কারা অধ্যক্ষ একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপাশে বসে আছে। টেবিলের এপাশে একটা লম্বাটে সিটের আসন। ফ্রান্সিসরা সেখানে বসল। অধ্যক্ষ বলল—

—এদেশি পোশাক পরেছো বটে—কিন্তু তোমরা বিদেশী সেটা বোঝা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ—আমরা জাতিতে ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—বল কী বলতে চাও? অধ্যক্ষ বলল।

—এই কয়েদঘরে আমাদের দেশের কেউ বন্দী আছে কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুদিন আগে একদল ভাইকিংকে আমরা বন্দী করে এখানে রেখেছিলাম। অধ্যক্ষ বলল।

—এখনও আছে ওরা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়েছে। অধ্যক্ষ বলল।

—এটা কতদিন আগের কথা? ফ্রান্সিস বলল।

—হবে—দিন দশ-পনেরো আগে। অধ্যক্ষ বলল।

—ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। অধ্যক্ষের নজরে পড়ল তা।

—অধ্যক্ষ বলল—খবরটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছো মনে হচ্ছে।

—ওরা আমাদের বন্ধু। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার বন্ধুরা পালিয়েছে—তোমরা পালাওনি?

—কথাটার মানে? ফ্রান্সিস বলল।

অধ্যক্ষ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে ডাকল—রক্ষীরা কে আছিস? দুজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া, চালে ভুল হয়ে গেছে। অধ্যক্ষ বলল—কিছুদিন আগে একজন ভাইকিং এখান থেকে পালিয়েছিল— মনে আছে?

—হ্যাঁ। কারারক্ষী একজন বলল। ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখিয়ে অধ্যক্ষ বলল—এই দু'জন তাদেরই বন্ধু। এদের কয়েদঘরে ঢোকা।

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—এসবের মানে কী? আমাদের বন্দী করবেন কেন?

—বন্ধুদের হয়ে তোমরা কয়েদ খাটবে।

—আমরা রাজি বন্ধুদের হয়ে কয়েদ খাটতে। কিন্তু সেটা কতদিন?

—সেটা বলবেন রাজা ভিলিয়ান। তবে যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাজা মশায়ের মন মেজাজ ভালো নেই। কতদিনের সাজা দেবে কে জানে। অধ্যক্ষ বলল। আসনে বসল।

কারারক্ষী দুজন এগিয়ে এল। মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস—তাহলে আবার করারাবাস।

—উপায় নেই। তবে বন্ধুদের হয়ে কারাবাস করছি—এটাই আমার সান্ত্বনা। চলো আমরা যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ও মারিয়া কারারক্ষীদের পেছনে পেছনে চলল।

একটা ঘরের সামনে এল সবাই। একজন কারারক্ষী চাবির তোড়া থেকে চাবি বের করল। দরজা খুলল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া ঢুকল। ঘর অন্ধকার। কারারক্ষী একজন চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালল। মশাল জ্বালল। কারারক্ষী দুজন চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস ঘরের মোটা নকশা আঁকা চাদরটার ওপরে শুয়ে পড়ল। মারিয়াও বসল। দেখতে লাগল চারিদিক। শক্ত পাথরের দেওয়াল। ওপর দিকে দুটো জানালা মত। গরাদ নেই।

মারিয়া বলল—তুমি তো বন্দী মেনে নিলে। এখন কতদিন এখানে পচতে হয় কে জানে!

—কালকে তো রাজসভায় নিয়ে যাবে। দেখা যাক রাজা ভিলিয়ান কী বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি অনেকদিনের জন্যে বন্দী করে রাখে তবে কী করবে? মারিয়া বলল।

—তবে পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? মারিয়া বলল।

—পারতে হবে। সমস্যা একটাই—তোমাকে কী করে সঙ্গে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার জন্যে ভেবো না। তুমি মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে যাও এটাই আমি চাই, মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—এটা একটা কথা হল? এই বিদেশ বিভুঁইয়ে তোমাকে একলা রেখে পালিয়ে যাবো? এসব কখনো ভাববে না। আমার ভালো লাগে না। মারিয়া বলল—তুমি রাগ করো না। এসব তোমাকে আর বলবো না।

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

রাতে দুজন কারারক্ষী খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল—পেট পুরে খাও। ভালো না লাগলেও খাও। এই কথাটা ফ্রান্সিস বন্দীদশার সময় সবাইকে বলে। পাখির মাংস আর আনাজের ঝোল।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস আবার শুয়ে পড়ল। মারিয়াও কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত তখন। ফ্রান্সিসের ঘুম আসে নি। নানা চিন্তা মাথায়। মৃদুস্বরে ডাকল—মারিয়া? মারিয়া বলল—বলো।

—সে কি? তুমি এখনও ঘুমোও নি? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ঘুমোও নি আর আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোবো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। আমি ঘুমুচ্ছি। এবার তুমিও ঘুমোও। ফ্রান্সিস বলল।

একসময় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাওয়াটা শেষ হতেই দুজন কারারক্ষী এল। বলল—

—চলো—রাজসভায় যেতে হবে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে এল। দেখল কারার অধ্যক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। অধ্যক্ষ ফ্রান্সিসদের দেখে হাঁটতে লাগল। সদর দরজার বাইরে এলো সবাই। অধ্যক্ষও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে হেঁটে চলল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন কারারক্ষী।

পথে অনেকেই দেখল দুজন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বন্দীরা কোন দেশের তা কেউ বুঝল না। যদিও বন্দী দুজন এ দেশীয় পোশাকে তবু মুখ দেখে গায়ের রং দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা দুজন বিদেশী।

সবাই হাঁটতে হাঁটতে একটা লম্বাটে বেশ বড় পাথরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল—প্রবেশ পথে পাথরের তোরণ। তাতে কুঁদে কুঁদে মশাল লতা পাতা পাল তোলা। দুজন রক্ষী দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে লোহার বর্শা। ফ্রান্সিস বুঝল—এটাই রাজবাড়ি। রক্ষীরা অধ্যক্ষকে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল।

সবাই রাজসভাঘরে ঢুকল। এর মধ্যেই রাজসভায় বেশ ভিড়। লম্বাটে ঘরটার মাঝামাঝি রাজসভা। রাজা ভিলিয়ান তখনও আসে নি। ফ্রান্সিস দেখল—দুটো

সিংহাসন। ও ঠিক বুঝলো না আর একটি ছোট সিংহাসন কার জন্যে।

অল্প কিছু পরে রাজা ভিলিয়াম ঢুকল। পেছনে রানি। বড় সিংহাসনটায় রাজা বসল। ছোটটায় রানি বসল। উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়িয়ে রাজারানিকে সম্মান জানাল।

রাজার মুখ বিমর্ষ। বোঝাই গেল যুদ্ধে পরাজয়টা রাজা মেনে নিতে পারে নি। রানির কিন্তু হাসিমুখ। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ছেলেমানুষের মত হাসছে।

দুটো বিচারের পর কারা অধ্যক্ষ মাথা নুইয়ে রাজারানিকে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা আমার একটা নিবেদন ছিল।

—বলো। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে দেখিয়ে অধ্যক্ষ বলল—এরা দুজন জাতিতে ভাইকিং। দিন সাত আট আগে এর বেশ কয়েকজন বন্ধুকে বন্দী করা হয়েছিল। আপনি তাদের গুপ্তচর সন্দেহে ছয়মাস কারাবাসের হুকুম দিয়েছিলেন।

—হুঁ। বলো। রাজা বলল।

—দিন আট-দশ আগে ওরা কারাকক্ষের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন এরা বন্ধুদের খোঁজে আমার কাছে এসেছিল। আমি আপনার কাছে আনলাম। এখন ওদের কী শাস্তি দেবেন দিন।

—এদেরও ছমাস কারাবাস। রাজা বলল।

—মাননীয় রাজা—এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি—আমার মনে হয়—এদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্যেই আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি। অধ্যক্ষ বলল।

—ঠিক—ঠিক। এদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলাম। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল—মাননীয় রাজা এত নিষ্ঠুর হবেন না। ভেবে দেখুন—আমরা বিদেশি ভাইকিং আপনাদের দেশে আমাদের কী স্বার্থ। গুপ্তচরবৃত্তির মত ঘৃণ্য কাজ আমরা করি না।

—না—না। রায় দেওয়া হয়ে গেছে। রাজা বলল।

এবার রানি মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল—

—তোমার নাম কী?

—মারিয়া।

—তোমার স্বামী কোথায়?

মারিয়া ফ্রান্সিসকে আঙুল তুলে দেখাল।

রানি হেসে উঠল—বাঃ কী মজা! সারাজীবন একটা ঘরে শুধু তোমরা দু'জন। এক সঙ্গে।

ফ্রান্সিস বলল—মাননীয়া রানি—মারিয়া আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—বলো কি! রাজকুমারী? অ্যাঁ? কিন্তু চেহারা দেখে তো সেটা মনে হচ্ছে না।

—আমরা দীর্ঘদিন নানা দ্বীপে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রোদ বৃষ্টি ঝড় অসহ্য
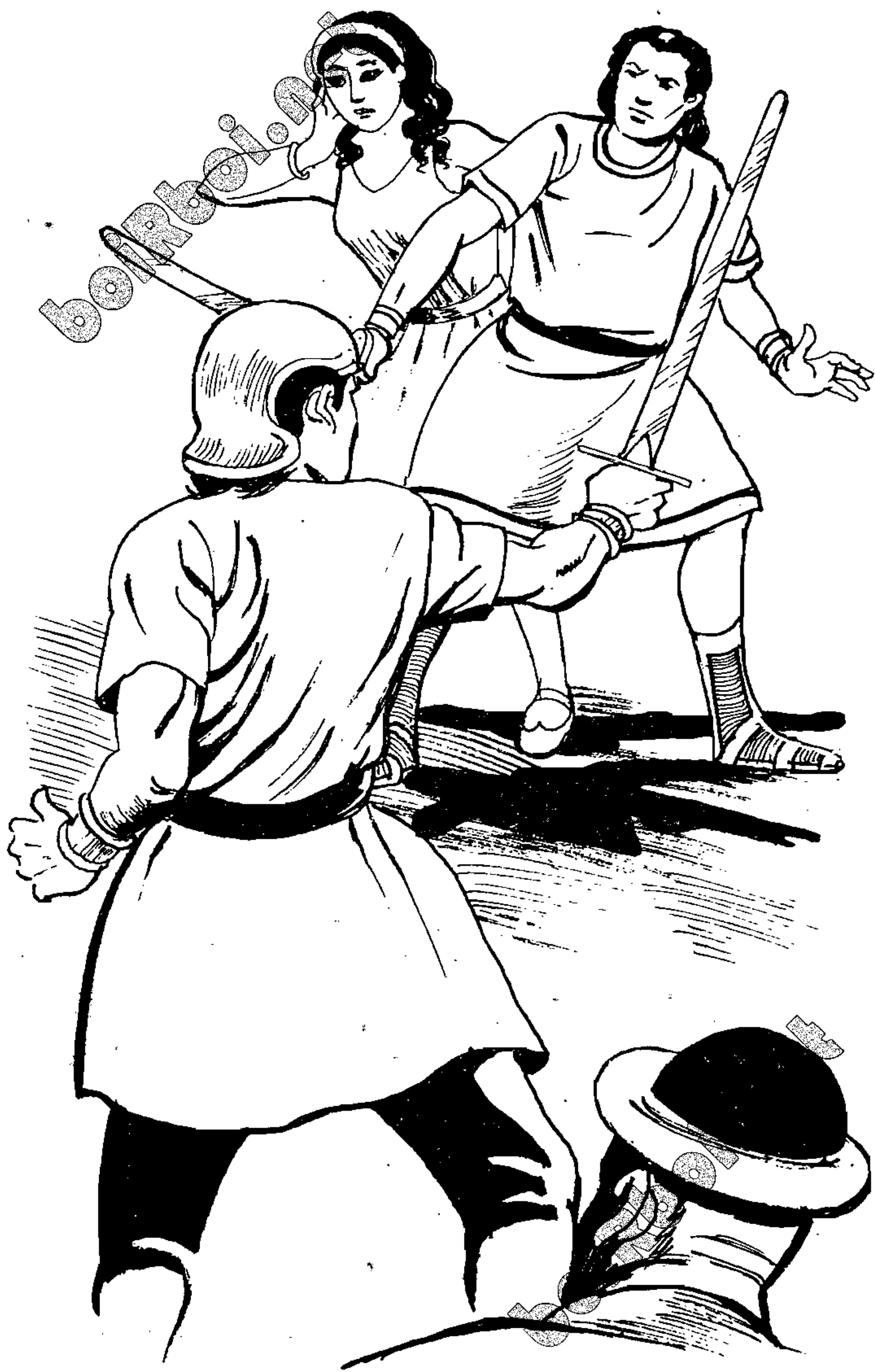
গরম আবার ঠাণ্ডা—এতসবের ধকল পুইয়ে শরীর ঠিক রাখা যায় না। চেহারায় তার প্রভাব পড়ে।

—তা ঠিক। যাকগে তোমাদের মত গুপ্তচরদের এরকম শাস্তিই হওয়া উচিত। রাজা ঠিক শাস্তিই দিয়েছেন। রানি হেসে বলল।

রাগে ফ্রান্সিসের বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। নাক দিয়ে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল। মারিয়া ভয়ে বলে উঠল।—ফ্রান্সিস—শান্ত হও। ভাগ্যে যা আছে মেনে নাও। ফ্রান্সিস —শোন—

ফ্রান্সিস রাজা রানিকে কোনরকম সম্মান না জানিয়েই পেছন ফিরে সভাঘরের দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। অধ্যক্ষের গলা শোনা গেল—দ্যাখ্ দ্যাখ্—পালিয়ে না যায়। দুজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে দাঁড়াল। অধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার জন্যেই আমাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। শোন—আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে খুন করবো।

অধ্যক্ষ বেশ ভয় পেল। বলল—এই তোরা একে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল্। এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মারিয়া এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও।

সবাই কারাগারে এল। ফ্রান্সিস আর মারিয়া যে ঘরে ছিল সেদিকে চলল। কারা অধ্যক্ষ এগিয়ে এল। হেসে বলল—তোমাদের তো অনেকদিন থাকতে হবে। তাই চার নম্বর ঘরটাতে তোমাদের রাখবো। শুকনো ঘাসের পুরু বিছানা। ঘরটা রোদ পায় বলে একটু গরমও। তাছাড়া তোমরা আর যা চাইবে পাবে। মারিয়া গলা চড়িয়ে বলল—থাক—আমাদের সুবিধে দেখতে হবে না। যা ঘরে আছি আমরা সেঘরেই থাকবো।

কিন্তু আপনাদের তো কষ্ট হবে। কত বছর থাকতে হবে। অধ্যক্ষ হেসে বলল। কথাটা শেষ হতেই ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ছুটে গিয়ে অধ্যক্ষের গলার কাছে জামাটা চেপে ধরল। তারপর ফ্রান্সিস এক হ্যাঁচকা টানে উচুঁতে তুলল। অধ্যক্ষ বলে উঠল—এ্যাই ধর একে। তরোয়াল চালা। দুজন কারারক্ষক তরবারি কোষমুক্ত করল। মারিয়া গিয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। বলল—ফ্রান্সিস—শান্ত হও। এভাবে আমাদের বিপদ বাড়বে। রক্ষী দুজন তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। ও নিরস্ত্র। ও অধ্যক্ষকে এক হ্যাঁচ্কা টানে মাটিতে নামাল। মুঠো ছেড়ে দিল। অধ্যক্ষ মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। বলল—তোরা সাবধান। এই বন্দী যেন কখনও বাইরে আসতে না পারে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া কারাকক্ষে ঢুকল। মারিয়া ঘাসের বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস পায়চারি করতে লাগল। ঘরের তালাবন্ধ করল একজন প্রহরী।

মারিয়া হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। বলল—বসো। ফ্রান্সিস চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া আবার বলল—শান্ত হয়ে বসো। ফ্রান্সিস বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। দাঁত চাপাস্বরে বলল—মারিয়া—তুমি যদি না থাকতে আমি রাজা

রানি আর ঐ কারার অধ্যক্ষকে মেরে ফেলতাম।

—আমি জানি—আমার জন্যেই তোমাদের এত কষ্ট। মারিয়া ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। মারিয়ার কাঁধে দু'হাত রেখে বলল—

—মারিয়া—কেঁদো না। এভাবে কথাটা বলা উচিত হয়নি। তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। তুমি কেঁদো না। মারিয়া চোখ মুছল। আর কাঁদল না।

ফ্রান্সিস আর মারিয়ার দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে তখনই কারার অধ্যক্ষ ঢুকল। কারারক্ষীরা তাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। অধ্যক্ষ মারিয়াকে বলল—আপনিই তো রাজকুমারী?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে ডাকছেন কেন? মারিয়া বলল।

—আমি না। রানিমা চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন। আপনাকে রানিমার কাছে যেতে হবে। উনি আপনাকে ডেকেছেন। অধ্যক্ষ বলল।

—আমি যাবো না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

—তার মানে? রানিমা স্বয়ং লোক পাঠিয়েছেন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আর আপনি বলছেন যাবো না?

—কী কারণে মারিয়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন সেটা কি জানানো হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল।

—না—সেসব আমি জানি না। রানিমাও ঐ ব্যাপারে কিছু লেখেন নি। অধ্যক্ষ বলল।

—তাহলে কারণটা আপনি জেনে আসুন তারপর কারণের গুরুত্ব বুঝে মারিয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরে বাবা—রানিমার কাছে কে কারণ জানতে যাবে। অধ্যক্ষ বলল।

—কেন? আপনি যাবেন? মারিয়া বলল।

—আমি? মরে যাবো। মরে যাবো কি আমি মরে গেছি। অধ্যক্ষ বলল।

—কী আর হবে—যান। অধ্যক্ষ বলল।

অধ্যক্ষ চিৎকার করে বলল—আমাকে বেত মারা হবে। তারপর চাকরি থেকে বরখাস্ত।

—তাহলে তো আপনার খুবই বিপদ দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বিপদ বলে বিপদ। আমি শেষ—খতম। অধ্যক্ষ বলল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। ব্যাপারটা ভালো জমেছে। গলা নামিয়ে ফ্রান্সিস বলল।

অধ্যক্ষ এবার হাত জোড় করে মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী শিগগিরি যান। এতে আপনাদের দুজনেরই উপকার হবে। কথাটা ফ্রান্সিসকে আগ্রহী করল। মনে মনে ভাবল—মারিয়া যাক। গিয়ে দেখুন রানি কী বলতে চান। হয়তো আমাদের মুক্তিও দিতে পারে।

ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া যাও—রানি কী বলে সেটা শুনে এসো।

—রানির চোখে আমি কুটিল দৃষ্টি দেখেছি। উনি ভালো মানুষ নন। মারিয়া বলল।

—সংসারে ক'জন আর ভালো মানুষ আছে। এই যে অধ্যক্ষ—জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। এর সঙ্গেও তো আমাদের কথা বলতে হয়। যাও—জেনে এসো রানি কী বলতে চান? ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। বলল—আমাকে কে নিয়ে যাবে?

—আমার কাজের ঘরে এক মহিলা বসে আছে সেই নিয়ে যাবে। চলুন।

দুজনে কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। অধ্যক্ষের কাজের ঘরে এলো। মারিয়া দেখল একজন বয়স্কা মহিলা। অধ্যক্ষ তার দিকে তাকিয়ে বলল-এই যে রাজকুমারী মারিয়া। এঁকে নিয়ে যাও।

মহিলাটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মারিয়া পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল।

সদর রাস্তায় এলো। মারিয়া চারদিকে উৎসুক চোখ মেলে লোকজন বাজার বাড়িঘর দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে রাজবাড়িতে পৌঁছল। স্ত্রীলোকটি রাজবাড়ির পেছন দিকে এল। টানা পাথরের দেয়াল। মহিলাটি পাথরের দেয়ালের মধ্যে একটা কাঠের দরজায় হাত দিয়ে টুক্ টুক্ শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন স্ত্রীলোক পেতলের বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা গেল অন্তঃপুরে পাহারা দেয়। মারিয়ারা ঢুকতেই স্ত্রীলোকটি দরজা বন্ধ করে দিল।

এক পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া চলল। পরপর কয়েকটি বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। ফুলের গন্ধ নাকে লাগল। কে জানে কোন ফুলের গন্ধ। দুটো ফোয়ারা আছে। তারপর একটা চারকোনা চত্বর। তারপরেই পাথরের দরজা। এখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

দুজনে ঢুকল। দুধারের দেয়ালে ছবি বসানো। মারিয়া বুঝল এসব অতীতের রাজা রানিদের ছবি। দুজনে এগিয়ে চলল। দুধারে ঘর। পাখির পালকের বিছানায় শুয়ে আছে বসে আছে কথাবার্তা বলছেন রানির সহচারীরা। এখানে সুগন্ধি কিছু দেওয়া হয়েছে। সুন্দর গন্ধ। সকলেই মারিয়াকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখতে লাগল।

এবার ডানদিকে একেবারে আলাদা দুটো ঘর। এখানে মেঝে মোজেক করা। স্ত্রীলোকটি বলল—দাঁড়ান। রানিমা কোন ঘরে আছেন দেখে আসছি। স্ত্রীলোকটি চলে গেল। মারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। মারিয়াদেরও দেশে প্রাসাদ আছে। কাজেই এরকম অন্দরমহলও আছে। সেটাও বা এর চেয়ে কম কি। হঠাৎ মারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ওদের প্রাসাদের কথা মনে পড়ল। ফ্রান্সিসদের সাজানো গোছানো বাড়ির কথা মনে পড়ল। চোখে জল এল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চোখ মুছল। এসব বেশি ভাবলে মন খারাপ হবে। ফ্রান্সিসও এটা পছন্দ করে না।

কিছু পরে পরিচারিকাটি ফিরে এল। বলল—চলুন—রানিমা সাজঘরে

আছেন।

কিছুটা এগিয়েই ডানদিকে একটা ঘর। দরজায় মোটা কাপড়ের পর্দা। সুচিত্রিত।

পর্দা সরিয়ে ঢুকল। দেখল একটা বেশ বড় ঘর। একটা খাট রয়েছে মাঝখানে। রানি খাটে বসে আছে। পরিচারিকারা রানিকে সাজাচ্ছে। রানির পরনে ঢোলা হাতা সাধারণ পোশাক। মারিয়া মনে মনে হাসল। দামি ভালো কাপড়টা এখনও পরানো হয়নি। গয়নাগাটিও এখনও পরানো হয়নি।

রানি মারিয়াকে দেখে বলল—তুমি তো মারিয়া?

—হ্যাঁ। মারিয়া মাথা কাত করে বলল।

—এখানেই বসো। রানি বলল।

মারিয়া খাটে বসল। রানি বলল—ভালো হয়ে বসো। মারিয়া বলল—ঠিক আছে।

—আর বলো কেন। মাঝে মাঝেই মন্ত্রী সেনাপতি বড় বড় ব্যবসাদারের বাড়িতে নাচগানের আসর বসে। যেতে হয়। আচ্ছা—তোমরা তো শুনলাম পশ্চিম য়ুরোপের অধিবাসী। তোমরা তো ভালো সাজসজ্জা জানো। রানি বলল।

—ঐ আর কি। মারিয়া হেসে বলল।

—দ্যাখো তো আমার মুখের সাজ ঠিক আছে? রানি বলল।

মারিয়া রানীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল—আপনার ভুরুটা একটু মোটা হয়ে গেছে।

রানি সামনে বসা পরিচারিকাকে বলল—ভুরুটা ঠিক করে দে। পরিচারিকা ভুরুটা ধারগুলো মুছে মুছে সরু করল। রানির সামনে আয়না ধরা হল। নিজের মুখ দেখে রানি মহা খুশি।

—মারিয়া—তুমি এখানেই থাকো। আমাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেবে। রানি বলল।

—মাননীয়া রানি—তা হয় না। আমার স্বামী কয়েদ খাটছে। মারিয়া বলল।

—হুঁ। একটু সমস্যা। যাহোক আমি তোমার স্বামীর শাস্তি মকুব করিয়ে দেবো। রানি বলল।

—না। আমি কয়েদঘরেই থাকবো। মারিয়া বলল।

মারিয়া কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এই রানিই রাজসভায় বলেছিল ঠিক শাস্তি হয়েছে। একটা বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল। দয়ামায়া বলে কোন বোধই এই রানির নেই। তাকে সাজগোজ করাতে আমি আসবো কেন। এই রানির সঙ্গে কী সম্পর্ক আমাদের?

—তাহলে তুমি এখানে থাকবে না? রানি একটু রেগেই বলল।

—না। আপনিই তো রাজদরবারে আমাদের গুপ্তচর বলাকে সমর্থন করেছিলেন। আপনি অনায়াসে পারতেন আমাদের যে অন্যায় শাস্তি রাজা দিয়েছিলেন সেটা মকুব করাতে। মারিয়া বলল।

—এবার মকুব করাবো। তবে দু'এক বছর না গেলে পারবো না। রানি

বলল।

—ততদিন তো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মারিয়া বলল।

—তা তো হবেই। রানি বলল।

—আমার স্বামী ঐ কয়েদঘরেই থাকবেন বলেছেন। তবে যাবজ্জীবন নয়। মারিয়া বলল।

—তাহলে কী করবে? রানি বলল।

—পালাবে। মারিয়া বলল।

—পালাবে? রানি বলল।

—অনায়াসে। মারিয়া বলল।

—আমাদের কত কারারক্ষী আছে জানো? কারা অধ্যক্ষও আছে। রানি বলল।

—আপনাদের যত কারারক্ষীই থাকুক আমার স্বামীকে বন্দী করে রাখতে পারবে না। মারিয়া বলল।

—তাহলে তো আর দেরি করা কেন? কাল পরশুই পালিয়ে যাক। রানি বলল।

—সেটা অনায়াসেই পারতো তার বুদ্ধি দিয়ে। কিন্তু সমস্যা হলাম আমি। আমাকে রেখে পালিয়ে যেতে তো পারবে না। মারিয়া বলল।

—যাক গে—ওসব কথা। তুমি কয়েদঘরেই থাকো। দরকার পড়লে তোমাকে ডাকবো। রানি বলল।

—বেশ। মারিয়া বলল।

রানি তখন একজন পরিচালিকাকে ডাকল। বলল—যা সদর দরজায় একজন প্রহরীকে গিয়ে বল, ও যেন একে কয়েদঘরের অধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যায়। যা—

পরিচারিকা চলে গেল।

—রাজকন্যা বলে তোমার একটু গোপন গর্ব আছে। রানি বলল।

—না—আমি রাজকন্যা বলে নয়। ফ্রান্সিসের মত স্বামী পেয়েছি বলে আমি গর্বিত। মারিয়া বলল।

পরিচারিকা এল। বলল—রানিমা প্রহরীকে বলেছি। এখন এই রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে হবে।

—বেশ। নিয়ে যা। একটু থেমে রানি বলল—আমাকে সাজগোজ করানোর কাজটা বোধহয় অপমানজনক মনে হয়েছে তোমার। রানি বলল।

—না। ইচ্ছে হলে আমি প্রায় সব কাজই নিজের কাজ বলে মনে করি। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। ডাকলে এসো। রানি বলল।

—আমি এখনও ঠিক করতে পারিনি—আসবো কি আসবো না। মারিয়া বলল।

—ভেবে দেখ। রানি বলল।

মারিয়া পরিচারিকার সঙ্গে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এল। প্রহরীটিকে ডেকে পরিচারিকা চলে গেল। প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—চলুন।

তখন রাত হয়েছে। সদর রাস্তায় লোকজনের ভিড়। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কয়েদঘরে সারাদিন গরমের মধ্যে কাটিয়ে মারিয়ার বাতাসটা ভালো লাগল। বাইরে আলো দোকানপাটও ভালো লাগল। আর কোনদিন মুক্তি পাবে কি না। মারিয়া আকাশের দিকে তাকাল। ভাঙা চাঁদ। লক্ষ তারার ভিড়। এত সুন্দর পৃথিবী আর এক অন্ধ কুঠুরিতে আমরা পড়ে আছি। অল্পক্ষণের জন্যে হলেও আমি তো বাইরে আসতে পারলাম। ফ্রান্সিস অন্ধ কূপেই রইল। এসব ভাবতে গিয়ে মারিয়ার চোখে জল এল। মারিয়া হাত দিয়ে চোখ মুছল।

কয়েদখানায় পৌঁছে দিয়ে প্রহরীটি চলে গেল। মারিয়া ঢুকতেই অধ্যক্ষ তার ঘর থেকে ছুটে এল। হেঁ হেঁ করে হেসে বলল—রাজকুমারী—রানিমা কী বললেন।

—তেমন কিছু নয়। মারিয়া বলল।

—তবু? অধ্যক্ষ বলল।

মারিয়া চুপ করে রইল।

—বলুন না। আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি তো? অধ্যক্ষ বলল।

—উনি কি আপনাকে চেনেন? মারিয়া বলল।

—না—তা চেনেন না। অধ্যক্ষ বলল।

—তাহলে আর আপনার ভয় কিসের। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—তাই তো। অধ্যক্ষ হেসে বলল।

ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে মারিয়ার বিশ্রী লাগছিল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। মারিয়া ঢুকল। ফ্রান্সিস শুয়েছিল। উঠে বসল। মারিয়া বসল।

—কী ব্যাপার বলো তো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

মারিয়া আস্তে আস্তে সব কথা বলল। ফ্রান্সিস বলল—এতো অদ্ভুত ব্যাপার। সাজসজ্জা করাবার জন্যে তোমাকে যেতে বলেছে!

—আসলে এদেশিয় মেয়েরা তো সাজগোজের ব্যাপারটা বোঝে না। এমন করে রানির ভুরুতে কালো রং করেছে যেন দুটো মোটা জোঁক আটকে আছে। মারিয়া বলল।

—হুঁ। মজার ব্যাপার। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—আসলে রানি চান য়ুরোপের মেয়েরা যারা নতুন নতুন সাজসজ্জা করতে পারে তাদেরই সে চায়।

—তাহলে কী করবে? ফ্রান্সিস বলল।

—যেদিন নাচ বা গানের আসরে রানিকে যেতে হবে সেদিন লোক পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন। মারিয়া বলল।

—তুমি সেদিন যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। যাবো। রানি কথায় কথায় একটা কথা বলেছে যে দু'এক বছরের

মধ্যে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে। মারিয়া বলল।

—আমরা তার অনেক আগেই পালাবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া একটা কথা ভাবছি।

—কী কথা? মারিয়া বলল।

—তুমি রাজবাড়িতেই রানির মহলে থাকো। ফ্রান্সিস বলল।

—রানির মহলে থাকবো? এখানে থাকলে অসুবিধেটা কোথায়? মারিয়া বলল।

—মারিয়া—তোমার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। এসব কয়েদখানা তোমার থাকার জায়গা না। ফ্রান্সিস বলল।

—না—আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—অবুঝ হয়ো না মারিয়া। আমাদের তো আয়না দেখার সুযোগ নেই—কাজেই তোমার শরীর কতটা খারাপ হয়েছে জানো না। বুঝতেও পারছো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি এখানে একা থাকবে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ একাই থাকবো। তাতে আমার পালাবার সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তাহলে কালকেই রানিকে খবর পাঠাবো যে আমি দেখা করতে চাই। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। কালকেই দেখা কর। ফ্রান্সিস বলল।

গভীর রাত পর্যন্ত ফ্রান্সিস ঘুমোতে পারল না। বোধহয় মারিয়াও ঘুমোয় নি। এক সময়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাবার খেয়ে মারিয়া একজন প্রহরীকে কারার অধ্যক্ষের কাছে পাঠাল। বলল—বলো তো—আমি রানির সঙ্গে কথা বলতে যাবো। প্রহরীটি চলে গেল।

একটু পরেই অধ্যক্ষ মশাই প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। বলল—কী বাপার? কী ব্যাপার?

—ব্যাপার তেমন কিছু নয়। আমি রানির সঙ্গে দেখা করবো। আপনি কোন প্রহরীকে আমার সঙ্গে পাঠান। মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার একটা কথা ছিল। অধ্যক্ষ বলল।

—কী কথা। অধ্যক্ষ বলল। রানি যদি জানতে চান আমি অধ্যক্ষের কাজ কেমন করছি তাহলে অবশ্যই আমার কাজের প্রশংসা করবেন।

—আপনি মিছি মিছি ভয় পাচ্ছেন। মারিয়া বলল।

—না—না। আমার কথা উঠলে অবশ্যই বলবেন। অধ্যক্ষ বলল।

—ঠিক আছে, বলবো। এখন কোন প্রহরীকে পাঠান। মারিয়া বলল।

—আমি এক্ষুনি পাঠাচ্ছি। অধ্যক্ষ বলল। তারপর হাততালি দিয়ে একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরীটি এলো।

—তুমি রাজবাড়ি যাও। অন্দরমহলে কোন পরিচালিকাকে দিয়ে রানিকে

বলো যে বন্দিনী ভাইকিং রাজকুমারী রানির সঙ্গে দেখা করতে চান। যাও। অধ্যক্ষ বলল।

প্রহরীটি রাজবাড়ি গেল। ওখানকার এক প্রহরীকে বলল—

—ভাই রানিকে একটা খবর পাঠাও।

—কী খবর?

—বলো যে কয়েদঘরে বন্দিনী রাজকুমারী রানির সঙ্গে দেখা করতে চান।

—বেশ। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছু পরে প্রহরীটি ফিরে এল। বলল—রানিমা রাজকুমারীকে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। একজন পরিচারিকা এল। অধ্যক্ষ পরিচারিকাকে দেখে আসন থেকে লাফিয়ে উঠল। বলল—রানিমা কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—না। রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—ও। তাহলে আমার কথা কিছু বলেনি। পরিচারিকাটি বলল—না।

—ও। অধ্যক্ষ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল। একজন প্রহরীকে ইঙ্গিতে বোঝাল দরজা খুলে দাও।

প্রহরীটি দরজা খুলে দিল। মারিয়া দরজার কাছে এসে পিছু ফিরে ফ্রান্সিসকে বলল—তুমি দুশ্চিন্তা করো না। আমি ভালোই থাকবো।

পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

এবার ফ্রান্সিস পালাবার পরিকল্পনা করতে বসল। শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। রানী মারিয়াকে অন্তঃপুরে থাকতে বলবেন কিনা তার ঠিক নেই। দেখা যাক রানি কী করেন? মারিয়াকে মহলে থাকতে বলবেন না কয়েদঘরে ফেরৎ পাঠান। আজকের রাতটা থাক। কালকে রাতে খাওয়ার পর পালাবো।

রাতটা কাটল। ফ্রান্সিস ভালো করে বুঝতে পারেনি। অনেক চিন্তা মাথায়। হ্যারিরা কোথায় আছে? ওরা কি রাজা অপর্তোর রাজ্যেই থেকে গেছে না এই ভিগোনগরে এসেছে। একটা স্বস্তি—হ্যারিরা কেউ এখানে কয়েদঘরে বন্দী হয়ে নেই। ওরা মুক্ত।

সন্ধের কিছু পরেই ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে ডাকল। বলল, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে দেবে। প্রহরীটি একটু রসিকতা করে বলল—কেন? কেন নাচগানের আসরে যাবেন।

না আমি কয়েদঘরের বাইরে যাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন এখান থেকে বেরুতে? প্রহরীটা বলল।

—অনায়াসে। আমার ছক ভাবা হয়ে গেছে। এখন কাজে নামা। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল, পালানো আর তার পরের কাজগুলো ভাবতে

লাগল। সবচেয়ে মুশকিল হবে মারিয়াকে অন্দরমহল থেকে বাইরে নিয়ে আসা! তার জন্যে কী করতে হবে সে সব ভাবতে লাগল।

ঢং ঢং-প্রহরী দরজা খুলে খাবার আনল। দরজাটা আধ ভেজানো। ফ্রান্সিস আর চোখে দেখল—দুজন ঘরে ঢুকেছে দুজন ঘরের বাইরে পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েই মাটির ভাঁড় রাখা তরকারি ঝোলটা একজন প্রহরীর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল। প্রহরীটা মেঝেয় পড়ে গেল। এবার যে প্রহরীটা কাটা রুটি কাঠের থালায় নিয়ে আসছিল সেই থালাটা তুলে ফ্রান্সিস প্রহরীর চোখ মুখে চাপা দিল। প্রহরীটি বসে পড়ল। তার কোমরে গুঁজে রাখা তরোয়ালটা ফ্রান্সিস এক টানে তুলে নিল। ছুটল বাইরের দিকে। বাইরে এসে দেখল-আরো দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস ছুটে এসে একজন প্রহরীর খোলা তরোয়ালে এত জোরে তরোয়াল চালাল যে—তরোয়াল ছিটকে গেল।

ইতিমধ্যে ভেতরের প্রহরীর কয়জন ছুটে আসতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। এক ছুটে রাস্তার ওপাশে গেল। তারপর এক লাফ দিয়ে নর্দমাটা পার হল। তারপর ঝোপ জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ফ্রান্সিস এত দ্রুত কাজ সারল প্রহরীরা বোকা বনে গেল। ওরা তৈরি হওয়ার কোন সুযোগই পেল না। সেই নর্দমা লাফিয়ে পার হল কয়েকজন প্রহরী। জংলা ঝোপের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে কাঁটা গাছ সরিয়ে সরিয়ে যেতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে বিস্তীর্ণ এক ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর দিয়ে ছুটল। লক্ষ্য-রাজবাড়ি। তরোয়ালটা ফেলে দিল না। কোমরে গুঁজে রাখল। আজকে চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। চারপাশে সবই ভালো দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস ছুটে চলল। একটু খুঁজতেই হল। পেয়ে গেল রাজবাড়ি।

রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারে এল। দূর থেকে দেখল প্রবেশদ্বারের মাথায় অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। প্রায় আট-দশজন সশস্ত্র প্রহরী রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস বুঝল এখান দিয়ে রাজবাড়িতে ঢোকা অসম্ভব।

ফ্রান্সিস পেছন দিকে চলল। কয়েকটা ফুলবাগান আর ফোয়ারার পরে রাজবাড়ির দেওয়াল। দেওয়াল খুব উঁচু নয়। দেওয়ালে ওঠা যাবে। রাজবাড়িতে ঢোকাও যাবে।

দেওয়ালে একটা কাঠের দরজা। তার মানে এদিক দিয়ে রাজবাড়ির অন্দরমহলে যাওয়া যায়। ফ্রান্সিস বুঝল দেওয়াল টপকে ভেতরে যেতে হবে। তারপর মারিয়াকে খোঁজা।

ফ্রান্সিস দেওয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল। কাঠের দরজার গায়ে চ্যাপ্টা লোহার দণ্ড। ফ্রান্সিস দরজার ওপরের দিকে তাকাল সহজেই ওঠা যাবে।

এবার ফ্রান্সিস লোহার চ্যাপ্টা দণ্ডগুলোর ওপর পা রেখে রেখে দরজার মাথায় উঠে এল। তারপর দরজার ওপাশে লোহার চ্যাপ্টা দণ্ডগুলোর ওপর পা রেখে রেখে নিচে চলে এল। একটু হাঁপাচ্ছিল ফ্রান্সিস। দরজাটায় ভিতর থেকে তালা লাগানো।

চাবিটা তালাটার ফুটোয় লাগানো। ফ্রান্সিস তালাটা খুলে ফেলল।

এবার চলল অন্দরমহলের দিকে। দেখল প্রথম দরজাটা কাঠের। ফ্রান্সিস দরজাটা ধরে আস্তে টানল কয়েকবার। এবার ভেতর থেকে তালা লাগানো।

ফ্রান্সিস এপাশ ওপাশে তাকিয়ে দেখল বেশ কটা জানালা আছে। একটা জানালার কাছে এল। জানালায় লোহার কাজ করা। জানালাটা কাঠের। ফ্রান্সিস জানালাটা ধরে আস্তে চাপ দিয়ে নিজের দিকে টানল। জানালার পাল্লা খুলে গেল। আর কোন বাধা নেই। ফ্রান্সিস জানালার খোলা পাল্লা ধরে এক লাফে জানালাটায় উঠল। তারপর পা বাড়িয়ে নিঃশব্দে ঘরটায় নামল। মোমের আলোয় দেখল—রাজবাড়ির পরিচারিকারা ঘুমিয়ে আছে।

যাতে কোন শব্দ না হয় ওদের ঘুম না ভাঙে—ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘরটা পার হল। দরজার কাছে এল। পরিচারিকাদের সঙ্গে এখানে মারিয়া থাকবে না, নিশ্চয়ই মারিয়াকে আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল বাঁ দিকে। টানা বারান্দার মত চলে গেছে। দুদিকে পরপর ঘর।

ফ্রান্সিস পরের ঘরটায় ঢুকল আরো কয়েকজন পরিচারিকা ঘুমিয়ে আছে। মারিয়া এখানে নেই।

এবার অন্য ঘরটায় ঢুকল। পরিপাটি সাজানো গোছানো ঘর। মাঝখানে একটা অবশ্য বড় খাট। দেখল রানি ঘুমিয়ে আছে। বাতাসে সুগন্ধ। একটা কাচঢাকা মৃদু আলো। ঘরটা শুধু রানিরই।

পরের ঘরটা দেখল—বেশ সাজানো গুছানো। কাচে ঢাকা আলো জ্বলছে। রানির সহচরীদের সঙ্গে মারিয়া ঘুমিয়ে আছে।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পা ফেলে মারিয়ার কাছে এল। আস্তে কাঁধে ধাক্কা দিল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাকাল। অল্প আলোয় ফ্রান্সিসকে দেখল। দ্রুত উঠে বসল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। পোশাক গুছিয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। দুজনে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এবার মারিয়াই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

রাজবাড়ির পেছনের দরজাটার কাছে এল। দরজায় তালা ঝুলছে। মারিয়া তাড়াতাড়ি পাশে রাখা একটা কাঠের বাক্সে হাত ঢুকিয়ে খুঁজে বলল—চাবিটা নেই। কয়েকদিন আগে দুজন পরিচারিকা রাতে এই দরজা খুলে পালিয়েছে। তাই এত কড়াকড়ি।

—ঠিক আছে। দেওয়াল ডিঙিয়ে যাব। এসো।

ফ্রান্সিস নিচু হয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে বলল—হাত দুটোয় দু' পা রাখো। মারিয়া কোনরকমে দুটো হাতে পা রাখল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে তুলতে লাগল। বলল—দরজাটায় ভর রাখো।

একটু পরেই মারিয়া দরজার ওপরে উঠে এল। এবার ফ্রান্সিস দরজায় পা

রেখে দরজার ওপরে উঠল। তারপরে অনুজ্জ্বল জোৎস্নায় দেখল দরজার গায়ে চ্যাপ্টা লোহা লাগানো। ফ্রান্সিস বলল—ওগুলোর ওপর পা দিয়ে নেমে আসবে। আমি দাঁড়াচ্ছি।

ফ্রান্সিস নামল। এবার দু হাত বাড়িয়ে বলল—নেমে এসো। মারিয়া পা রেখে নামল কিছুটা। তারপরেই নামতে গিয়ে পা পিছলে গেল। মারিয়া পড়ে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস নিচে থেকে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া আস্তে আস্তে নেমে এল।

দুজনে নেমেই ছুটল। রাজার বাড়ির এলাকা থেকে সদর রাস্তায় এসে উঠল। এবার ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস বলল—এখন দৌড়ে যাওয়া ঠিক নয়। একে তো আমরা বিদেশি তার ওপর দৌড়ে যাচ্ছি দেখলে যে কারো সন্দেহ হবে। আমরা বিপদে পড়বো। অর্থাৎ আবার কয়েদঘর।

এবার দুজনে হাঁটতে লাগল জাহাজঘাটার দিকে।

একটু পরে পূব আকাশে থালার মত কমলা রঙের সূর্য উঠল। চারদিকে আলো ছড়াল।

ফ্রান্সিস দূর থেকে দেখল কয়েদখানার দুই রক্ষী আসছে। ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল—তুমি আমার কাছে থেকে সরে যাও। দুই রক্ষী।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিসরা ধরা পড়ে গেল। সৈন্য দুজন ছুটতে ছুটতে এল। ফ্রান্সিস বুঝল পারলো পালানো যাবে না। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজে পালাতে পারতো। তাহলে মারিয়াকে ধরতো ওরা। তাহলে ফ্রান্সিস দারুণ সমস্যায় পড়তো।

রক্ষী দুজন ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কাছে এল। একজন রক্ষী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমরা দুজন কয়েদ খাটছিলে।

—হ্যাঁ। তাতে কী হল? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা পালিয়েছিলে। রক্ষী বলল।

—আমি পালাই নি। রাজরানি আমাকে অন্দরমহলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মারিয়া বলল।

—বেশ। কিন্তু তুমি? রক্ষী ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল।

—হ্যাঁ আমি পালিয়েছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন পালিয়েছিলে? রক্ষী বলল।

—সে তুমি বুঝবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—তোমরা দুজনেই কয়েদখানায় চলো। একজন রক্ষী বলল।

—আমরা যাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তরোয়ালের ঘা খেয়ে মরবে। অন্য রক্ষীটি বলল।

—ঠিক আছে তরোয়াল চালাও। ফ্রান্সিস বলল।

দুজন রক্ষী তরোয়াল কোষমুক্ত করল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল খুলে মারিয়ার হাতে দিল। মৃদুস্বরে বলল—আজকে

তোমার পরীক্ষা। মারিয়া ঘাবড়াল না। তরোয়ালটা ভালো করে ধরে রুখে দাঁড়াল।

একজন সৈন্য বলল—এ তো মেয়ে। এর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে ও তো মরে যাবে।

—কথা রাখো। তরোয়াল চালাও। মারিয়া বলল। রক্ষী তরোয়াল নিয়ে মারিয়াকে আক্রমণ করল। মারিয়া মার ঠেকাল। তারপর নিজে তরোয়াল চালাল। রক্ষীটি ঠেকালেন। শুরু হল লড়াই। ফ্রান্সিস লক্ষ্য রাখল মারিয়া যাতে আহত না হয়। লড়াই জমে উঠল। রক্ষীটি কিছুতেই মারিয়াকে হারাতে পারছে না। তরোয়ালে ঘায়ে মারিয়ার কাঁধের জামা কেটে গেছে। কিন্তু মারিয়া ভ্রূক্ষেপ করল না। তরোয়াল চালাতে লাগল।

ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলে উঠল—এবার থামো। রক্ষীটি আর মারিয়া দুজনেই লড়াই থামাল। দুজনেই হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—একজন মেয়েকে তুমি হারাতে পারলে না। আমার সঙ্গে কী লড়বে?

অন্য রক্ষীটি এবার ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল। ফ্রান্সিস দ্রুত মারিয়ার হাত থেকে তরোয়ালটা নিল। শুরু হল ফ্রান্সিসের সঙ্গে ঐ রক্ষীটির লড়াই।

এই সকালেও ফ্রান্সিসদের ঘিরে মানুষের জটলা হল। চলল লড়াই। রক্ষীটি একটু পরেই বুঝতে পারল কার পাল্লায় পড়েছে। ফ্রান্সিস ঠিকই করেছিল সৈন্যটির শরীরে আঘাত করবে না। ওর দম ফুরিয়ে দেবে। সৈন্যটি আর তরোয়ালই তুলতে পারবে না। কিছুক্ষণ পরে তাই হল। সৈন্যটি মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস ওর বর্মের চামড়ার ফিতে কেটে দিল। বর্ম খুলে পড়ল। সৈন্যটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আর লড়াইয়ের ইচ্ছে আছে? ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। সৈন্যটি কিছু বলল না। মুখ নিচু করে হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়াল গুঁজতে গুঁজতে বলল—এখন এখান থেকে চলে যাও। আমরা তোমাদের বা তোমাদের দেশের কোন ক্ষতি করিনি। করবোও না। আমরা কিছুক্ষণ পরেই জাহাজ ছাড়বো। তাহলে তোমরা আবার কেন আমাদের বন্দী করতে চাইছো। বিনা দোষে আমাদের কেন কয়েদ করা হবে? যাকগে—তোমরা কারা অধ্যক্ষকে গিয়ে বলো আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। মিছিমিছি রক্তপাত আমি চাই না। তোমার বন্ধুটিকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতাম কিন্তু আমি করিনি।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—চলো।

দুজনে জাহাজ ঘাটের দিকে চলল। রক্ষী দুজন আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল।

জাহাজঘাটায় এল। দেখল যেখানে ওদের জাহাজটা নোঙর করে রেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে। চুরি হয়ে যায় নি। ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

দুজনে পাতা পাটাতন দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল। কোন লোককে

দেখল না। নিচে কেবিনঘরে ফ্রান্সিসরা ঢুকল। দেখল কে একজন বিছানায় শুয়ে রয়েছে। বোধহয় ঘুমিয়ে আছে।

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। অন্য ঘরগুলোতে দেখল আরো তিনজন বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ফ্রান্সিস প্রথম ঘরটায় এলো। তরোয়াল খুলল। লোকটার বুকের ওপর দিয়ে তরোয়াল চেপে টেনে নিল। জামা কেটে দো-ফাল ও লাফিয়ে উঠে বসল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। লোকটা বলল—তুমি আমার জামা কেটে দিলে কেন?

—শুধু জামা কেটেছে। এবার পালাও। নইলে এবার বুকে তরোয়াল বসাবো। লোকটা একটু ভয় পেলেও বেশ চেঁচিয়ে বলল—এই জাহাজ আমাদের।

—আমাদের মানে? ফ্রান্সিস বলল।

—অন্য ঘরে আমার দুই বন্ধু আছে।

—ও। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলাম ওদের। সত্যি—ওদেরও তো দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল। তারপর চলল অন্য দুটির কাছে।

ঘরটায় ঢুকে দেখল—একজন হাই তুলে উঠে বসল। লোকটার নাকে জরুল। অন্যজন ঘুমে তখনও শুয়ে।

ফ্রান্সিস দেখে যে হাই তুলছিল সেই লোকটিকে বলল—তুমি কে হে? আমাদের জাহাজে উঠেছো?

—সত্যি—অন্যায় হয়ে গেছে। তা আপনাদের রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। লোকটি হেসে বলল।

—কোন অসুবিধে হয়নি তো? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কে হে? এত কথা জানতে চাইছো? জড়ুল বলল।

—আমি যে এই জাহাজের মালিক। ফ্রান্সিস বলল।

—এ্যাঁ? লোকটা বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর বলল—বাঃ! আমরা কত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনলাম সেই জাহাজ তোমার হয়ে গেল? জড়ুল বলল।

—বিক্রি করেছিল কে? ফ্রান্সিস বলল।

—সুলেমান। ঐ যে মোড় ওখানে বিরাট দোকান সুলেমানের। একজন বলল।

—আচ্ছা—দেখছি। তোমরা উঠে রাস্তায় এসো। ফ্রান্সিস বলল।

যে লোকটা ঘুমোচ্ছিল, সে ততক্ষণে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিসদের কথাবার্তা শুনছে।

—এবার চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথায় যাবো? ঘুম ভেঙে ওঠা লোকটা বলল।

—সুলেমানের কাছে। ফ্রান্সিস বলল।

—সুলেমানের কাছে যাবো কেন? লোকটি বলল।

—তোমরা ঐ সুলেমানের সামনে গিয়ে বলবে যে সুলেমানের কাছ থেকে

তোমরা জাহাজটা কিনেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা যাব না। আমরা এই জাহাজেই থাকবো। জড়ুল বলল।

ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। তোমরা এসো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। যদি সুলেমানের কাছে তোমরা না যাও তাহলে এই যে তরোয়ালটা দেখছো তাই দিয়ে তিন বন্ধুর গলা কাটবো।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তুমি জাহাজেই থাকো।

—না না। সুলেমানকে কী করে সামলাও তা দেখবো।

—বেশ চলো।

দুজনে তীরে উঠল। তিনজনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তিন বন্ধু এল।

সবাই চলল মোড়ের দিকে।

সুলেমানের বিরাট দোকানের সামনে এল। ফ্রান্সিস বলল—চলো সুলেমানকে দেখিয়ে দাও। একজন এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিসও চলল। লোকটা পেছনে একটা টেবিলের কাছে গেল। টেবিলের ওপর ছোট কার্পেট। তার ওপর বসে আছে এক মধ্যবয়স্ক লোক। খুব ফর্সা সুলেমান। থুতনিতে অল্প দাড়ি। চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। লোকটি ফ্রান্সিসকে বলল—

—ইনিই সুলেমান।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—আপনি জাহাজটা কার কাছ থেকে কিনেছেন?

—তা আমি আপনাকে বলবো কেন? সুলেমান বলল।

—আমি আবার ঐ জাহাজটা এদের কাছ থেকে কিনতে চাইছি। কত স্বর্ণমুদ্রায় কিনেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কিনেছিলাম একজন সওদাগরের কাছ থেকে। তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না। সুলেমান বলল।

—আপনি আদৌ জাহাজটা কেনেন নি। মুফতে পেয়েছেন। মানে চুরি করেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কে বলে আমি চোর? সুলেমান টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আমি বলছি। যাক গে—এই যে তিনজন কিনেছে তাদের বলুন জাহাজটা আপনার নয়। আর ওদের স্বর্ণমুদ্রাগুলো ফিরিয়ে দিন।

—বা—জাহাজটা আমার। সুলেমান বেশ গলা চড়িয়ে বলল।

ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সুলেমানের গলা চেপে ধরল। সুলেমান এই হঠাৎ আক্রমণে মেঝেয় কার্পেটে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস সুলেমানের গলায় চাপ দিল। বলল—বল্ ধোঁকাবাজ—ঐ জাহাজ তোর নয়।

—না। আমার জাহাজ। সুলেমান বলল।

ফ্রান্সিস গলায় চাপ বাড়াল। বলল—এখনও বল্ ঐ জাহাজের মালিক তুই

না। বল্—নইলে গলা টিপে মেরে ফেলবো। সুলেমানের গলা বুঁজে এল। ও হাঁসফাঁস করতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—এবার সত্যি কথাটা বল্।

—জাহাজটা আমার নয়।

—বল কী দেখে জাহাজটা নিয়েছিলি?

—কিছুদিন নজর রাখলাম।—দেখলাম কেউ জাহাজটায় থাকে না। আমি নিয়ে নিলাম। সুলেমান বলল।

ফ্রান্সিস তিনজন লোকের দিকে তাকাল। বলল—এইবার তোমাদের বিশ্বাস হল? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সুলেমান তখনও গলায় হাত বুলোচ্ছে।

ফ্রান্সিস দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। লোকেরা তখন সেই রক্ষী দুজনকে ডেকে নিয়ে এল। দুই কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখল। একজন রক্ষী বলল—তুমি যে বললে তোমরা চলে যাচ্ছো।

—জাহাজের মালিকানা নিয়ে গোলমাল করল এই সুলেমান। অগত্যা তাকে গলা টিপে ধরতে হল। তখন সত্যি কথাটা বলল। ফ্রান্সিস বলল।

রক্ষী দুজন আর কিছু বলল না। চলে গেল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজে এল। দুজনে নিজেদের কেবিনঘরে ঢুকল। সব এলেমেলো। মারিয়া বলল—সব ঘরের ধুলো ময়লা দূর করতে সময় লাগবে। আমি হাত লাগাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ রসুইঘরে দেখে এসো খাবার জল আটা চিনি ময়দা এসব আছে কিনা।

ফ্রান্সিস সব দেখেশুনে ফিরে এল কেবিনঘরে। দেখল মারিয়া একটা ঝাঁটা দিয়ে সব পরিষ্কার করছে।

—আটা-ময়দা চিনির মধ্যে চিনিটা বেশি আছে। কিন্তু আটা ময়দা সাফ। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো সেসব আনতে যেতে হবে। মারিয়া বলল।

—কিন্তু আমার কাছে তো একটাই স্বর্ণমুদ্রা আছে। তাই দিয়ে সব কেনা যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—ভেবো না। আমার কাছে আছে। মারিয়া বলল। তার পরে কোমরবন্ধনীতে চেপে রাখা একটা ছোট চামড়ার ব্যাগমত বের করল। ওটা থেকে পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসেছিল। উঠতে যাবে তখনই বাইরে থেকে ডাক শুনল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—মারিয়া এতো হ্যারির গলা। এক লাফ দিয়ে ফ্রান্সিস দরজার কাছে এল। টান মেরে দরজা খুলে ফেলল।

দেখল ঘরের কাঠের দেওয়ালে দু হাত রেখে হাতে মুখ চেপে হ্যারি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস কিছু বলার আগেই হ্যারি ফ্রান্সিসকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। কান্নায় হ্যারির শরীর ফুলে উঠতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ধরে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। বিছানায় বসিয়ে দিল।

মারিয়া বলল—হ্যারি—তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? তোমাদের খুঁজে খুঁজেও কোন হদিশ পেলাম না। তারপর মারিয়া সব ঘটনা বলল। হ্যারি বলল—আমরাও তোমাদের খুঁজে বেড়িয়েছি।

—তুমি কি এই জাহাজটা দেখে ফ্রান্সিস এখানে আছে ভেবেছিলে।

—না। ফ্রান্সিসকে আমি আগেই দেখেছি। তখন ফ্রান্সিস একজন দোকানদারের গলা চেপে ধরেছিল।

—তখন তুমি ওখানেই ছিলে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসের কয়েক হাত পেছনে। তখন আমি মুখ চোখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদেছি। তারপরে এখানে এলাম। এবার বন্ধুদের খবর দিতে যাবো। হ্যারি বলল।

—তোমরা জাহাজ পেলে কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এখানেই কিনেছি। রাজা অপর্তোর দেশে যাবো বলে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। বন্ধুদের খবর দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—সবাইকে একসঙ্গে আসতে দেব না। এখানকার কয়েদঘর থেকে আমরা পালিয়েছিলাম। তাই একসঙ্গে এতজন বিদেশি—সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সৈন্যও হয়তো আসতে পারে।

—ঠিক আছে—তোমরা একজন দুজনকে পাঠাও। কথাবার্তা হবে। এইভাবে সকলের সঙ্গেই কথাবার্তা হবে। এখানে যতক্ষণ থাকবো আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

হ্যারি চলে গেল। একটু পরেই হ্যারি আর শাঙ্কো ঢুকল। শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। চোখে জল।

—ফ্রান্সিস—তোমাদের দেখবার জন্যে বন্ধুদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। শাঙ্কো বলল।

তারপর দফায় দফায় বন্ধুরা এল। ফ্রান্সিসদের দেখে খুশি।

সবাই ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখে গেল। হ্যারিরা নিজেদের ছোট জাহাজটায় চলে গেল।

সন্ধে হল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—আমি ঐ জাহাজে যাচ্ছি।

—আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

—পরে যেও ফ্রান্সিস বলল।

—না—না। এই জাহাজে আমি একা পড়ে থাকবো?

—আমার ফিরে আসতে কতক্ষণ আর লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে—একাই যাও। মারিয়া বলল।

—এটা তো রাগের কথা হল। তুমি না বললে আমি যাই কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। আমি আর কিছু বলবো না। তুমি যাও। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—এই ভিগো নগরে থাকা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

—তুমি ঘুরে এসো। আমি পরে যাবো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস জাহাজের বাইরে এল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে ছোট জাহাজটার কাছে গেল। তারপর পাতা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠল। হ্যারি একটা ছোট কেবিন ঘরে ফ্রান্সিসকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—এখন একটা কাজের কথায় আসি। আমাদের জাহাজে আধবস্তা চিনি ছাড়া কিচ্ছু নেই। আটা ময়দা চিনিও কিনে আনতে হবে। আর দুজন যাও পিপে দুটোয় জল ভরে নিয়ে এসো।

ফ্রান্সিসের কথামত কয়েকজন ভাইকিং কাজে নেমে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের বলল—দুটো জাহাজই একসঙ্গে ছাড়বো না। প্রথমে বড় জাহাজটা ছাড়বো। তার এক ঘণ্টা পরে ছোট জাহাজটা ছাড়বো। গভীর সমুদ্রে গিয়ে প্রায় সবাই বড় জাহাজে চলে আসবে। মাত্র তিন চারজন ছোট জাহাজে থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজ চালিয়ে কোথায় যাবো আমরা? হ্যারি বলল।

—আমরা রাজা অপর্তোর দেশে যাবো! ফ্রান্সিস বলল।

—তা কেন? আমরা তো ঐ দেশে না গিয়ে স্বদেশেও ফিরে যেতে পারি। হ্যারি বলল।

—ঠিক এই কথাটাই বলতে আমি এসেছি। মাত্র একটা দিনের জন্যে অনায়াসে ঐ রাজ্যে থাকতে পারি। নকশা দেখে রাজা ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। একটা দিন আমরা ওখানে থাকবো। সেই দিন ও রাত্রের মধ্যে ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করতে পারলে তো ভালোই। কিন্তু যদি ব্যর্থ হই তাহলে তার পরদিনই আমরা জাহাজ ছাড়বো। হ্যারি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

বড় জাহাজই অনেকটা দূরে এল। গভীর সমুদ্রে থামল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বড় জাহাজটা এল। এবার ছোট জাহাজ থেকে বড় জাহাজে যাওয়া। ছোট জাহাজটা গিয়ে বড় জাহাজের গায়ে লাগলো। ঢেউয়ের দুলুনির মধ্যে দিয়ে বড় জাহাজের ডেক-এ এক এক করে ভাইকিংরা উঠে এল।

দুটো জাহাজই চলল। বড় জাহাজটা চালাচ্ছিল ফ্রেজার। ও শাঙ্কোকে ডেকে বলল—তোমরা দাঁড়ঘরে যাও। জাহাজটার গতি বাড়াতে হবে। শাঙ্কো হ্যারিকে গিয়ে বলল। হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব জাহাজের গতি বাড়াতে হবে। দাঁড়ঘরে যাও।

ভাইকিং বন্ধুরা একে একে দাঁড়ঘরে নেমে গেল। দাঁড় টানতে লাগল। জাহাজের গতি বাড়ল।

শাঙ্কো রেলিঙ ধরে ছোট জাহাজে বন্ধুদের ডেকে চলল—বাতাস পড়ে গেছে। তোমরা দাঁড় টানো। জাহাজের গতি বাড়াও। ছোট জাহাজের ভাইকিংরাও দাঁড়ঘরে গেল। দাঁড় বাইতে লাগল।

দুটো জাহাজই বেশ দ্রুতগতিতে চলল।

পরদিন বিকেলে জাহাজ রাজা অপর্তোর রাজ্যে পৌঁছল। দূর থেকে দেখা

গেল ছোট বন্দরটায় তিনটে জাহাজ রয়েছে। ওর মধ্যে একটা জাহাজ রাজা ভিলিয়ানের। এখন রাজা অপর্তোর দখলে।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার জাহাজ তীরের কাছে নিয়ে যেও না। দূরেই রাখো। ফ্রেজার জাহাজের গতি কমাল। তারপর আস্তে আস্তে জাহাজটা থামাল। ছোট জাহাজটাও শাঙ্কোর চেঁচিয়ে বলা কথা শুনে থামাল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—আজকে রাতেই তো যাবে?

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমিই তোমাকে ডাকতে যাবো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস চলুন।

সন্ধের পরে পরেই শাঙ্কো রাতের খাবার খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস একটু পরে খেল। কেবিন ঘরে গিয়ে পোশাক পরে নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। তারপর বিছানায় বসে শাঙ্কোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

—আজ রাতে যাচ্ছো? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। আজ রাতটা আমাকে সময় দিয়েছে। আজ রাতে রাজা ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করতে হবে।

—তার মানে আজ রাতেই শেষ চেষ্টা করতে হবে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—নকশাটা সঙ্গে নিয়েছো? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার প্রথমে গুহাটা দেখতে হবে। তারপর চেস্টনাট গাছের বনভূমি।

কিছুপরে শাঙ্কো তৈরি হয়ে এল। বলল—মশাল নেবো?

—দরকার নেই। আজকে জোছনা উজ্জ্বল। দুজনে চলল জাহাজের পেছন দিকে। সেখানে দড়ির মইটা রাখা আছে। দুজনে দড়ির মইটা নিচে একটা নৌকোর ওপর নামিয়ে দিল। তারপর প্রথমে ফ্রান্সিস পরে শাঙ্কো নৌকোটা নামল। মই ছেড়ে দিল।

দুজনে নৌকোয় নামল। দড়ির মইটা ওপরে উঠতে দেখে দু'জনেই দেখ হ্যারি মইটা ওপরে তুলে নিল।

ফ্রান্সিস দাঁড় বেয়ে চলল। আজ আকাশে জোছনার ছড়াছড়ি। কিছুটা পথ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

তীরভূমিতে পৌঁছল। নৌকো বালিয়াড়িতে তুলে রাখল। বন্দরের কাছে এসে দুজনে ঝোপ জঙ্গলে ঢুকল। কিছুদূর গিয়ে দেখল রাস্তার ওপাশেই বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গল।

ফ্রান্সিস আস্তে বলল—চলো—রাস্তাটা পার হই। দুজনে সদর রাস্তায় এল। দুদিকে তাকিয়ে দেখল সৈন্য বা পাহারাদার কেউ নেই। ফ্রান্সিস বলল—জলদি। দুজনেই দ্রুত সদর রাস্তাটা পার হল।

টিলার নিচে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। বলল—টিলার গুহাটা দেখতে হবে।

—চলো। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস নকশাটা বের করল। চাঁদের আলোয় দেখে নিল। গুহাটা পশ্চিমমুখী। দুজনে টিলাটায় উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস হিসেব করে পশ্চিমের ঢাল ধরে উঠতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গুহার মুখে এসে পৌঁছল। চাঁদের আলো তো গুহার ভেতরে ঢোকে নি। তাই অন্ধকার ভেতরটা। শাঙ্কো বলল—দাঁড়াও। আমি ঢুকছি।

শাঙ্কো বুকের পোশাকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা তুলে নিল। ডানহাতে ছোরাটা ধরে আস্তে আস্তে অন্ধকার গুহাটায় ঢুকতে লাগল। একটু দূর পর্যন্ত মোটামুটি দেখা গেল। তারপরই একেবারে অন্ধকার। তার মধ্যে দিয়ে দুজনে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

গুহার মুখটাতে পাথরের টুকরো ছিল। ভেতরটা মোটামুটি পরিষ্কার। আবার কিছুটা যেতেই শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এখানেই গুহা শেষ। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে পাথুরে দেয়ালটা পেল। দেয়ালটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কোণের পাথুরে দেওয়ালটা দেখল। না—দেয়ালে মাত্র দুটো খোঁদল মত। খোঁদলে হাত দিল। ফাঁকা। কিছু নেই। ফ্রান্সিস ভাবল—এরকম কোন খোঁদলেই নকশার কাগজটা ছিল। ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—শাঙ্কো—অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাবে না। কাল সকালে যদি সময় পাই আসবো। চলো।

দুজনে অন্ধকারে আস্তে আস্তে গুহার মুখে চলে এল। গুহার মুখ থেকে জোছনা পাওয়া গেল। নামতে লাগল দুজনে। টিলা থেকে নামল। বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গলে ঢুকল।

জোছনা উজ্জ্বল। তাই সবকিছুই মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুজনে মরা গাছটা খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল।

—শাঙ্কো—তুমি তো আগে এসেছিলে। বেলচা এনেছিলে?

—এনেছিলাম। কিন্তু রাজা অপর্তোর সৈন্যদের হাতে প্রায় ধরা পড়েছিলাম। তখন বেলচা এনেছিলাম। পালাবার আগে বেলচাটা ঐ কোষটায় ফেলে গেছি। দেখি খুঁজে। শাঙ্কো সেদিকে চলল। ঝোপে খুঁজতে খুঁজতে বেলচাটা পেল। তুলে আনল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। তারপর সেই বৃদ্ধ কবিরাজের কথা বলল। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হল।

শাঙ্কো মরা গাছটার গোড়ায় বেলচা দিয়ে মাটি তুলতে লাগল। কিছুক্ষণ মাটি তোলার পর গাছের গোড়াটা বেরিয়ে এল। দুজনেই আশ্চর্য হল। দেখল শেকড়। ফ্রান্সিস বলল—নকশাতেও শেকড় আঁকা আছে।

গাছটার গোড়া অনেকটা আলগা হল। দুজনে মিলে গাছটাকে কাত করল এপাশে। তারপর ওপাশে। গাছটা মাটি থেকে আলগা হয়ে গেল। এবার দুজনে মিলে গাছটাকে টানতে লাগল। আস্তে আস্তে গাছটা উঠে এল। গাছটা পাশে রেখে দিয়ে এবার যে গর্তটা হয়েছিল সেটা দেখতে লাগল ফ্রান্সিস। ও ভাবল—সোনার তরবারি কি এখানেই আছে?

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—তোমার কী মনে হয়? সোনার তরবারি কি

এখানেই আছে?

—ফ্রান্সিস—গর্তটা আরো নিচে বাড়ানো যাক। আরও নিচে কী আছে দেখা যাব।

—ঠিক বলেছো। চলো গর্তটা নিচের দিকে বাড়াই।

শাঙ্কো বেলচা দিয়ে মাটি তুলতে লাগল। একটু পরে ফ্রান্সিস বেলচা চালাতে লাগল।

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ হল—টং। ধাতব শব্দ। ফ্রান্সিস বলে উঠল—শাঙ্কো—নিশ্চয়ই তরবারিটা। আরো খুঁড়তে হবে। এবার শাঙ্কো বেলচাটা নিল। খুঁড়তে লাগল। একটা হাতল বেরিয়ে এলো।

শাঙ্কো গর্তে নেমে হাতলটা ধরল। চাঁদের আলোয় দেখাই যাচ্ছে সোনার হাতল। শাঙ্কো হাতলটা ধরে টানতে লাগল। খাপের মধ্যে রাখা বোধহয়। শাঙ্কো ভাবল।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো আমাকেও টানতে দাও। দেখাই যাচ্ছে সোনার হাতল। ফ্রান্সিস নামল। হাতলটা ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। তরোয়ালটা যেন অনেকটা নড়ল। ফ্রান্সিস আবার দুটো হ্যাঁচকা টান দিল। তরবারি উঠে এল। চাঁদের আলোতেই তরোয়ালটা ঝিকিয়ে উঠল। নিরেট সোনায় তৈরি তরবারি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ধ্বনি দিল—ও—হো—হো। শাঙ্কোও চাপা গলায় ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। হাত সাতেক লম্বা তরবারিটা।

তরবারিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—এবার খাপটা তুলতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে এল। শাঙ্কো নামল। মাটি সরাতেই দেখা গেল খাপটা। শাঙ্কো খাপটা বার কয়েক এদিক ওদিক সরাতেই খাপটা বেশ আলগা হল। শাঙ্কো খাপ ধরে বারকয়েক হ্যাঁচকা টান দিতেই খাপটা উঠে এল।

চাঁদের আলোয় ওরা দেখল এক আশ্চর্য সুন্দর তরোয়ালের খাপ। সোনার ওপর কত মণিমাণিক্য বসানো। সুন্দর মিনে করা। চাঁদের আলোয় সব মণিমাণিক্যগুলো এখানে ওখানে ঝিক দিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এরকম গুপ্তধন আগেও উদ্ধার করেছে। এসব ওদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এরকম সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তরবারির খাপ ওরা আগে কখনও দেখেনি।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো পালাও। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না। জলদি। ভারি তরবারিটা ফ্রান্সিস নিল। খাপটা শাঙ্কো কাঁধে নিল।

বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে থেমে ওরা দুজনে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। আকাশ সাদাটে। সদর রাস্তায় ওঠার আগে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখল। না—কোন সৈন্য নেই। দুজনে দ্রুত সদর রাস্তাটা পার হল। তারপর চলল নৌকোর খোঁজে। বালিয়াড়িতে তুলে রাখা নৌকোটার কাছে এল। প্রায় ছুটে আসতে হয়েছে। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন।

দুজনে নৌকোয় উঠল। ফ্রান্সিস দাঁড় টানতে লাগল।

রাজা ওভিড্ডোর তরবারি

সূর্য উঠল। আলো ছড়িয়ে পড়ল। যে তিনচারজন ভাইকিং ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ফ্রান্সিসদের দেখল। চেঁচিয়ে বলে উঠল—ফ্রান্সিস শাঙ্কো এসেছে। ডেকএ হ্যারি আর মারিয়া এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো হালের কাছে এল। বন্ধুরা ওপর থেকে দড়ির মইটা ঝুলিয়ে দিল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ওপরে উঠে এল। বন্ধুদের চেঁচামেচি থেমে গেল। ওরা তখন নির্বাক। দেখতে লাগল তরবারিটা আর তার খাপ। রোদ লেগে তরবারির খাপে বসানো হীরে মুক্তো চুনিপান্না থেকে আশ্চর্য আলোর ঝলকানি দেখা গেল। সোনার তরবারি রোদে ঝলসে উঠল। কারও মুখে কথা নেই।

কিছু পরে মারিয়া ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো-। এবার ভাইকিংরা সংবিৎ ফিরে পেল। চিৎকার ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ভাইকিংরা কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরল। কেউ নাচতে লাগল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব—পরে আনন্দ করবো। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—জাহাজ ছাড়ো। রাজা অপর্তো রাজা ওভিড্ডোর তরবারি আমরা পেয়েছি এটা জানলে আমরা ভীষণ বিপদে পড়বো। সবাই লেগে পড়ো। হাওয়ার তেমন জোর নেই। কিছু বন্ধু দাঁড় ঘরে যাও। দাঁড় টানো। সব পাল খুলে দাও।

ভাইকিংরা নিজেদের কাজে নামল। দ্রুত নোঙর তোলা হল। পাল খুলে দেওয়া হল। জলে উঠল ছপ্‌ছপ্ দাঁড়ের শব্দ।

জাহাজ শান্ত সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে চলল পূর্ণ বেগে।